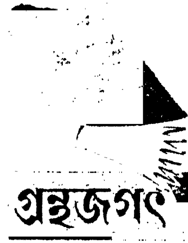
ইংরেজের দেশে

কুমারেশ ঘোষ





গ্রন্থজগৎ
৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ
১লা আষাঢ়, ১৩৬৫

প্রকাশক
দেবকুমার বসু
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

চিত্রকর্ম
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

বর্ণলিপি
গণেশ বসু

মুদ্রক
কমল মুখোপাধ্যায়
হিন্দুস্থান প্রিণ্টার্স
৫২বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

চারটাকা

সুসাহিত্যিক

মনোজ বসু-কে

সব দেশের মতই ইংরেজের দেশেও রোজ কিছু কিছু বদলাচ্ছে। কাজেই জানিয়ে রাখা ভালো, আমার এই বইয়ের বর্ণনা ১৯৫৪-৫৫ সালের। আর, এই রচনা শুরু ইংল্যাণ্ডে, শেষ স্বদেশে।

ইংরেজের দেশে


PICCADILLY

প্লেনের ভিতর থাকতে বুঝতে পারিনি। হোস্টেসকে 'গুডবাই' ক'রে প্লেনের দরজার বাইরে নামবার সিঁড়িতে পা দিতেই বুঝলাম, ইংল্যাণ্ডে এলাম বটে। হু হু ক'রে বইচে ঠাণ্ডা হাওয়া। ইংল্যাণ্ডের দোষ নেই, অক্টোবরের শেষ। ওভারকোটের খোলা বোতামগুলোকে এঁটে তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকলাম বুট-জুতো আকারের কাঁচ ঘেরা মোটর কোচে। হাওয়ার হাত থেকে বাঁচা গেল। সবাই উঠলে, কোচ কাষ্টম হাউসের সামনে নিয়ে এসে ছেড়ে দিলো। এয়ার পোর্টটি দেখে একটু দমে যেতে হ'লো। আমাদের দেশী দমদম পোর্টটি যেন শত গুণে ভাল। শুধু ভাল নয়, জমজমাট।

এবার জিনিষপত্র দেখার পালা। এ বেড়া পার হ'লে তবে লণ্ডনের রাস্তায় পা বাড়ানো যাবে। এত জায়গায় ঘুরলাম, কোথাও ব্যাগ খুলে দেখতে চাইলে না কেউ, কিন্তু এখানে ডিউটিফুল অফিসারটি প্যারিতে কেনা আমার বিউটিফুল হ্যাণ্ডব্যাগটি দেখিয়ে বললো: কী আছে ওতে?

বললাম, কাগজপত্র।

খোলো দেখি।

খুললাম ঝাঁপটা ফড়ফড় ক'রে। হাত ঢুকিয়ে দেখলে নেহাৎই কাগজ পত্তর, কাজেই ধারের পাতলা চামড়ার কানটা ধরে ঝাঁপটা এমনি টেনে বন্ধ করলে যে, তার হাতের সঙ্গে চলে গেল কানটা। প্যারিতে তিনশো ফ্রাঁতে কেনা সস্তার হ্যাণ্ড-ব্যাগের চামড়ার কানটা শক্ত হবে এমনটি আশা করা অন্যায়; কিন্তু অফিসারটি অপ্রস্তুতে পড়ে গেল, বললো তাদের মামুলি বুলি: সরি।

ছেঁড়া কানটা আমার হাতে এগিয়ে দিলে, সেটা পকেটে পুরে বললাম, মাই ঘ্যাড্!

সামান্য ক্ষতি হ'লো, লাভও হ'লো। লোকটা ভাবলো, হয়তো আমার আর সব জিনিষই বুঝি অমনিতর পল্কা। কাজেই পাশের দুটো সুটকেশ দেখিয়ে বললো: ওতে টোবাকো বা আলকোহল আছে কিছু?

ঘাড় নেড়ে বললাম, রামচন্দ্র!

অমনি ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্ ক'রে আমার তিনটে জিনিষে দাগ মেরে দিলে —যাও ছুটি।

প্লেনে হোস্টেস কতকগুলো ফর্ম হাতে ক'রে জানান্ দিয়েছিল, যাঁরা ব্রিটিশ-প্রজা নন, তাঁদের এই ফর্ম ভর্তি করতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলেছিলাম, দাও একখানা আমাকে। সেই ভর্তি করা ফর্মখানা পাশপোর্ট

অফিসারের দপ্তরে আর হেল্‌থ সার্টিফিকেটখানা পাশের দপ্তরে খুলে দেখিয়ে বেড়া দুটো টপকানো গেল।

সামনেই দেখি একটা ব্যাঙ্ক। পকেটে হাজার দেড়েক ফরাসী ফ্রাঁ ছিল, সেগুলো পাল্টে পাউণ্ড শিলিং পেন্স ক'রে নেওয়া গেল। জ্ঞান বুদ্ধি না হ'তেই স্কুলে অংকের ক্লাসে পাউণ্ড থেকে পেন্স আর পেন্স থেকে পাউণ্ড —অনেক করা গেচে। এবার ফ্রাঁ থেকে পাউণ্ড সিলিং পেন্সগুলো হাতে আসায় একবার নেড়ে চেড়ে দেখলাম, বস্তুগুলি কি প্রকারের। যাই বলো বাপু, পাউণ্ডের নোটগুলি আমাদের দশটাকার নোটের মত অত ভাল ছাপা নয় আর পেনিগুলো এক একটা তামার তাওয়া যেন—আমাদের আগেকার ডবল পয়সার চাইতে বড় বই ছোট নয়। আমাদের টাকার চাইতে একটু বড় আড়াই শিলিং বা হাফ ক্রাউনও হাতে এসেচে দেখলাম আর আনির মত তিন পেনী দুটো।

বাইরে বেরুতেই দেখি সেই বুট জুতো মার্কা কাঁচের কোচ। পাঁচ শিলিং বাসভাড়া দিয়ে কোচে ওঠা গেল, কিন্তু মালগুলো আমার গেল কোথায়? তবে ইংরেজের উপর বিশ্বাস আমাদের জন্ম থেকেই। কাজেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম বাসে, মালগুলো নিশ্চয়ই আছে কোচের খোলের মধ্যে।

যথারীতি মেঘলা আকাশ। দুপাশে চাষের ক্ষেত। কপি হ'য়েচে সার সার। মাঝখান দিয়ে পীচের পালিশ করা চওড়া রাস্তা সাদা রংয়ে দু'ভাগ করা। দু'ধারে ফ্লোরেসেণ্ট আলোর থাম—'অ্যাটেনসন'এ দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের 'বুটজুতো' চলতে লাগলো। চলচে তো চলচেই—এ রাস্তা পার হ'য়ে সে রাস্তা, সে রাস্তা পার হ'য়ে আর এক রাস্তা। পথের ধারে ইংলিশ কটেজ, দোকানপাট, অল্প সল্প লোক। ক্রমে লোকের আনাগোনা বেশি বলেই মনে হ'লো, বুঝলাম লণ্ডনের কাছাকাছি এসেচি।

তারপরেই হঠাৎ দেখি, সেই বহু বিখ্যাত ছোট্ট খাল—টেমস নদী। লঞ্চ আর ষ্টীমারের চাপে মরার মত প'ড়ে আছে; আর ধারে ধারে ক্রেনগুলো দাঁড়িয়ে আছে, যেন দানব ব্যবসায়ীদের মাছ ধরবার ছিপ। 'বুট জুতো' আর এক পাক ঘুরতেই চোখে পড়লো পার্লামেণ্ট প্রাসাদ আর 'বিগ-বেন' ঘড়ি—টেমসে তাদের প্রতিবিম্ব। ইংরেজের ঐ দু'টির অন্তরাত্মা টেমস বেয়ে সাগরে প'ড়ে বহু দেশের তটভূমিকে নাড়া দিয়েচে: ওদের অ্যাডমিনিষ্ট্রেসন আর পাংচুয়ালিটি।

এসে পৌঁছুলাম 'ওয়াটারলু ষ্টেশনের কাছে বি-ই এ-র সিটি অফিসে। যার যার মাল নিয়ে যাবার ডাক পড়লো। দেখলাম, মালগুলো সব 'বুট জুতো'র খোল থেকে সোজা পাশাপাশি সাজানো রোলারের উপর দিয়ে গড়গড় ক'রে ভিতরে আসচে। আমার সম্পত্তি তিনটিও সশরীরে আমার নাগালের মধ্যে এসে পড়লো।

পোর্টার জিগ্যেস করলো, হোটেল চাই নাকি স্যার ?

বললাম, সস্তার ব্যবস্থা কিছু আছে ?

সোজা দেখিয়ে দিলে কাউণ্টারে বসা এক ভদ্রলোককে। তাঁর মাথার কিছু উপরে এক সাইনবোর্ড : 'হোটেল রিজার্ভেশন'।

গেলাম তাঁর সমীপে এবং জানালাম আমার মনোবাসনা।

জানালেন, সপ্তাহে তিন পাউণ্ডে ল্যাণ্ড-লেডির বাড়িতে বেড, ব্রেকফাষ্ট পাওয়া যায় সত্যি,—কিন্তু আমাদের কারবার হোটেল নিয়ে। তাও কি পাওয়া যাচ্ছে! আর্ল'স কোর্টে মোটর শো'র জন্যে প্রায় সব হোটেল ভর্তি।

সর্বনাশ, এখানেও সেই প্যারির শো! প্যারির মোটর শো ভেঙে এখানেও দানা বেঁধেচে দেখচি। বড়লোকী হালচালের ঠেলায় গরীবের চাল চুলো মেলা সত্যিই দায়। ঘাবড়ে গেলাম। বাইরে শান্ত ভাব দেখিয়ে বললাম, একটা হোটেলেই ওঠা যাক, পরে তিন পাউণ্ডের বেড ব্রেকফাষ্ট দেখে নেবো'খন।

সেই ভালো, বলে ভদ্রলোক টেলিফোন তুলে একটা হোটেলে ফোন করলেন। শুনে বুঝলাম জায়গা নেই। ভালো! আর একটায় ফোন করলেন : নেই, সরি! চমৎকার! এবার আর একটায় একটু বেশি কথা হ'লো, অর্থাৎ আশা হ'লো। ফোন নামিয়ে বললেন ভদ্রলোক, দু' রাত্রির জন্যে পাওয়া যাবে—বেড, ব্রেকফাষ্ট ; রাত পোহালে সতেরো শিলিং। তাই সই। পোর্টার মালগুলো নিয়ে বাইরে এসে দূরে একটা দাঁড়ানো ট্যাক্সিকে শিস দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটি আপ-টু-ডেট ছোকরা ড্রাইভার একটা সেকেলে ধরণের ট্যাক্সি নিয়ে সামনে হাজির। চেয়ে দেখলাম, আর সব দাঁড়ানো ট্যাক্সিগুলো ঐ একই টাইপের। মিটারের কাছের দরজা কাটা, বেঢপ সাইজের অষ্টিন ট্যাক্সি, আমাদের কলকাতার ট্যাক্সির কাছে, ফুঃ! শুনেছিলাম, ইংরেজ বড় পুরাতন বিলাসী। তার পয়লা নমুনা পাওয়া গেল।

পোর্টার মাল তুলে দিলে তার হাতে একটা শিলিং দিলাম, কিন্তু দেখি হাত খুলেই রাখলো, মুঠো বন্ধ করলো না; আরো চায়! ড্রাইভার বললে, আর এক শিলিং আশা করচে। অতএব আশা পূর্ণ করলাম। মুঠো বন্ধ করে পোর্টার বললে, থ্যাংকু! আমি ট্যাক্সিতে উঠে দরজা বন্ধ করতেই ড্রাইভার জিগ্যেস করলে, কোথায় যাবো স্যার? হাতের ঠিকানা লেখা স্লিপখানা, কাঁচের পার্টিসনের ফাঁক দিয়ে তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, ঐ ঠিকানায়।

মিটারের ফ্ল্যাগ ডাউন করতেই এক শিলিং ছ' পেন্স এবং পরে তিন পেন্স ক'রে উঠতে উঠতে যখন ঠিকানায় আসা গেল, দেখা গেল সাত শিলিং ন' পেন্স উঠেচে মিটারে। মালপত্তর নামিয়ে এক পাউণ্ডের নোটখানি এগিয়ে দিতেই—একখানি দশ শিলিংয়ের নোট ফেরৎ দিয়ে দেখি ড্রাইভার ট্যাক্সিতে ষ্টার্ট দিচ্চে। আমিও হাতের মুঠো বন্ধ না ক'রেই বললাম, ব্যাপার কি, ব্যালান্সটা? বললে, লণ্ডনের রাস্তায় যা ট্রাফিক, তাতে পেট্রোল পুড়িয়ে ট্যাক্সি চালিয়ে কিছু থাকে না স্যার। যেটুকু থাকে, ঐ টিপস্। বলেই মুখখানা এমন কাঁচুমাচু ক'রে থাকলো যে আর কিছুই বলা গেল না। সাদা চামড়ার ইংরেজ মুখ চুণ ক'রে সামনে দাঁড়ালে, মনটা যে গলে যাবে তাতো কড়াইয়ে ঘিয়ের মত, তাতে আর আশ্চর্যের কি? বললাম, অ' রাইট!

ছোকরা থ্যাংকু জানিয়ে হাঁকিয়ে দিলে ট্যাক্সি।

ফুটপাথ থেকে সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা উঠে দরজায় বেল টিপলাম। এক পাল্লার দরজাটা একটু ফাঁক করে একটি মেড তার গোলাপী মুণ্ডুটি বার করলে শুধু! বললাম এয়ারপোর্ট থেকে টেলিফোনের কথা।

ও হ্যাঁ। দরজাটি পুরো ফাঁক করলে, ভিতরে প্রবেশ করলাম।

ভিতর থেকে একটি লোক এসে মালপত্তরগুলো বাইরে থেকে ভিতরে এনে পথের পাশে সাজিয়ে রেখে বললো: ঘরটা খালি হয়নি এখনো, পাঁচটায় হবে, ঐ সময়টুকু ঘুরে আসলে ভাল হয়। সদর দরজার চাবি একটা গুঁজে দিলে হাতে, দেখিয়ে দিলে বাথরুম টয়লেট। মুখ হাত ধুয়ে, ঠিকানাটা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। ঘড়িতে বেলা তখন আড়াইটে, মেঘলা আকাশ দেখে মনে হ'লো যেন, সন্ধ্যে হয় হয়।

জায়গাটা সাউথ কেনজিংটনে গ্লচেষ্টার রোড টিউব ষ্টেশনের কাছে। হোটেল নয়, প্রাইভেট বাড়ি; তবে হোটেলের মতই ব্যবস্থা। যাকগে, মাথা গুঁজবার জায়গা তো পাওয়া গেল, পরে সস্তার ব্যবস্থা দেখতে হবে।

বেশ হাল্কা হ'য়েই ঘুরতে বেরুলাম পথে। সামনে দু'চারটে হোটেল পড়লো। ব্যাপার কি, সত্যিই জানবার জন্যে দু'তিনটে হোটেলের বেল টিপে যা বুঝলাম, তাতে মনটা ভারি হ'য়ে গেল সীসের মতই। এক হোটেলে বললে দু' সপ্তাহ বাদে আসতে; আর এক হোটেল আর এক কাঠি উপরে, বললে, ছ' সপ্তাহের আগে নয়। এয়ারপোর্টের ইংরেজ মিথ্যে বলেনি।

আরো এগুতে লাগলাম, চোখ দুটো দু'পাশের বাড়ির দিকে। শুনেছি, যারা বোর্ডার রাখে, তাদের বাড়ির জানালায় বেড-ব্রেকফাস্টের বোর্ড ঝোলে। পোড়া চোখে তেমন কিছুই পড়লো না। বরং খানিক চলার পর চোখে পড়লো আমারই রংয়ের এক ভদ্রলোক হন-হন ক'রে চলেছে অপর ফুটপাথ দিয়ে। আমার দিকে একবার দেখলে, কিন্তু তার যাত্রাভঙ্গ করলে না। কন্টিনেন্টে হ'লে সেও লাফিয়ে আসতো, আমিও লাফিয়ে যেতাম কাছে—তারপর অবাঙ্গালী হ'লে ইংরেজীতে, নইলে মধুর বাংলাভাষায় কুশল প্রশ্ন এবং অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের পর দুজনেই বিদায় নিতাম বিরহ-বেদনাতুর হ'য়ে। কিন্তু এখানে বাদামী লোক এত বেশি যে চেনা বাদে কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না—যেন দেশেই আছি। ভদ্রলোক চ'লে যেতে খেয়াল হ'লো, একবার ডেকে জিগ্যেস করলে তো হ'তো, এখানে সুবিধে মত জায়গা কোথায় পাওয়া যায়। আরে, গরজটা তো আমারই। ঠিক করলাম, এবার বাদামী লোক দেখলে হয়, প্যাঁক ক'রে ধরবো।

কয়েক পা এগুতেই জুটে গেল আর একটা চান্স। এক মধ্য-বয়সী বাদামী ভদ্রলোক আমারই ফুটপাথ ধ'রে এগিয়ে আসচেন আমারই দিকে। আর কথা নয়, স্রেফ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম: গুড ইভনিং, এখানে থাকেন বুঝি?

দেখতেই তো পাচ্চেন এখানে থাকি—বলতে পারতেন ভদ্রলোক। কিন্তু ভদ্রলোকের বয়স হ'য়েচে, এবং ঠ্যাঁটা নন বোঝা গেল। তাই আমার ঐ বোকা-প্রশ্নের উত্তর দিলেন: ইয়েস।

জিগ্যেস করলাম এবার সাজিয়ে-গুছিয়ে যা জিগ্যেস করবার। ভদ্রলোক হাসলেন একবার। তাঁর এক কানে প্লাগ গোজা, কোটের কলারে ছোট্ট মাইক। ভদ্রলোক কথাগুলো ঠিক শুনতে পেয়েচেন তো? আবার বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ভদ্রলোক কথা বললেন ইংরেজীতে: আপনাকে লাকি বলতে হবে, আমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। আসুন আমার সঙ্গে

জিনিসপত্তর নিয়ে।

ভদ্রলোক বলেন কি ? সেখানে জায়গা পাবো কিনা ঠিক নেই, এদিকের হাতের পাখি ছেড়ে দেবো ? বললাম, চলুন কথা বলে আসি আগে, কাল যাবো'খন সেখানে। যেখানে উঠেচি সেখানে এক রাত্রিও তো থাকা দরকার।

তবে তাই চলুন, আমিও ফিরচি বাসাতেই। তবে একেবারে গেলেও পারতেন, জায়গা পেতেনই।

ভদ্রলোকের লেজুর ধরা গেল। অবাঙ্গালী। মিঃ রাও। বললেন : বাড়িওয়ালার নাম মিঃ বেনার্জী : বাঙ্গালী। সপরিবারে থাকেন, তিনখানা বাড়ি তাঁর লণ্ডনে। অনেক ইণ্ডিয়ান থাকে। খাওয়াও ভাল। ডাল, ভাত, তরকারি, চাটনি, রোববারে মাংস। বেড, ব্রেকফাষ্ট, ডিনার নিয়ে আড়াই পাউণ্ড মত সপ্তাহে পড়বে। তাই বলছিলাম, আমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল, লাকি আপনি। লণ্ডনে এমন সস্তায় ভাল ব্যবস্থা নেই।

গদগদ হ'য়ে বললাম, সত্যিই ! মনে মনে বললাম, এখন সব ভাল, যার শেষ ভাল।

সাউথ কেনজিংটন টিউব ষ্টেশনে পৌঁছুলাম। কেমন ক'রে টিকিট কেটে, নির্দেশমত দিকজ্ঞান লাভ ক'রে ঠিক ট্রেনে চড়তে হয়, সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। প্যারীতে মেট্রো অর্থাৎ তলা-ট্রেনে চ'ড়ে হাতে খড়ি দেওয়াই ছিল, কাজেই এখানে প্রথম ভাগ শিখতে কষ্ট হ'লো না। লিফটে মাটির তলায় ঢুকে ডাইনে বাঁয়ে যেতে যেতে দিক-জ্ঞান হারাবেই। তখন রেল-কর্তাদের নির্দেশ না প'ড়ে এগুতে গেলেই হাতড়ে বেড়াতে হবে এগলি ওগলি নির্ঘাৎ। ভিতরে সাহেব-মেমেরা যা দৌড়ে চলে—ধাক্কা খাওয়াও বিচিত্র নয়। তবে কর্তাদের নির্দেশগুলি এমন চমৎকার ক'রে জায়গা হিসেবে দেওয়া যে চোখ দুটো খুলে রাখলে এবং ঘটের বুদ্ধি একটু খরচ করলেই—ঠিক ট্রেনটিতে চ'ড়ে বসতে পারবে নিঃসন্দেহে। তারপর জানলার কাচে 'নো স্মোকিং' না লেখা থাকে তো একটা সিগ্রেট ধরাও তবে দু'চার টান দিতে না দিতেই এসে যাবে তোমার জংসন ষ্টেশনে। তখন আপসে দরজা খুলে গেলে—বেরিয়ে নির্দেশগুলোর দিকে নজর রেখে অন্যদের সঙ্গে চালাও দৌড়-পাল্লা।

হয়তো একটা চলন্ত সিঁড়ির সামনে এসে পড়লে, উঠতে হবে ! ব্যালান্সটি ঠিক রেখে তাতে পা দিয়ে দাঁড়াও একপাশে, কারণ যারা

ওয়াকিবহাল হ'য়ে গেচে—তারা চলন্ত সিঁড়িতে দৌড়ে উঠচে—ডবল স্পীডে। দু'দিন গেলে তুমিও করবে তাই, তবে এখনি নয়, উল্টে পড়বার ভয় আছে। বরং চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে উঠতে উঠতে পাশের দেওয়ালে সাঁটা বিজ্ঞাপনগুলো দেখতে থাকো। দেখতেই থাকো, পড়তে যেয়ো না—কারণ ওদিকে সিঁড়িটা ফুরিয়ে এলো কিনা খেয়াল রাখাও বিশেষ দরকার। ফুরিয়ে গেলেই সুড়ুৎ ক'রে স্থির-মাটিতে পা রেখেই আবার দৌড়ে চলো আর একটা লাইনের ট্রেন ধরতে। সে লাইনে ট্রেনটা হয়তো আসেনি তখনো, কি করবে? সামনের দেওয়ালে বড় বড় বিজ্ঞাপনগুলো আছে, দেখতে থাকো; আর নইলে কাগজ কিনেচো একখানা? পড়তে থাকো হেডিংগুলো। দেখবে সকলেই প্রায় পড়চে।

এরা লোকের সঙ্গে মন খুলে বলে না, কাগজ খুলে পড়তে থাকে সুযোগ পেলেই। চলন্ত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়ে, প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে পড়ে, ট্রেনে দাঁড়িয়ে পড়ে—পারে তো চলতে চলতেও পড়ে। এই যে এতটা কাণ্ড তুমি করলে, এতটা গেলে-এলে, কিন্তু একটা কথা শুনতে পাবে কারো? উঁহু। শুধু জুতোর খসখসানি। যেন বোবার দেশে এসেচো। এক একসময় ইচ্ছে হবে চেঁচিয়ে সবাইকে হকচকিয়ে দাও। কিন্তু তাতেও বোধহয় কেউ কিছু বলবে না, একবার তোমার দিকে দেখে আবার কাগজে মন দেবে; আর মনে মনে বলবে হয়তো, অসভ্য! কিংবা ভাববে পাগল নাকি? ব্যস। তুমি চেঁচালে, ওটা তোমার পার্শোনাল ব্যাপার, কাজেই ইংরেজ তার মধ্যে নাক গলাবে না। কিন্তু আমরা হ'লে? হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে যেতাম তোমার কাছে, বলতাম কী হ'লো মশায়, কিছুতে কামড়েচে নাকি, ভূত দেখেচেন নাকি, মাথায় বরফ দেবো?—ইত্যাদি।

যাক, ট্রেন তো এসে গেল। তুমি বসলে এবং বসতে না বসতেই তোমার ষ্টেশন এসে গেল। এমনি চট্ ক'রেই এসে যায় কারণ ট্রাফিকের হাঙ্গামা তো এ ট্রেনকে পোহাতে হয় না; সে সব তোমার মাথার উপরে—রাজপথে। অর্থাৎ কেনজিংটন থেকে বেলসাইজপার্ক ষ্টেশন যেতে তোমার মিনিট দশেক সময় লাগবে এবং মাঝে চেরিংক্রসে ট্রেন বদল করবে বটে—তবে তাও ট্রাফিককে অষ্টরম্ভা দেখিয়ে—মাটির মধ্যেই। আর ঐ যদি তোমাকে ডবল ডেকারে যেতে হ'তো, তাতে দু'ধারের দোকানপাট আর সাহেব-মেম দেখতে পারতে বটে—কিন্তু হাইড পার্ক, পিকাডিলি, লিচেষ্টার

স্কোয়ার, টটেনহ্যামকোর্ট রোডে ঠেক্কা খেতে খেতে দশ-দশকে একশো মিনিট পার হ'য়ে গেলেও তবু গন্তব্যস্থানটিকে মনে হবে 'উই লিলি করচে।' ঠেক খেতে খেতে মেজাজ এমন বিগড়ে যাবে যে তোমার ইচ্ছে হবে ডবল ডেকার থেকে লাফ মেরে নেমে হেঁটে গেলেও হ'তো—পৌঁছে যাওয়া যেতো। তাই লণ্ডনে যত না ভিড় উপর পথে, তার দ্বিগুণ ভিড় তলাপথে। তাছাড়া শীত-বৃষ্টির দেশ—মাটির তলা দিয়ে যেতে আরামটাও বেশ, যেন লেপের তলা দিয়ে যাচ্চি ; আর পয়সা বাঁচানো না যাক, সময় বাঁচানো যায় বহুৎ। সময়-রাখা ইংরেজের বড় দরকারি যাতায়াতি পথ এই তলাপথ। কী মজার কলই বানিয়েচে ইংরেজ !

মাটির গর্ত থেকে হুস ক'রে মাথা তুলে উঠলাম যেখানে, সে ষ্টেশনটির নাম বেলসাইজ পার্ক, হ্যামষ্টেড হীথের কাছে। মিঃ রাও বললেন, এ বড় খানদানী জায়গা। এখানে কীটস্ বাস করতেন, আপনাদের রবিঠাকুরও বাস ক'রে গেচেন। লণ্ডনের এটা নাম করা জায়গা। শুনে মেজাজটা হুঁ হুঁ ক'রে উঠলো। তা' আশপাশ দেখে মনে হচ্চে বটে।

হ্যাভারষ্টক হিল পার হ'য়ে রসলীন হিলে পড়বার মুখেই মোড়ের মাথায় একটা বাড়ি দেখিয়ে মিঃ রাও বললেন, এই বাড়ি, দু' নম্বর। গেট খুলে ভিতরে নিয়ে গেলেন আমায়, সদর দরজা খুলে সোজা দোতলায়। দাঁড়াবামাত্র বারান্দায় টেলিফোনটা বেজে উঠলো, কাজেই বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হ'লো না— কাঠের সিঁড়িতে খটাখট শব্দ ক'রে নেমে এলেন এক শাড়িপরা মহিলা। আঃ। প্রায় চার মাস পরে শাড়ি দেখলাম। মনটা কেমন আনচান ক'রে উঠলো—প্রাণটা যেন আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠলো। আহা, আমাদের দেশের মেয়ে গো ! বাংলায় কথা বলে বাঁচবো।

ভদ্রমহিলা ইঙ্গিতে অপেক্ষা করতে ব'লে টেলিফোনটা ধরলেন। শুনলাম চোস্ত ইংরেজীতে কথা বলচেন। বেড়ে তো !

মিঃ রাও আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, উনিই মিসেস বেনারসী। বুঝলাম মিসেস ব্যানার্জী এখানে বেনারসী হয়েচেন। তা হোন্! অমন ইংরেজী বলেন, তার উপর লণ্ডনে তিনখানা বাড়ি। ক'লকাতায় জানি তো, সাগর পার না হ'য়েই অনেকে বোনারসে বা ভোস্ হ'য়ে যান—আর ইনি তো খাস লণ্ডনওয়ালী।

ভদ্রমহিলা টেলিফোন সেরে কাছে আসতেই গদগদ হ'য়ে বাংলায়

বললাম : নমস্কার, আপনার এখানে জায়গা হবে ? মি: রাওয়ের কাছে খোঁজ পেয়ে এসেচি। মিসেস ইংরেজীতে জবাব দিলেম : ইয়েস, হ'তে পারে। কেমন সন্দেহ হ'লো, ইংরেজীতে বললাম : আপনি বাংলা জানেন না ? নো ! উত্তর এলো। বললাম : ও, আই সী ! এখানকার রেট ? বললেন : এখন দু'চার দিন কমনরুমে থাকতে হবে; বেড, ব্রেকফাষ্ট, ডিনার সপ্তাহে দু' পাউণ্ড দশ শিলিং, সিংগল রুম হ'লে আড়াই শিলিং বেশি। বললাম, তথাস্তু, তবে সিংগল রুম একটা বিশেষ দরকার—লেখাপড়া করবার ইচ্ছে মনে। মিসেস গম্ভীর হ'য়ে বললেন : দেখবো পরে। কবে থেকে আসতে চান ? বললাম : কাল থেকে। বললেন: অ্যাডভান্স দেবেন ? বললাম : পকেটে দশ শিলিং মত আছে, চেক না ভাঙালে উপায় নেই। তেমনি গম্ভীর উত্তর : অল রাইট। এসেই দেবেন। ডু ইউ লাইক টু ষ্টে ?

ওবে বাবা ! মুখখানা একেবারে মেঘলা—এদেশী আকাশের মত। কন্টিনেণ্টে হাসিমুখ আর মিষ্টি কথা শুনে শুনে মেজাজটা ফুরফুরে হ'য়ে এসেছিল, মিসেসের দমকা হাওয়ায় রীতিমত দমে গেলাম।

মিঃ রাও বললেন : কী রাজী তো ? মিসেসের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললাম : রাজী। মিসেস খটাখট চ'লে গেলেন উপরে। আমি মি: রাওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

ঠিক পাঁচটায় কেনজিংটনে ফিরে প্রথম আশ্রয়ের সদর দরজার চাবি খুলে ঢুকতেই দেখি সামনে সেই গোলাপী মেডটি। আমার জিনিষগুলো দেখি তেমনিই পথের পাশে সাজানো। জিগ্যেস করলাম, ঘর রেডি ?

হেসে বললে : হ্যাঁ, আসুন স্যার আমার সঙ্গে।

গেলাম তিন তলায় তার পেছনে পেছনে। সামনের একটা ঘর খুলেই চমকে উঠলো মেয়েটি। তার ঘাড়ের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখি ঘর গোছানো হয়নি। বিছানার উপর লেপ ছড়ানো, অ্যাশট্রেতে ছাই, মেঝেয় কাগজপত্তর। ভেবেছিলাম, গিয়ে একটু গড়াবো—কিন্তু ঘরের অবস্থা দেখে মেজাজ গেল বিগড়ে।

মেড অনুনয় করলো : ঘণ্টাখানেক বাদে ঘুরে যদি আসেন, ঘর

রেডি পাবেন।

বটে, আমি পথে পথেই ঘুরে বেড়াই আর কি! তারপর আস্তানা যখন একটা ঠিক হ'য়েচে, স্বভাবতই মেজাজটা একটু 'টন্' হবারই কথা। বললাম ঃ দরকার নেই আমার ঘরের। টেলিফোন থাকে তো ট্যাক্সি ডেকে দাও, চ'লে যাই।

মেডটি তরতর ক'রে নেমে গিয়ে তার গিন্নীমাকে খবর দিতে গেল বোধহয়। আমার নামবার মুখে দেখা হ'য়ে গেল ভদ্রমহিলার সঙ্গে। অপ্রস্তুত হ'য়ে বললেন, আমি অ'ফুলি সরি, পাঁচটায় তোমায় ঘর রেডি হবার কথা ছিল, হয়নি। তোমার ট্যাক্সি ডেকে দিচ্চি।

বুঝলাম, কথা রাখতে পারেননি বলে লজ্জা পেয়েচেন ইংরেজ মহিলা।

লণ্ডনের তলাপথে না গিয়ে উপর পথে যাওয়া যে কী ঝকমারী—তা সেই সন্ধ্যেতেই বোঝা গেল। ট্যাক্সিতে মাল চ'পিয়ে নিজে তো চেপে বসলাম—এখন যেতে হবে দক্ষিণ থেকে উত্তর মুখো। খানিকটা চ'লে মাঝ সহরে এসে মোটর-বাসের মধ্যে প'ড়ে ট্যাক্সি দু'হাত এগোয় তো দশ মিনিট থামে। সেই সঙ্গে মিটারটাও যদি থামতো তো কথা ছিল—কিন্তু সেটি ঠিক তিন পেনীর লাফ মারতে মারতে এগিয়ে চলচে। ড্রাইভারকে জিগ্যেস করলাম ঃ এত ভিড় কেন? ব্যাপার কি?

ড্রাইভার বললে ঃ অফিস ছুটির সময়, তার উপর মোটর শো দেখতে যাবার ভিড়।

হা ঈশ্বর! মোটর শো যেন আমার আগে আগে পথ আগলে চলেচে! ছোঃ।

মনে হ'লো একবার, অত মিলিটারি কায়দায় না বেরিয়ে এলেই হ'তো। কিন্তু ফেরবারও উপায় নেই। উত্তরমুখো গাড়িকে দক্ষিণমুখোও করা যাবে না আর। চারধারে গাড়ি দিয়ে ঘেরা। মিটারটার দিকে একবার চোখ পড়লো—সর্বনাশ, ন' শিলিং ছ' পেন্স হ'য়ে গেচে ইতিমধ্যেই—অথচ পকেটে তো দশ শিলিংও পুরো হবে কিনা সন্দেহ। ব্যাঙ্কও সব বন্ধ—চেক ভাঙানো যাবে না। আরো তো উঠবে মিটারে—ভাড়া মেটাবো কেমন ক'রে? একেই তো ট্যাক্সিতে পশ্চাৎদেশ ঠেকালেই চোখ দুটো গিয়ে ঠেকে মিটারে—পকেট ভারি থাকলেও। আর এখানে বিদেশ-বিভুঁইয়ে পকেটের রেস্তর চাইতে মিটারের মার্কা বেড়েই চলেচে যে! ভাবলাম,

ভেকে লাভ নেই, যা হবার হবেই, ব'সো মন চুপ ক'রে!

ভেয়ার এসে যখন পৌঁছুলাম, মিটারে তখন বারো শিলিং ন' পেন্স। ড্রাইভার মাল নামিয়ে দিল। বললাম: দাঁড়াও আসচি। ভিতরে ঢুকেই দেখি হৈ হৈ ব্যাপার—সবাই খেতে এসেচে—ডিনার টাইম। সবাই ইণ্ডিয়ান। একজন ইণ্ডিয়ানকে হাতের কাছে পেলাম, বললাম: মিসেস বেনারসীকে খবর দিতে। তিনি গেলেন, এলেন এবং বললেন: তিনি এখন খুব ব্যস্ত, আপনি মাল নিয়ে কমনরুমে চলে যান। তিনি তো বলে খালাস হ'লেন, এখন আমি মাল খালাস করি কি ক'রে! শেষে বললাম তাঁকে বিপদের কথা: চেক দিচ্ছি, দশ শিলিং পেতে পারি? ভগবান জুটিয়ে দেন—ভদ্রলোক পকেট থেকে বার ক'রে দিলেন একটা দশ শিলিং, বললেন: চেক দেবার দরকার নেই। তক্ষুনি সোনা-পানা মুখ ক'রে ছুটে গেলাম ড্রাইভারের কাছে। ভাড়া এবং টিপস্ পনেরো শিলিং দিয়ে মাল খালাস ক'রে কমনরুমে উঠলাম। ভদ্রলোক আমার আপত্তি স্বত্বেও একটা স্যুটকেশ হাতে ক'রে পৌঁছে দিলেন। মি: বিশ্বনাথ তাঁর নাম, কেনিয়াতে দেশ, আফ্রিকাবাসী। ধন্যবাদ দিলাম তাঁকে। পরে ফেরত'ও দিয়েছিলাম তাঁর দশ শিলিং।

প্রথম ব্যাচের তখন খাওয়া হ'য়ে গেচে। টেবিল পরিষ্কার হ'তেই মি: বিশ্বনাথ আমাকে ব'সিয়ে দিলেন টেবিলের কোনে। খাবার এলো ভাত ডাল কপির তরকারি চাটনি। প্যারীর কপির কথা মনে প'ড়ে গেল। আসবার আগের রাত্রে রেস্তোরাঁতে এক ওয়েট্রেসকে বহু কষ্টে বুঝিয়ে আলু ভাজা আর বাঁধাকপির সেদ্ধ তো আনানো গেল—কিন্তু দেখা গেল কপির মাথায় কি একটা বস্তু চাপানো। জিগ্যেস করলাম: ওটা কি?

বললে: হ্যাম্।

ড্যাম্, সরাও ও ডিস্।

খুকী তাড়াতাড়ি কপির মাথা কেটে হ্যামের টুকরোটি উঠিয়ে নিয়ে বললে: খাও। চমৎকার লজিক। হ্যাম খাবে না। হ্যাম উঠিয়ে নিলাম, কপি খাও।

ইসারায় বললাম, ডিস শুদ্ধ নিয়ে যাও, ঘেন্না করে না বুঝি? বুঝলো ছাই, হ্যামের টুকরো নিয়ে চলে গেল কিচেনে। আমি শুধু আলুভাজা আর কফি গিলে—কপির দাম শুদ্ধ মিটিয়ে দিলাম। তখন ভগবান বোধহয় উপর থেকে দেখে বলেছিলেন, যা ব্যাটা, দুঃখু করিসনে—লণ্ডনে তোকে বাঁধা-

কপির ডালনা খাওয়াবো।

চামচ আর কাঁটা মারফত ডাল-ভাত-কপির তরকারিকে যথাসাধ্য কায়দায় চটকে চামচে ভ'রে মুখে ভরতে যাবো এমন সময় সামনে দেখি শিবপুরের নকাইবাবু, দিদির শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে আত্মীয়। আরে আপনি ?

নকাইবাবু বললেন : আপনি ? এ তীর্থের খবর পেলেন কি ক'রে ?

ভগবান জুটিয়ে দিলেন।

বললেন : আপনার রাখা সুটকেশে এয়ার লেবেলে আপনার নাম দেখে, দেখতে এলাম আপনাকে।

বললাম : বেশ করেচেন, আর একটু আগে এলে দশ শিলিং বার করতে হ'তো পকেট থেকে।—বললাম ব্যাপারটা।

বললে : খান, ঘরে ব'সে কথা হবে।

আমি খাবারে মন দিলাম। প্রায় দুটি মাস বাদে বেশ আরাম ক'রে চোখ বুজে বুজে, চিবিয়ে চিবিয়ে দেশী ডাল ভাত তরকারি খেলাম। চারিদিকে হিন্দী বুলি, বাঙ্গালী কথা, বাদামী চামড়া। মনে হ'লো দেশে এলাম।

হ্যাঁ, চরম দেশী ব্যবস্থা। বাথরুমের মেঝেয় জল, দাগী বেসিন, ফাটা আর্শি, ভাঙা ট্যাপ। কমনরুমটি মেসবাড়ির ঘর। দু'ধারে ছ'টি লোহার খাট, এলোমেলো বিছানা পাতা। একটি ড্রেসিং টেবিল, তাতে যত রাজ্যের বই। একটি টেবিল, তাতে দুধের বোতল ভরতি আর একটা ঘাড়ভাঙা টেবিল-ল্যাম্প। একটি বড সোফা, তাতে জামার তাগাড়।

নকাইবাবু "বারানসী তীর্থ"বাসীদের সঙ্গে এই নতুন "আমদানী"টির আলাপ করিয়ে দিলেন। অন্য ঘর থেকেও এক এক ক'রে অনেকেই গুটি গুটি এলেন। আলাপ জমলো।

আমার খাট নকাইবাবুর খাটের পাশে। একটি অবাঙ্গালী ছেলে এসে বিছানা ক'রে দিয়ে গেল। মিঃ ঘণ্টে।

নকাইবাবু বললেন, ছেলেটি কমার্শিয়াল আর্ট শেখে, থাকে খায় এখানে আর তার বদলে মাঝে মাঝে বিছানা পাতে আমাদের আর খাওয়ার পর এঁটো কুড়োয় রোজ।

ছেলেটির উপর ভক্তি হ'লো রীতিমত। বললাম তাকে, তোমার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। মৃদু হাসলো শুধু।

চারজন আর-জি-কর হাসপাতালের পাশ করা ডাক্তার একসঙ্গে এসেছেন এফ, আর, সি, এস পড়তে : অসিতবাবু, চিন্ময়বাবু, শৈলজাবাবু আর আগরওয়ালা। আগরওয়ালা নামে অবাঙ্গালী, ভাষায় আচরণে বিশুদ্ধ বাঙ্গালী।

আলাপ হ'লো বেঁটে মিঃ দত্তর সঙ্গে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়ে মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বেন ঠিক করেছেন। সেটা ভাল না লাগলে অন্য কিছু। গড়ানে পাথর। তিন বছর কাটিয়েছেন, আরো কতদিন কাটাবেন জানেন না। ধূমপান, মদ্যপান কিস্সু শেখেন নি—একেবারে নির্জলা হাইড্রোজেন্টিক। বাঙ্গাল টানে কথা বলেন; দত্তদা বললে গ'লে জল।

বিষ্টুবাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লো। চমৎকার চেহারা। চার পাউণ্ড হাতে ক'রে লণ্ডনের ডকে নেমেছিলেন, এখানকার কারখানায় টন-টন কয়লা ঠেলে পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স উপায় করেছেন। বি-এস-সি পাশ; একাউণ্টেন্সী পড়ছেন। দিনে এখন ইণ্ডিয়া হাউসে কাজ করেন, রাত্রে কলেজ, ফিরে এসে হাত পুড়িয়ে রান্না। এই তীর্থেই ছিলেন—এখন ঘর ভাড়া ক'রে থাকেন কাছেই, হাজিরে দেন এই আড্ডায় সময় পেলেই।

এলেন আর এক মিঃ ঘোষ আর্টিষ্ট। কার্শিয়াংয়ের স্কুলে আর্ট শেখান, এখানে হায়ার ষ্টাডিতে এসেছেন। পাতলা ছিপছিপে ভদ্রলোক, ফিটফাট পোষাক পরা, মুখে পাইপ। নম্র ছাত্রটির মত লোকের কথা শোনেন আর হাসেন, কথা বেশি বলেন না। বন্ধুটি তাঁর মিঃ চক্রবর্তী। দোহারা চেহারা। সেক্রেটারিশিপ পড়ছেন। ছুটিতে যেন তিলতণ্ডুলম্।

আর একজন নিয়মিত আগন্তুক এই তীর্থের। ডাক্তার তিনি। অবনীবাবু। লটের মধ্যে সব চাইতে বেঁটে, অথচ সবার 'বড়দা' তিনি—সবাই খুশি তাঁকে পেলে। কাছেই বেলসাইজ রেসিডেন্স্যাল ক্লাবে থাকেন—খাওয়ার বাচ-বিচার নেই, যা হয় পেলেই হ'লো। শীঘ্র যাবেন ম্যাঞ্চেষ্টারে বছরে ৭৪৫ পাউণ্ড মাইনেতে।

কোমর পর্যন্ত লেপটা টেনে আধশোয়া হ'য়ে আছি, নন্দাইবাবু এক অভিনব উপায়ে ইলেকট্রিক হিটারটা জ্বালালেন। আমার চারপাশে সবাই। বললেন, কন্টিনেণ্ট, মিডিলইষ্ট ঘুরে এলেন, গল্প বলুন ঘোষ সাহেব। অতএব জমানো গেল খানিকক্ষণ। সবাই খুব খুশি। কয়েকজন তো সঙ্গে সঙ্গে চেলা

ব'নে গেলেন আমার। তারপর দুধের বোতল। নকাইবাবু গরম ক'রে আনলেন। ডাক্তাররা বললেন, ঘোষসাহেব আগে আপনি খান, তারপর আমরা। কিছুতেই খাবো না, ওঁরাও ছাড়বেন না। ছোট ছেলেকে দুধ খাওয়ানোর জন্যে ধ্বস্তাধ্বস্তির মত। শেষপর্যন্ত চুকুচুকু খেতে হ'লো দুদু বিছানায় শুয়ে। ভাইদের সে আদর ভুলবো না কখনো।

শুধু ইশারায় বা ভাঙা দু'চারটে ইংরেজী বলে প্রায় দুটো মাস কাটাবার পর সবার মাঝে ব'সে খাস বাংলায়, লণ্ডনে আসর জমানো যে কী আরামের, তা' লিখে বোঝানো শক্ত। মিসেস বেনারসীর মেঘলা 'বেনারসী-তীর্থে' হাসির ঝিলিক দেখা দিল, হুল্লোড়ের বন্যা।

কিন্তু সব দরজা বন্ধ ক'রে। মনে মনে ভয় সকলেরই এই কেঠো মিসেসটিকে। শুনলাম, কাকে নাকি বলেছিলেন, এটা লণ্ডন, খেয়াল রেখো। ঘরের দরজা খোলা রাখলে তেড়ে আসেন। ড্রেসিং গাউন পরা অবস্থায় সন্ধ্যেয় ডাল-ভাত খেতে এলে বলে, ডিনারে প্রপার্লি ড্রেসড হ'য়ে আসতে পারো না? মানে, ইজেরের বুক-পকেট নেই কেন?

এমনিতর ঠাকরুণের কাছে দুধ গরমের প্যান চাইতে যাওয়া একটা দুঃসাহসিক ব্যাপার সন্দেহ নেই; কাজেই ওটির ভার দেওয়া ছিল অসমসাহসিক নকাইবাবুর উপর। তিনি প্যান চাইতে গেলে ডাক্তাররা জানলা খুলে দাঁড়িয়ে থাকতো, ঠাকরুণ তেড়ে এলেই টেনে হাওয়া দেবে জানলা টপকে। আমি থাকতাম হলের মাঝামাঝি জায়গায়—মধ্যস্থ হ'য়ে। যদি উনি তেড়ে আসেন এক হাতে ঠেকাবো, অন্য হাতে টেনে ধরবো ওদের ড্রেসিং গাউনের দড়ি। এমনতর অবশ্য ঘটেনি কোনদিন, তবে সম্ভাবনা ছিল না বলতে পারিনে। নকাইবাবু প্যান নিয়ে অক্ষত দেহে যখন ঘরে ঢুকতেন—আমরা ষ্ট্যাণ্ড-অ্যাট-ইজ হতাম নিশ্চিন্ত হ'য়ে। ঘিরে ধরতো সবাই, কি বললে মিসেস?

কৌতূহল হ'লো, জানতে হবে, এই মিসেসটি কোন্ জাতীয়া? স্ত্রী জাতীয়া তো বটেই, তবে বঙ্গললনা কিনা! ফর্‌ফর্‌ ইংরেজী বলেন, ভুলেও তো বাংলা বলেন না; আর মুখের ছাঁচটা দেখেও সন্দেহ হয়েছিল। পায়ের নখ থেকে গলা পর্যন্ত যে ছাঁচে তিনি তৈরি সেটি লম্বাটে নয়, বরং চওড়ার আধিক্য আছে এবং এ দিয়ে প্রাদেশিক পার্থক্য বোঝাও দায়। আঁট-সাঁট গড়ন, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, পায়ে মিডিয়াম হিল জুতো, পরনে সিল্ক শাড়ি।

কিন্তু মুখচন্দ্রমায় কি যেন নেই-নেই ভাব। অনেক ভেবে বার করা গেল, সেটি লাবণ্য। তরকারি তুমি যত ভাল করেই রাঁধো, যত রকমই মশলা দাওনা কেন, যদি নুণ বা লবণ দিতে ভুলে গেলে, তবে সব মার্ডার, বিস্বাদ। ঐ একটুর জন্যে সবটা নষ্ট। তেমনি নারীর কাঠামোয় যৌবন মাটি যথাস্থানে থাকলেও মুখের ছাঁচে যদি লাবণ্যের ঘাম তেল না থাকে—তবে সব থেকেও কিছু নেই সে নারীর—অন্তত: আমার চোখে। দু'গালের হাড় সামান্য উঁচু, খুব ছোট্ট কপাল, ঢোকানো চোখ নিয়ে মিসেস বেনারসী প্রথম দিনই যখন আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, বাঙ্গালী নয় বলেই সন্দেহ হয়েছিল আমার, কিন্তু রাওয়ের কথাই মেনে নিয়েছিলাম।

একদিন জিগ্যেস করলাম নতুন পাওয়া বন্ধুদের এবং সঠিক পরিচয় পাওয়া গেল তাঁর! মারাঠি মহিলা তিনি; পদবী ঠিকই, তবে ব্যানার্জীর অপভ্রংশ নয়। মিষ্টারটি আপাতত লণ্ডনে নেই, মেয়েকে নিয়ে ভারতে গেচেন। আগরবাত্তি, মশলা বহু রকমের ব্যবসা নাকি এঁদের—এই বোর্ডিং ব্যবসা ছাড়াও। আর নাকি অন্য রকমও—যাক্‌গে, সে সব কথা। আসল কথা, মহিলার কপাল ছোট্ট হ'লে হবে কি, বড় ভালো কপাল এবং মিষ্টারের সেজন্যে স্ত্রীভাগ্যে ধন। কারণ গত লড়াইয়ে অনেক ইংরেজই যখন লণ্ডনের বাড়ি বিক্রী ক'রে সহর থেকে দূরে সরবার তালে ছিল, তখন ঐ মিষ্টার (এখানে পণ্ডিত বেনারসী নামে পরিচিত) এবং তাঁর ঘরণী তাল বুঝে সস্তায় কাছাকাছি তিনখানি বাড়ি কিনেচেন। এখন হয়তো সেই ইংরেজরা নিজের আঙুল কামড়াচ্চে এবং এঁদের আঙুল ফুলে কলাগাছ!

ভদ্রলোককে যখন দেখিনি, শুধু তাঁর কথা কানে শুনেচি, তখন যাঁকে দেখেচি, সেই মিসেসের কথাই আর একটু বলা যাক। ভদ্রমহিলার ভাগ্য যেমন ভাল, স্বাস্থ্যও। সেটা মালুম হ'য়েছিল পরে সন্ধ্যেয় খাবার সময়। তিন বাড়িতে মোট বোর্ডার প্রায় পঞ্চাশ জন এবং দু' শিফটে ডিনার। ঐ সবগুলির জন্যে ময়দা মেখে দিস্তে দিস্তে রুটি বেলা এবং সেঁকা, গামলা গামলা ভাত আর তরকারি—দিনের পর দিন একা হাতে ক'রে যাওয়া—রীতিমত তাগদের দরকার! 'বেনারসী-তীর্থে' মিসেস 'শক্তিরূপেণ' সংস্থিতা।

এ হেন তীর্থে একদিন এক তরুণীর আবির্ভাব হ'লো। দিব্যি হাসি-হাসি মুখ, শ্যামল মেয়ে, ঠোঁটে ঘন লাল লিপষ্টিক, মাথায় বাঁধা লাল ফিতে। কাজল আঁকা চোখ। কুসুম। মিসেসের দূরসম্পর্কের নিকট

আত্মীয়া হয়তো। আমাদের খাবার দেবার ভার তার উপর ; অতএব খাবার পাবার ভরসাও তার উপর। মেয়েটির ফ্রকের বয়েস পেরিয়ে গেচে—তবু পরে। কারণ, লণ্ডন। ইংরিজী বলে ইংরিজী টানে। এতদিন অসুখে হাসপাতাল ছিল, ছুটি পেয়ে এসেচে।

আগে এই খাবার দেবার ভার ছিল মিষ্টার বেনারসীর ছেলে মাষ্টার বেনারসী, বিবেকের উপর। হলে আলাদা আলাদা তিন চারখানা টেবিল পাতা এবং আমরা বাঙ্গালীরা আগরওয়ালাকে নিয়ে একসঙ্গে ব'সতাম বাঙ্গালী টেবিলে। টেবিলে অয়েলক্লথ পাতা, প্লেটের ধারগুলো চটা ওঠা। দেশী হাতে পড়ে চামচগুলো শ্বেত-ভদ্রতা ছেড়ে স্বরূপ প্রকাশ করেচে। দেওয়ালে ঝুলচে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি, সামনে খাবার হাতে ঘুরচে মাষ্টার বিবেক। দুই বিবেকের সংস্পর্শে থাকায় আমাদের বিবেক কোনদিন অবিবেচনার কাজ করেনি। আর করবে কি সাহসে ? দেওয়ালে বীর সন্ন্যাসী সৈনিক এবং সামনে খাবার হাতে হাসি-ভোলা মাষ্টার বিবেক। 'হাসি ভোলা' বলা ঠিক হ'লো না ; তাতে বোঝায় একদিন হাসতে জানতো ছেলেটা। কিন্তু মনে হ'তো, এখানে পাঠাবার আগে ভগবান ওর মুখের মধ্যে হাসির হাওয়া পাম্পু ক'রে দিতে ভুলে গেচেন স্রেফ। আর্টিষ্ট ঘোষ একদিন বললে, ওটি রামগড়ুরের ছানা, হাসতে ওটির মানা। হয়তো বা।

কিন্তু হাসি-হাসি মুখ নিয়ে কুসুম যেদিন খাবার নিয়ে দেখা দিল আমাদের দেশী ডাইনিং রুমে, বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল সব টেবিলেই। সকলেই অনুভব করলে, দেওয়ালের বিবেকানন্দ নেহাৎই ছবি। কাজেই আমাদের বিবেক কেমন যেন একটু দুর্বল হ'য়ে পড়লো। বাঙ্গালী টেবিলে আমার কানের কাছে দত্তদা মুখ এনে বললে, কুসুমিত উপবন সৌরভরাশি, জোছনার মৃদু হাসি, ভেসে আসে পাপিয়ার তান। বিবেক তখনও মরেনি, তাই গানটা জোরে গাইলে না।

আগে মাষ্টার বিবেকের কাছে কিছু চাইতে হ'লে, আমরা গলাটাকে মোটা পর্দায় এনে চাইতাম। কিন্তু কুসুম আসার পর দেখা গেল আমাদের গলার স্বর রীতিমত নেমে গেচে। শুধু তাই নয়, কেমন একটা মোলায়েম মৃদু ভাব এসে গেচে। হাস্যময়ী কুসুমের কাছে কাতর অনুনয় শুধু : কুসুম চাপাটি প্লি ই জ ! কুসুম কারি প্লি ই জ। বাঙ্গালী টেবিলে শেষ-পর্যন্ত কুসুমের নাম হ'য়ে গেল : কুসুম চাপাটি।

কুসুম চাপাটি প্লি ই জ, কুসুম কারি প্লি ই জ, করতে করতে একটি অ্যাঙ্গালী ছোকরা যে ওদিকে 'চাপাটি-কারি' বাদ দিয়ে আমাদের অলক্ষে শুধু 'কুসুম প্লি ই জ, কুসুম প্লি ই জ' করচে তা' আমরা বুঝতেও পরিনি। বুঝলাম পরে। একদিন আমরা সিনেমা দেখে ফিরচি তীর্থে, দেখি ছেলেটির সঙ্গে কুসুম সেজেগুজে বেরুচ্চে বেড়াতে। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে চোখ দুটো বড় বড় ক'রে দেখলাম। কুসুম চাপাটিকে নিয়ে ছোকরাটি যেন আমাদের চাঁটি মেরে বেরিয়ে গেল।

সুতরাং আমরা অনেক আলোচনার পর সাব্যস্ত করলাম, যাকগে, ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই। ওতে খরচ শুধু—যার অন্ত নেই। আর মিসেসের অগোচরে যদি ঐ ভ্রমণ-ব্যবস্থা হ'য়ে থাকে, তবে পরের ব্যবস্থাটি তুলো-ধোনা। আর জ্ঞাতসারে যদি হ'য়ে থাকে, তবে শেষ পরিণতি ঐ ছোকরার গলায় কুসুমের মালা। অতএব আমরা যা করতে এসেচি তাই করি।

তাই করিতে লাগলাম। ডাক্তাররা মেডিকেল জার্ণালে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে চাকরির জন্যে দরখাস্ত শুরু করলেন, আর আমার রইলো ট্রাভলিং এজেণ্ট পাকড়ে বেড়াবার চেষ্টা। সেই সঙ্গে নিজের কিছু কিছু কাজ গুছোতে অফিস-অফিস যাওয়া।

লণ্ডনে যেদিন আসি, তারপর দিনই নকাইবাবুকে নিয়ে অল্ড্‌উইচে ইণ্ডিয়া হাউসে ঢোকা গেল। দুপুরে ওখানে সব রকম দেশী খাওয়া পাওয়া যায়। বাড়িটা বিরাট এবং সহরের বুকেই। দেখলে বুকটা ফুলে ওঠে। আমাদের স্বাধীন ভারতের ইণ্ডিয়া হাউস। এন্‌কোয়ারিতে এক সাহেব ব'সে। 'ইণ্ডিয়া হাউসের' বিষয়ে এবং ইণ্ডিয়ার বিষয়ে বোঝাবার ভার তার উপরে। বাইরে জানালায় ভারতীয় জিনিষ পত্র, ছবি সাজানো। ভিতরে ঢুকে বাঁ দিকে ছোট হল, ডানদিকে সিনেমা হল, লাউঞ্জ, লিফ্‌ট। রোজ আড়াইটায় ছবি মারফত ভারতীয় খবর জানানো হয় সিনেমা হলে বিনা দর্শনীতে। লাউঞ্জে বেশির ভাগই বিলিতী পত্রিকা, দোতলায় লাইব্রেরিতে সব রকম দেশী সংবাদপত্র। আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, হিন্দুস্থান ষ্ট্যানডার্ড পাওয়া যায়, প্রায় টাটকা খবরে ভরা।

লিফ্‌টম্যান দু'জন ইংরেজ, দিন-ভোর ওঠা নামা করচে—দুপুরের দিকে ঘনঘন। তখন সবাইয়ের লক্ষ্য ক্যান্টিনের দিকে। নানান ডিপার্টমেণ্টে

ভর্তি বাড়িটা। তবুও কুলোয়নি ব'লে অন্যান্য জায়গায় বাড়ি ভাড়া ক'রে কাজ চালানো হচ্ছে—সেখানেও আছে দেশী খাবারের ব্যবস্থা। সামনে একজিটার ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস্ হোষ্টেল।

ইণ্ডিয়া হাউসের ক্যাণ্টিনে হরেকরকম্বা দেশী খাবার। ডাল ভাত, চাপাটি, মাংস, নিরামিষ তরকারি, পোলাও, চাটনি, দৈ, পাঁপড় চা-কফি ইত্যাদি। এক শিলিং ন' পেন্স থেকে যত বাড়তে পারো ততই বাড়বে রকমারি খাবার। ক্যাফেটোরিয়ার মত সেলফ সার্ভিসের ঘরটায় ভিড় বেশি, কাজেই প্রায় কিউ হয়ে দাঁড়াতে হয়। আর যদি খুব খিদে পেয়ে থাকে আর পয়সার মায়া না থাকে তবে পাশের সার্ভিসের ঘরে একটা টেবিলের সামনে ব'সো গিয়ে, ঐ খাবারই হাসি-হাসি ওয়েট্রেস দেড়া দামে সার্ভ করবে'খন।

ইণ্ডিয়া হাউসের ক্যাণ্টিনে যে শুধু ইণ্ডিয়ানরাই গুলজার করে, তা নয়। দেখবে তোমার চারধারে জগতের প্রায় সব জাত। চীনে, নিগ্রো, মালয়ী, সিংহলী, পাকিস্থানী, আমেরিকান, ইংরেজ এবং ক্যাণ্টিনেণ্টের প্রায় সবকটা জাতের পুরুষ-মেয়ের বহুত ভিড়। ডাল ভাত তরকারি চিবোচ্চে কাঁটা-চামচে ক'রে পরম আরামে। জলো সেদ্ধ খেয়ে খেয়ে মশলার স্বাদ একবার যে পেয়েচে, তাকেই বোধ হয় ঘুরে ফিরে আসতে হয় এইখানে ঐ দেশী রান্না খেতে। বাঘের বাচ্চার রক্তের স্বাদ পাবার মত। বিশেষ ক'রে বিলিতী জলো জিবেয় ঝাল তরকারি পড়লে প্রথম কয়েকদিন উঃ-আঃ করে আর জল খায়, তারপর খায় আর আঃ—আঃ করে আরামে। সব চাইতে মজা লাগে দেখতে—রাঙানো ঠোঁট ফাঁক ক'রে মেমসাহেবদের ডাল ভাত মুখে ভরা—সাবধানে চামচে ক'রে। অবশ্য ঐ একই কারণে ক্যাণ্টিনে আমাদের দেশী মেমসাহেবদের খাওয়াও দেখবার জিনিষ। ডাল ভাত খাবার ইচ্ছে থাকলেও, সপাসপ্ মেরে দেবার উপায় নেই। তার মানে, ভাত খাওয়া গেল, অথচ ভাত খাওয়ার মজাটা পাওয়া গেল না। পিঁড়ি বা আসন পেতে ব'সে, ডালে ভাতে পাঁচ আঙুলে মেখে, মুখ ভর্তি চিবোতে থাকা, আর মাঝে তরকারি বা ভাজার চাটু আর মড়মড়িয়ে মুড়ো ভেঙে মুখে ভরা—সে মজা কাঁটা চামচেয় হয় না। ইণ্ডিয়ার চাল, ইণ্ডিয়া হাউসে বিলিতী চালে খাওয়া হয়।

বিলিতী চালে বিলিতী খানার মত ফাঁকিবাজি খাওয়া, আর কোথাও

আছে কিনা সন্দেহ। শুধু সেদ্ধ আর টিনে আঁটা খাবার। মশলা বলতে গোলমরিচের গুঁড়ো আর নুণ। ইচ্ছেমত দিয়ে নাও। সুবিধে অনেক, গৃহিণীর রাঁধতে সময় লাগে না, টেবিলক্লথে হলুদ-মশলার দাগ লাগে না, রান্না খাওয়ার শেষে ঝামা দিয়ে কড়া ঘসতে হয় না। শুধু বাইরে বাহার। যত না খাবার—তার চাইতে বেশি কাঁটা-চামচ আর প্লেট। খেলে হয়তো মাখন রুটি, জ্যাম, আলুভাজা, ডিম, কফি তার জন্যে প্লেট এলো দশখানা, কাঁটা পাঁচটা, চামচ পাঁচটা, নুণ-মরিচের শিশি, চিনির বাটি-চামচ, জল-গেলাস, কোলে পাতবার রুমাল, ফুল সমেত ফুলদানি (শেষের ক'টি খাবার জন্যে নয় অবশ্য)। তারপর তুমি খেতে বসবে। খেতে বসবো বললেই হ'লো না। জামা-জুতো প'রে, নেকটাই এঁটে (সার্টের কলারটা যেন আবার ঢিলে না থাকে! ঢোঁক গিলতে কষ্ট হয়, হোক) চেয়ারে কাঠ হ'য়ে ব'সে এদিক ওদিক না চেয়ে, বাঁ হাতে কাঁটা, ডান হাতে চামচে (ওলোট পালোট হ'য়ে গেলে লজ্জার কথা) নিয়ে অল্প অল্প ক'রে খাবে, এবং দেখবে দু'হাত চালিয়েও পেট কিন্তু ভাল ক'রে ভরেনি। ওসব কাণ্ড সামাজিক ব্যাপারেই বেশি হয়, রেষ্টুরেণ্টে নয়। রেষ্টুরেণ্টে যা দরকার চাও, খাও, টাকা দাও।

নকাইবাবুর অন্য কাজ থাকায়, তার সঙ্গ ছাড়তে হ'লো। এতক্ষণ বেশ একটা অবলম্বন পাওয়া গেছলো; কোন্ পথে কোথায় যাবো জিগ্যেস করবার দরকার ছিল না, তাই চোখ মেলে চারধারে দেখতেই ব্যস্ত ছিলাম। এবার হাতড়াতে শুরু করলাম। তবে আশা এই যে, কাউকে কোনো জায়গার কথা জিগ্যেস করলে বলে দেবে, আর না জানে তো সোজা জানাবে, সরি, জানিনে। বাজে 'এঁ্যা-উঁ' ক'রে এদিক-সেদিক পাঠিয়ে দেবে না তোমায়।

তবে তেমন তেমন লোকের পাল্লায় পড়লে বিপদ। একদিন পথ হারিয়ে পথে এক টপ-হ্যাট পরা ঢেঙা ভদ্রলোককে আমার গন্তব্য স্থানটা বাতলে পথের হদিশটা জিগ্যেস করলাম—কী কুক্ষণে জানিনে। ভদ্রলোক তো পরম উৎসাহে ডাইনে-বাঁয়ে এগিয়ে-পেছিয়ে কতটা যেতে হবে সব বলে, বললেন, সামনে একটা পার্ক পাবে, সেখানে একটা ষ্ট্যাচু আছে, সেই ষ্ট্যাচুর সামনের বাড়িটা; এবং সেই সঙ্গে ষ্ট্যাচুটির জীবন্তকালের প্রায় সবটা জীবনী ব'লে গেলেন আমায়। ভদ্রলোক হয়তো কোন স্কুলের হিষ্ট্রির মাষ্টার এবং আমাকে একটি নতুন চেহারার লোক পেয়ে প্রায় ছাত্র

স্থানে তাঁর দেশের কর্মবীরটির কীর্তি বোঝাতে শুরু করেছিলেন। অবশ্য আমিও তাঁর কথার তালে তালে ফাঁকিবাজ ছাত্রের মত দিব্যি মাথা নেড়ে যাচ্ছিলাম, স্রেফ কেটে পড়বার সদিচ্ছায়। কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎ তাঁর বক্তব্য শেষ ক'রে বললেন, কী বুঝলে বলো তো ?

এইরে! ভদ্রলোক পড়া ধরতে চান যে ?

তাড়াতাড়ি বললাম, ও আমি খুঁজে নেবো'খন। থ্যাংকু!

কিন্তু কমলি নাহি ছোড়েগা। বললেন, না, না, তুমি পথ হারিয়ে ফেলবে। ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিই আবার। .. অতএব আবার শুরু হ'লো সেই পথ বোঝানো আর ষ্ট্যাচুর জীবনী পড়ানো!

শেষ পর্যন্ত, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থায় কোন রকমে পড়া দিয়ে তবে পেলাম ছুটি!

তবে সামনে যদি লণ্ডন-পুলিশ বা 'ববি' কাউকে পাও তো কথাই নেই। সেই 'ছ'ফুটি'টির দিকে নিজের ঘাড়টি যথাসম্ভব মুচড়ে উপর দিকে তুলে জিগ্যেস করবে তোমার জিজ্ঞাস্য। আর সে তার ঘাড় এবং চোখ নীচু ক'রে তোমার দিকে চেয়ে হয়তো বলবে : সামনের রাস্তার দুটো মোড় পার হ'য়ে ডান দিকে গিয়ে তিনটে মোড় পার হ'য়ে বাঁ দিকে বেঁকে ছ'টা মোড় পার হ'য়ে আবার বাঁ দিকে বেঁকলে চারটে বাড়ির পরে যে পথটা—সেইটা হ'চ্চে আপনার গন্তব্য স্থান। এক্ষেত্রে তোমার অবস্থা যে কী হবে তাতো আমি জানি! হুঁ হুঁ ক'রে মোচড়ানো মাথা নাড়াবে, অথচ মাথায় কিছুই ঢুকবে না। তবু 'থ্যাংকু' বলে কেটে পড়বার তালে থাকবে এবং কাটবেও ; কারণ, ভালো করেই জানো যে, খানিকটা এগুবার পর আর একটি 'ছ'ফুটি'র শরণাপন্ন হ'তে তোমাকে হবেই এবং হলেও কোন বাধা নেই। অথচ এ 'ছ'ফুটি'টি যখন বললে, ভালো ক'রে বুঝেচেন তো স্যার ? তুমি 'স্যার' হ্যাঁ-হ্যাঁ করে সায় দিয়ে দিলে।

তবু পথ চলতে নতুন লোকের, এই লণ্ডন পুলিশ ছাড়া উপায় নেই! এদের ভদ্রতা, আর রাস্তা জ্ঞান অবাক করে দেয়! তবে একদিন একটি 'ছ'ফুটি' দিতে পারলে না আমার পথের খোঁজ। হয়তো ঐ ওটি নতুন ঢুকেচে কাজে। কারণ প্রায় নাকের গোড়া পর্যন্ত টুপি ঢাকা থাকলেও তার মুখখানা কচি কচি বলেই মনে হ'লো। বয়সটা বেশি নয়, তবে লম্বাটা বেশি, তাই হয়তো চাকরি পেয়েচে পুলিশে।

বিলিতী পুলিশের চাকরি হেলাফেলার জিনিষ নয়। অন্য চাকরিতে অন্য দেশের লোকেরা এসে মাথা গলাতে পারে একটু চেষ্টা করলেই, কিন্তু এই পুলিশের চাকরি ইংরেজ ছোকরাদের একচেটিয়া। সেখানে অন্য কারোর নাক গলাবার সাধ্য নেই; ইংরেজ এককালে ভু-ভারত শাসন করে এসেচে, এখন না হয় তার পড়তা খারাপ, তা বলে নিজের দেশেই অন্যের হাতে রুলকাঠ দিয়ে বলবে, আমাদের পথ ঘাট রুল করো? মাথা খারাপ! অথচ লোকাভাব। তাই প্রায় পত্র পত্রিকায় স্কটল্যাণ্ডইয়ার্ডের মেট্রোপলিটান পুলিশ দপ্তর থেকে লোভনীয় বিজ্ঞাপন বার হয়: এ অতি উত্তম চাকরি, পুরুষসিংহের চাকরি, নানা সুখ সুবিধে, অবশ্যম্ভাবী উন্নতি, বিনা পয়সায় থাকা বা সস্ত্রীক থাকবার সুব্যবস্থা, আর মাইনে? বছরে ৪৪৫ পাউণ্ড এবং লণ্ডন সহরের জন্য বাড়তি ২০ পাউণ্ড। অর্থাৎ মাসে প্রায় ৩৯ পাউণ্ড, আমাদের টাকায় পাঁচশ'র উপরে। এজন্যে ইংরেজ তনয়ের দু'টি সদ্‌গুণ থাকা দরকার; বয়সটি হওয়া চাই উনিশ থেকে তিরিশের মধ্যে এবং আপাদ মস্তকের খাড়াই মাপটি হওয়া চাই কমসে কম পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। (তারপর হেলমেট আকারের টুপি দিয়ে সেটিকে করা হয় ছ'ফুটি বা তদূর্দ্ধ) উপরন্তু ছোকরার পেটে বিদ্যে (ওটি তো ওদের কমপালসারি ব্যাপার) আর দেহে স্বাস্থ্য থাকলে—দেখতে হয় না আর, চাকরি হবেই।

নকাইবাবু-ছাড়া হ'য়ে রাস্তা হাতড়াতে হাতড়াতে এসে পড়া গেল পিকাডিলি সার্কাসে। বিলিতী এসপ্লানেড। জগৎজোড়া নাম অথচ একটুখানি খোলা জায়গা—এসপ্লানেডের ও অর্ধেক। মাঝখানে এরস মূর্তি, গিলবার্টের তৈরি। চারদিকটা তার বাঁধানো। সেখানে বসে থাকে দু'চারজন হাতে-কাজ-না-থাকা খেয়ালী লোক। এ রেওয়াজ নাকি আগে ছিল না। এটিকেট দুরস্ত ইংরেজ যেখানে সেখানে ব'সতো না সহজে। কিন্তু গত যুদ্ধটা সব দেশেরই হাল চাল বদলে দিয়েচে। যুদ্ধকালীন মার্কিনী সেপাইরা লণ্ডনে এসে ঐ এরস মূর্তির তলায় ব'সে মোটর গাড়ি আর লোক চলাচল দেখতো নাকি পিকাডিলির। পরে মার্কিনী সেপাইরা চ'লে গেচে, রেওয়াজ কিন্তু রয়েই গেচে তেমনিই।

পিকাডিলি লণ্ডনের একটা খানদানী জায়গা। লণ্ডনারদের একটা কথাই আছে, কারোর সঙ্গে দেখা করতে চাও, পিকাডিলিতে যাও, নির্ঘাত দেখা পাবে। মানে, লণ্ডনে এমন লোক খুব কমই আছে, যাকে রোজই

প্রায় পিকাডিলির ফুটপাথ না মাড়াতে হয়। কারণ আছে। নাম করা সব রাস্তাগুলো যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েচে এই পিকাডিলিতে। রিজেণ্ট ষ্ট্রীট, সাফ্‌ট্‌সবেরী এভিনিউ, লিচেষ্টার ও ট্রাফালগার স্কোয়ারের পথ, হে-মার্কেট ষ্ট্রীট, হাইডপার্কে যাবার পিকাডিলি রোড যে যেদিক দিয়ে পেরেচে, এসে বুড়ি ছুঁয়েচে পিকাডিলি সার্কাসে। ওয়েষ্ট-এণ্ডের বনেদী দোকান পাট এখানেই। সিনেমা থিয়েটার নাইট-ক্লাবও একোনে সেকোনে কম নেই। এখানকার মাটির তলায় গোলাকার টিউব ষ্টেসনটাই সব চাইতে বড়। চার কোণে তার নামবার পথ। রাত্রে পিকাডিলির আলোর বাহার যা, আমাদের এসপ্লানেডের আলো তার কাছে হ্যারিকেনের বাতি।

পথে একখানি ছোট্ট বই 'লণ্ডনী পথ-নির্দেশক' কিনে নিয়ে তার পেচনে সাঁটা ম্যাপখানি খুলে ধরলাম। ইচ্ছেটা হাইড পার্কের দিকে পা বাড়াবার। পিকাডিলির গোলক-ধাঁধাঁয় ঢুকলে কোন্ পথে পা বাড়ালে কোথায় ঠিক যাওয়া যাবে বোঝা দুষ্কর। আর কাঁহাতকই বা ছ'ফুটিদের আর লোকেদের বিরক্ত করা যায়। সঠিক পথটি বার ক'রে কিছুক্ষণ চলবার পর যে পার্কের সামনে পড়া গেল, ঢোকবার সাইনবোর্ডে দেখি—নাম তার গ্রীণ পার্ক। আহা, সত্যিই গ্রীণ! ইঁট-লোহা-সিমেণ্ট-পীচের ফাঁকে এই সবুজ ফাঁকটুকু বড় নয়নাভিরাম। এমনটা না হোক, এধরণের ছোট ছোট ফাঁক লণ্ডনের প্রায় সর্বত্র। যেখানে পেরেচে চৌকো পার্ক বা স্কোয়ারের নামে খানিকটা জায়গা রেখেচে একটু ফাঁকা নিঃশ্বাস ফেলবার জন্যে। চমৎকার ক'রে সাজিয়েচে সেটা ফুল-লতা-পাতায়, বেঞ্চ পেতে দিয়েচে বসবার জন্যে। সব পাড়াতেই প্রায় বাড়ির সামনেই একটু ক'রে খোলা জায়গা—বাগান। পথের দু'ধারে গাছের সারি। বন-মহোৎসব এদের অনেকদিন আগেই সারা হ'য়ে গেচে। ওদেশের লোকেরা ভাবে, ভারতবর্ষ বন-জঙ্গলে ভর্তি, বাঘ-ভালুকের বাসস্থান। তারা এলে হকচকিয়ে যেতো, দেখতো, গাছপালারা ঠেসাঠেসি ক'রে আছে বনজঙ্গলে, সহরগুলি আমাদের বিশুদ্ধ সহর, গাছপালা সেখানে অপাংক্তেয়। রাস্তায় ড্রেন ঘেঁসে সব বাড়ি। আর পার্ক? যে পাড়ায় আছে তার বাসিন্দারা—বাইবেলি-ভাষায় স্রেফ যাকে বলে 'ঈশ্বর-পুত্র'।

ওয়েলিংটন আর্চের গা ঘেঁসে একটু এগিয়ে রয়াল আর্টিলারীর স্মৃতি স্থানটির চারপাশটা এক পাক ঘুরে হাইডপার্ক কর্ণারের তিন দরজার গেটের কাছে গেলাম। পার্কের গেট দিয়ে মোটর ঢুকচে, মানুষও ঢুকচে। যান

ও জীবন্তের সমান অধিকার। ঢুকলাম পার্কে। কী খেয়াল হ'লো, বাম-পন্থীদের মতো বাঁয়ে বেঁকে গেলাম। খানিকটা গিয়ে সামনে পেলাম জলাশয়! সার্পেনটাইন। জলের ধারে বেঞ্চ পাতা। একটায় বসা গেল। সামনে জল ছলাৎ ছলাৎ করছে। জলের কিনারায় সাদা কালো হাঁস। মায়েরা এসেছে বাচ্চাদের প্র্যামে চাপিয়ে। ছেলে মেয়েরা জলের ধারে হাঁসগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত। সামনে পায়ে হাঁটা পথে মেয়েরা পুরুষেরা চলছে, একটু ঢিলে তালে। একটি ছোট্ট মেয়ের নজরে পড়লাম আমি। নতুন কিছু নিশ্চয়ই, তাই তার মায়ের হাতে হাত ধরা মেয়েটি, ঘাড়টা বেঁকাতে লাগলো যতটা পারে আমাকে দেখবার জন্যে।

পাতা ঝরার পালা সারা। গাছের ডালগুলো সব ছাড়া-ছাড়া। সবুজ ঘাসের 'পরে, কালো পীচের পথে হলুদরঙা ঝরাপাতা। দূরে গাছের প্রাচীরে ধোঁয়া ধোঁয়া আবছা আলো—ফ্যাকাসে সবুজ। এমনি জলের ধারে ঘাসে ব'সে মড়মড়িয়ে চীনেবাদাম ভেঙে কড়মড়িয়ে খাওয়া নিয়ম। নিয়ম আমাদের দেশে; কিন্তু যস্মিন্ দেশে যদাচার। এখানে জলের ধারে বেঞ্চে ব'সে চকোলেট খাওয়া যেতে পারে। যেতে পারে? দেখলাম, তা পারে। কাছাকাছি আড়চোখে দেখবার মত লোকের অভাব। ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে অনুভব করলাম। হ্যাঁ, আছে গোটা চারপাঁচ টফি। বার করলাম একটা, খুললাম মোড়ক, দিলাম মুখে। ছুঁড়ে ফেলতে যাবো মোড়কটা, হঠাৎ খেয়াল হ'লো, এটা ইংরেজের দেশ। মোড়কটা পকেটে ভরলাম। এখানে গাছের ঝরাপাতা পড়তে পায় নিয়ম মত বছরে একবার, পথে কুটো-কাগজ ফেলা অনিয়ম। আরে ধ্যেৎ! টফিটা তো পেটেই গেল, কিন্তু তার খোলসটা যদি চোখের সামনে প'ড়ে না থাকে, তবে খেলামটা কি তা' বুঝবো কেমনে? জিবের সুখ হ'লো, চোখের সুখটা হ'লো না। চীনেবাদাম খেয়ে যত না আনন্দ, চোখের সামনে ছড়ানো একগাদা ছাড়ানো খোসা দেখলে আনন্দ ততোধিক। নেমন্তন্ন বাড়ির দরজার সামনে এঁটো কলাপাতা, মাটির গেলাস, আর নষ্ট তরিতরকারিই যদি না থাকলো, তবে সে নেমন্তন্ন বাড়ির কৌলিন্য কোথায়? ইংরেজের চাল ঘড়ি আর ঝাড়ু মার্কা—গাদা আর গদীর বাদশাহী চাল, অচল এদের কাছে। জাতটা আমাদের এতটা কাল শাসন আর শোষনই করলে, হাতে ক'রে দিলে না কিছু, হাত পেতে নিলেও না কিছু।

বসতে আসিনি এ দেশে। চলতে হবে, ঘুরতে হবে, দেখতে হবে। উঠে দাঁড়ালাম। হাইড পার্ক থাক এখন। গাছ নয়, লোক দেখা দরকার। লোক আর লোকালয়। পথ-নির্দেশকখানাকে নাকের সামনে মাঝে মাঝে ধরে এসে পড়লাম ট্রাফালগার স্কোয়ারে। প্রথমেই নজর পড়লো 'নেলসন কলম'টির প্রতি। বিরাট উঁচু স্তম্ভ, মাথায় একটি মনুষ্যমূর্তি। ওটি যখন 'নেলসন কলম' তখন ওটির ডগায় নিশ্চয়ই নেলসন সাহেবেরই মূর্তি। তবে নীচেয় দাঁড়িয়ে ঘাড় ভেঙে উপরের দিকে তাকিয়ে বোঝা দায়। শুনেচি, ভদ্রলোক এক উঁচু দরের বীর ছিলেন। ইংরেজকে বাঁচিয়েছিলেন রাজনৈতিক অধঃপতন থেকে। কৃতজ্ঞ ইংরেজ তাই বুঝি তাঁর পাথুরে মূর্তিকে অত উঁচু থামের মাথায় চাপিয়ে রেখেচে, সর্বোচ্চ সম্মান দেখিয়ে। থামের দুই কোনে দুটি সিংহ। ব্রিটিশ সিংহ। ব'সে আছে, যেন বিশ্রাম করচে লড়াইয়ের পর। দু'পাশে দুটি ফোয়ারা সমেত জলাধার—উত্তাল সমুদ্রের ছোট্ট সহুরে সংস্করণ। ইংরেজের তিন বৈশিষ্ট্য এই ট্রাফালগার স্কোয়ারে: দম্ভের স্তম্ভ, সাহসের সিংহ, দ্বীপবাসীর জল প্রীতি।

ট্রাফালগার স্কোয়ার, আমাদের কলেজ স্কোয়ারের চাইতে মাপে বড় নয়, কিন্তু জগৎজোড়া নাম, ব্যস্ততা তার চারদিকে। মাঝখানে ফোয়ারা, পাথরের সিংহ আর উড়ন্ত পায়রায় মাঝখানটা জমজমাট। ইংরেজ মিশুক নয়, কিন্তু ট্রাফালগার স্কোয়ারের ইংরেজী পায়রাগুলো ভারি মিশুক। একবার তাদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে হয়, তোমার হাতে এসে বসবে, ঘাড়ে এসে বসবে, মাথায় চড়েও বসে। আর হাতে যদি মটরদানা থাকে তো কথাই নেই, হাত থেকে খুবলে খাবে। ব্যবসায়ী ইংরেজ তাই কাছেই মটরদানা নিয়ে ব'সে থাকে আর খদ্দের ডাকে। আর ডাকবে তোমায় ফটোগ্রাফাররা: তুমি পায়রাকে খাওয়াও, তোমার ঘাড়ে মাথায় পায়রা বসলে, আমি তোমার ফটো তুলে দেবো, এঁ্যা? রাজী হলে কিছু খসলো তোমার। কোনো ইংরেজ তোমার সঙ্গে যেচে বা ডেকে কথা বলবে না, কিন্তু ইংরেজ ব্যবসাদার বলবে এবং এত মিষ্টি ক'রে বলবে যে, তুমি 'না' করতে পারবে না। কথা বললে যেখানে পয়সা পাওয়া যায়, সেখানে এরা মিষ্টি কথায় পঞ্চমুখ।

ট্রাফালগার স্কোয়ারের চারধারে যখন তাড়াহুড়ো আর হুড়োহুড়ি, মোটর আর মোটরবাসের ঘুরপাক, তখন তারই মাঝখানে একদল নিশ্চিন্ত লোকের পায়রা নিয়ে সময় কাটানো, কেমন যেন বেখাপ্পা ব্যাপার।

আরো মজার ওখানকার ফুটপাথ। ফুটপাথে চমৎকার সব ছবি আঁকা। কুকুরের ছবি, মেয়ের ছবি, নানা রকমের দৃশ্য। ছবিগুলোর পাশে একটা টুপি ওল্টানো, গোটা কতক পেনিও তাতে আর টুপির কাছে খড়ি দিয়ে লেখা 'থ্যাঙ্ক ইউ'। কোথাও আর্টিষ্ট আঁকচে হাঁটু গেড়ে ব'সে। পাশে নানা রংয়েব খড়ি। এরা পেভমেণ্ট আর্টিষ্ট—পথ-শিল্পী।

এরা আঁকে আর ছিঁচকাঁদুনে বৃষ্টি নেমে জলোপায়ে মুছে দেয় এদের ছবি। কিন্তু এরাও ছাড়ে না, ফুটপাথ শুকনো পেলেই, আবার আঁকতে বসে। নেশা, আঁকার এবং পয়সার।

অথচ ঐ ফুটপাথের উপরেই বিরাট চিত্রশালা—ন্যাশনাল গ্যালারী। বড় বড় শিল্পীদের বড় বড় ছবি জলজলে ফ্রেমে বাঁধানো, বিরাট প্রাসাদে সযত্নে সাজানো। সেখানে তোমার আমার ফ্রি অ্যাডমিশন, কিন্তু রোদ বৃষ্টি হাওয়ার নো-অ্যাডমিশন। মহাকালও বুঝি কাঁচের দরজা-জানালা ঠেলে ঢুকতে পারে নি সেখানে। পাজী 'নাজী-বোমা' নাকি হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে ছিল ঐ চিত্রশালার একাংশে। স্মৃতি-বিলাসী ইংরেজ তাড়াহুড়ো ক'রে বেমালুম সব ধ্বংসোদ্ধার করেচে।

খানিকটা এগিয়েই অ্যাডমিরালটি আর্চ। সেখানে সিঁড়ি বেয়ে নেমেই ম্যালের চওড়া রাস্তা। ফাঁকা চকচকে পথ। দু'ধারে গাছের সার। পথ পার হ'য়েই সেণ্ট জেমস পার্ক। মনোরম। নির্জন। আঁকা-বাঁকা পথ। চারিধারে গাছের মেলা, ঝোপ-ঝাড়। এখানেও জলাশয় আর জলবিহারী হাঁস। দিব্যি এগুচ্চি, ঘোড়াচড়া-রক্ষীদের আস্তানাটা বাঁয়ে রেখে, একটু যেতেই হঠাৎ ডাইনে চোখ পড়লো।'কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে, তেমতি লণ্ডনীয় দুই নাগর নাগরী নির্জন এক বেঞ্চে চুম্বনাবস্থায় আলিঙ্গনাবদ্ধ।' ভাবটা : আজ কোনো কথা নয়··· ··। সেকেলে ভারতের কোনো গাঁয়ে রেড়ির তেলের প্রদীপের সামনে ব'সে লেখা এক নেটিভ বোষ্টম কবির পদাবলীর এক কলি —'লাখো লাখো যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল'—যেন ট্রানস্লেটেড ইনটু ইংলিশ হ'য়ে বাস্তবে রূপান্তরিত হ'য়েচে ইংলণ্ডের সেণ্ট জেমস পার্কের ঐ বেঞ্চে। আমি চোখ সরিয়ে নিলাম। ভদ্রতা।

'ওসব ব্যাপার আমাদের মত বঙ্গ পুঙ্গবদের হাঁ ক'রে দেখবারই জিনিষ। ঐ ধরণের প্রকাশ্য প্রেম দেখে চোখ দুটো ট্যারা হ'য়ে যাওয়া, বুকটা ঢ্যাব ঢ্যাব করতে থাকা, পা-টা সীশের মতো ভারি হ'য়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।'

হ'তোও তাই, যদি কাল দমদমে উড়োজাহাজে চ'ড়ে আজ লণ্ডনের সাদা মাটিতে পা দিতাম। আরে, ওসব একান্ত গোপনীয় ব্যাপার একটু আধটু হাল ফ্যাসানের উপন্যাসে পড়া আছে মাত্র। হাওড়া ইষ্টিসানে ফার্ষ্ট ক্লাসের কামরার সামনে যা দেখা যায় মাঝে-মাঝে, তা অশ্রুজলে ভেজা-ভেজা। আর ইংরিজী ছবিঘরে যা দেখেছি, সে তো ছায়া। কায়ার এমন প্রকাশ্য প্রেম-পরিচয় পেয়েও হেলা-ফেলা ক'রে তা' এড়িয়ে যাওয়া কঠিন—আমাদের প্রাচ্য চোখের পক্ষে অত্যন্ত অপাচ্য মেনু! তবে এ অধমের চোখ দুটো আগেই ওসব অখাদ্য চেখে রেখেছিল, তাই রক্ষে। চোখ প্রথম ধাক্কা খেয়েছিল এথেন্সের এক্রোপলিসের উপর, একজোড়া তরুণ তরুণীর 'বেলেল্লাপনা' দেখে। পরে হোঁচট খেল, নেপল্‌সে-র এক খোলা পার্কে দুই প্রেমালুর ঢলাঢলিতে। তারপর যেদিন পারি-র এক চলতি ভর্তি বাসে গাদাগাদি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় আমার পিঠে পিঠ রেখে এক ফরাসী তরুণী তার দয়িতের গলায় বহু মূল্যের বাহুমালা পরিয়ে তার মুখ-মধুপানে ব্যস্ত হ'লো—আমি স্রেফ শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে রইলাম। নড়িনি, পাছে ওদের রসভঙ্গ হয়। তবে বুঝলাম, ইরাণের ওমর আর তার সাকির কবরের ধুলো পূব হাওয়াতে উড়ে গিয়ে পশ্চিমী দেশগুলোর ঘর-বার সব একাকার করে দিয়েচে। দেহ মন আমার সেই থেকেই টেম্পার্‌ড হ'য়ে গেল। তাই লণ্ডনের সেণ্ট জেম্‌স পার্কের ব্যাপারটা মনে কোন স্পার্ক'ই দিলো না।

পার্ক থেকে বার হ'য়ে ক্লাইভের ষ্ট্যাচুর পাশ দিয়ে বাঁয়ে একটু বেঁকেই পার্লামেণ্ট স্কোয়ার। সামনেই দেখি হাউস অব পার্লামেণ্ট—আমাদের স্বর্গীয় ভাগ্য বিধাতা!. আমাদের কলকাতার হাইকোর্ট-হাইকোর্ট গোছের বাড়ি—চেহারায় বড় ভাইয়ের মত স্থূলকায়। এখানেই নন্দকুমারের গলায় ফাঁস পরাবার হুকুম হ'য়েছিল, এখানেই ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে বার্কের গলা গেছলো শোনা, এখানেই সেদিনের চার্চিল গান্ধীজীকে বলেছিলেন, 'আধ-নেংটা ফকির'—আর এখানেই এট্‌লি সাহেব ছিঁড়েচেন ভারতের বাঁধন-শিকল। জায়গাটা একবার দেখা দরকার।

কিন্তু তার পাশে গির্জে-গির্জে ধরণের বাড়িটা কি? কাছেই দু'জন ট্যাক্সি ড্রাইভার ষ্ট্যাণ্ডে ট্যাক্সি রেখে ফুটপাথের এক পাশে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছিল আর গল্প করছিল। কাছে গিয়ে বললাম: এক্সকিউজ মি, ওটা কি?

বললো : ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবে। —আরো বললো : ভেতরে চ'লে যান স্যার সোজা। অনেক কিছু দেখবার আছে। নামকরা গির্জা। রাজাদের সমাধি আছে, ডিকেন্স, ব্রাউনিং টেনিসনের সমাধিও ওখানে!

তাই নাকি?

ড্রাইভার দেখলো, শ্রোতা নতুন এবং মনোযোগী। উৎসাহ পেয়ে বললো : আর ঐ আবেতেই, স্যার, রাজাদের করোনেশন হয়। নিয়ম!

জিগ্যেস করলাম : বাকিংহাম প্যালেস কোন দিকে?

হাতের পাইপ উঁচিয়ে দেখিয়ে দিলো : ঐ যে বার্ডকেজ ওয়াক, সোজা গেলেই স্যার, প্যালেস।

আর, ১০ নম্বর ডাউনিং ষ্ট্রীট?

হাসলো ইংরেজ ড্রাইভার : মিঃ চার্চিলের বাড়ি? এই পেছনের রাস্তাটা। বাড়ির বাইরেটা দেখে কিন্তু হতাশ হ'তে হবে স্যার!

হেসে আধ্যাত্মিক তথ্য ছাড়লাম একটা : সব কিছুই কি বাইরেটা দিয়ে বিচার করতে হয়? দেখতে হয় তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, তবেই তো?

রাইট স্যার! এক ঝলক হাসি লোকটার মুখে চোখে।

বললাম : তোমাদের বাকিংহাম প্যালেস দেখেও হতাশ হয়েচে অনেক ইণ্ডিয়ান।

তাই নাকি? কেন স্যার?

বললাম : দিল্লীতে তোমাদেরই গাভ্‌নার জেন্‌রল বা বেঙ্গলের গাভ্‌নার যে প্রাসাদে থাকতেন, তা ঐ বাকিংহাম প্যালেসের তুলনায় অনেক সুন্দর।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। বললাম : কিন্তু সে সব প্রাসাদে বাকিংহাম প্রাসাদের ঐতিহ্য নেই, আভিজাত্য নেই। তফাৎ ঐখানেই।

লোকটার বিস্ময় মাখানো মুখে আবার হাসির রেখা ফুটে উঠলো : রাইট, রাইট স্যার!

মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি। আমার একদিকে ধর্ম, একদিকে বিচার একদিকে রাজা, অন্যদিকে মন্ত্রী। কোনদিকে পা বাড়াই আগে? মন বললো, ধর্ম,ধর্ম, আগে ধর্মস্থান—পরে যে দিক খুসী যাও। ঢুকলাম আবেতে। দেখলাম, ধর্মের সারল্য ঢাকা প'ড়েচে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে। বেদীকে বললাম,

দুঃখ-হরা ঈশ্বর কৈ ? মন্দির বললো ঃ তাঁর কথা পরে, আগে আমাকে ছাখো। তাই দেখা গেল গির্জা ঘুরে ফিরে। দেখলাম, আবেতে ইংরেজ ঢুকচে, মাথা নত করচে, বেরিয়ে আসচে। আমিও বেরিয়ে এলাম।

একটু দূরে পার্লামেণ্ট বাড়িটার সামনে লাইন ক'রে মেয়ে পুরুষ ব'সে আছে দরজা পর্যন্ত। পাশের একটা দরজায় ভিড় নেই ; দরজার কাছে দু'টি ছ'ফুটি দ্বাররক্ষক।

'এক্সকিউজ মি' ব'লে কথা পাড়লাম ঃ হ্যাঁগা, ঐ দরজায় অত লোক, আর, এ দরজায় ভিড় নেই যে ? ব্যাপার কি ?

ছ'ফুটির একটি হেঁড়ে গলায় বললো : ওটি হাউস অব কমন্সে যাবার দরজা, এটা হাউস অব লর্ডসের যাবার পথ।

ঠিক, ঠিক ! সংসারে লর্ড'স আর কটা ? সবই তো কমন্স ! ফার্ষ্ট ক্লাস কামরা খালিই যায়, ভিড়তো থার্ডক্লাস কামরায়।

হাউস অব কমন্সে আলোচনা চলচে বুঝি—এঁ্যা ?

হ্যাঁ। ঐ যে পার্লামেণ্ট বিল্ডিংয়ের মাথায় আলো জ্বলচে ঐ থেকেই বোঝা যায় আলোচনা বন্ধ, না, চালু ! তা' স্যার, এখন ঐ লাইনের পেছনে দাঁড়ালে হাউসে ঢুকতে কিন্তু অনেক দেরি হবে।

তা হাউস অব লর্ডস-এ ঢোকা যাবে না ? —ন্যাকা-ন্যাকা করেই বললাম। অবাক হ'য়ে শুনলাম ছ'ফুটি বলচে, যান চলে ভিতরে, অ্যাডমিট কার্ড পাবেন।

ঢুকে গেলাম ভিতরে। এ হল ও হল পার হ'য়ে এক জায়গায় পাওয়া গেল কার্ড। তারা দেখিয়ে দিল সিঁড়ি ভিজিটরস গ্যালারিতে যাবার। একতালা, দোতলা, তেতলা যেতেই একজন আমাকে লুফে নিয়ে হাতে একটা প্রোগ্রাম গুঁজে দিয়ে বসিয়ে দিলে বিরাট হলের তিনতলার গ্যালারিতে। নীচের হলের মাঝখানে আলোচনা হচ্চে, ইন্সিওরের ব্যাপার নিয়ে। চারদিকেই মাইক ফিট করা—কানের কাছেই খবরটা আছড়ে এসে পড়চে। হলের মাথায় কাঁচের ব্যবস্থা—লণ্ডনের মেঘলা আলো পড়চে তারই ভিতর দিয়ে ছেঁকে এসে। লর্ডগুলি লর্ডলি চালেই আলোচনা করচেন বটে, কিন্তু বেঞ্চে বসে আছেন দেখি অনেকেই তোমার আমার মতই দেহটাকে এলিয়ে মেলিয়ে। এটিকেট দুরন্ত ইংরেজ লর্ডরা পার্লামেণ্টে অমন ঠ্যাং তুলে হেলে ব'সে থাকবেন, ভাবতেও পারিনি। হয়তো পার্লামেণ্টারি কায়দা।

অবশ্য পরে একদিন ইণ্ডিয়া হাউস থেকে অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে, কিউয়ে না দাঁড়িয়ে, সোজা গটমট ক'রে হাউস অব কমন্সে ঢোকবার সৌভাগ্য হ'য়েছিল। ব্যবস্থাদি প্রায় ঐ হাউস অব লর্ডসেরই অনুরূপ এবং হালচালও তদ্রূপ। সেখানেও দেখি, আমাদের মুক্তি-যজ্ঞের অন্যতম হোতা অ্যাটলি সাহেব সামনের অপজিসন বেঞ্চে ব'সে দিব্যি ঘাড় গুঁজে ঘুমুচ্চেন, উপর থেকে ফ্যাকাসে আলো তাঁর সাদা টাকটায় প'ড়ে চকচক করচে। আলোচনা চলছিলই, চার্চিল সাহেব যথারীতি মুখে চুরুট গুঁজে গুটিগুটি হলে ঢুকলেন। বসলেন খানিকক্ষণ, পরে উঠে গেলেন। একটু পরেই একজন এসে অ্যাটলি সাহেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বলতেই ভদ্রলোকের ঘুমটা গেল চটকে। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে, শুনে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তাঁর ঘুমভাঙানিয়ার সঙ্গে। আমিও বেরিয়ে এসেছিলাম একটু পরেই। দেখতে গেছ্লাম আমাদের প্রাক্তন হর্তাকর্তা বিধাতাদের, দেখতে গেছ্লাম ব্রিটিশ শাসন যন্ত্রাগার। দেখা হ'লো, আর দরকার কি? আলোচনা শোনা? ইংরেজের আলোচনা ভারতীয়দের কান পেতে শোনবার দিন আর নেই।

হোয়াইট হল দিয়ে একটু এগিয়ে সিনোটাফের পাশের গলিটাই ডাউন-ষ্ট্রীট। এই গলিরই ১০ নং বাড়িটার জগৎজোড়া নাম। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর ডেরা। ঠিক করেছিলাম, বাড়িটার সামনে দিয়ে যাবার সময় আড়চোখে একবার দেখে নেবো। হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা—ধ্যেৎ। কিন্তু ও হরি। বাড়িটার সামনে গিয়ে দেখি কয়েকজন ঐ দেশীয় মেয়ে-পুরুষ হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে বাড়িটা যেন গিলচে। ওরা যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিলচে, আমার তখন একটু দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখতে আপত্তি কি? দাঁড়ালাম। সামনের ফ্রণ্টেজ বেশি নয়, লোহার রেলিং দেওয়া অতি সাধারণ। দরজা বন্ধ। দরজার গায়ে একটি পেতলের গোল কড়া সিংহের মুখে ঝুলোনো। প্রথম বিশ্ব-লড়াইয়ের আমলে নাকি ব্রিটিশ টমিরা ঐ কড়া ছুঁয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে যেত—যুদ্ধ জেতবার আশায়। ব্রিটিশ সংস্কার আমাদেরও হার মানায়।

এই ১০ নং ডাউন ষ্ট্রীট। সামনে পাহারা দিচ্চে একটি ছ'ফুটি। শুনলাম বাড়িটার ভিতরে নাকি ষাটখানা ঘর হরেক ব্যাপারের, ধাঁধা লাগানো। মুখে সরল হাসি, মন-পেঁচোয়া ইংরেজের মুখ্যমন্ত্রীর যোগ্যতর বাড়ী আর কি হ'তে পারে?

এই বাড়ীরই একখানা ঘরে মুখ্যমন্ত্রী-মহাশয়ের খাসদপ্তর। সেখান

থেকে টেলিফোন তারে খোদ রাণীর সঙ্গে যোগাযোগ; তা সে রাণী বাকিংহাম প্যালেসেই থাকুন আর পৃথিবীর অন্য যে অংশেই থাকুন। আর একটি টেলিফোনের সঙ্গে বাঁধা ব্রিটিশ রাজনীতিকদের বড় বড় মাথাগুলো। ঐ দপ্তর থেকেই একদা ডিজরেলী রাণী ভিক্টোরিয়ার জন্যে সুয়েজের আধিপত্য কিনেছিলেন আর ৭৯ বছর পর ঐ দপ্তর থেকেই চার্চিল রাণী এলিজাবেথের হাত থেকে সুয়েজ ছাড়িয়ে নিয়ে ফেরৎ দিলেন মিশরীদের। ব্রিটিশ সৈন্যদের বাড়ী ডেকে পাঠালেন। এই ভদ্রলোকই বলেছিলেন, আমি ব্রিটিশ জমিদারী জাহান্নমে দেবার জন্যে উজিরী তখ্‌তে বসিনি।

এ বাড়ির বাসিন্দাদের মাস মাস ভাড়া গুনতে হয় না, তবে বছরে দশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ মাসকাবারে প্রায় এগারো হাজার টাকা মাইনে পাও'া অফিসারটি সংসার খরচ আর অতিথি-আপ্যায়ন করবার পর ব্যাঙ্কে খুব বেশি জমা দিতে পারেন না। তবু তো বাসা মেরামত খরচটা তিন বছর অন্তর সরকারের খরচাতেই হ'য়ে থাকে।

অতঃপর ব্যাকিংহাম প্যালেস। আগে থেকেই মনটা খাদে বাঁধাই ছিল। কাজেই প্যালেসের নিরাভরণ রূপ দেখে দমে যেতে হ'লো না। হাজার হোক প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রজা আমি, ইতিপূর্বে সিনেমা-ছবির প্রসাদে প্রাসাদ খানিকে বহুবারই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করেছি, এখন না হয় সেটির লোহা-পাথরে চোখ ঠেকানো গেল। সামনেটায় একটু খোলামেলা জায়গা, বাইরে রেলিং আর কঠিন গেট দিয়ে ঘেরা। আর সেই গেটের বাইরে একবার এদিক একবার ওদিক ক্রমাগত যাচ্ছে আর আসছে এক বন্দুকধারী সেপাই। দেখবার মত। দম দেওয়া কলের পুতুল যেন। কালো প্যাণ্টালুন, লাল জামা পরা, মাথায় ভালুক লোমের কালো খাড়াই টুপি তার নাকের গোড়া পর্যন্ত এসে নেমেচে। পাশ দিয়ে যাবার সময় আড়চোখে দেখে নিলাম লোমশ টুপির তলা থেকে তার কুতকুতে নীল চোখ দু'টো। টুপি থেকে একছড়া ঝকঝকে লোহার চেন লোকটার দু'ঠোঁটের উপর দিয়ে ছড়ানো। সেপাইয়ের পক্ষে তর্ক করা অন্যায়, বাজে গুজব শোনা মারাত্মক, সামনে লক্ষ্য রাখাই রীতি—তাই বুঝি তার মুখ-কান-চোখের অমন ঢাকাঢাকির ব্যবস্থা। স্থাণুবৎ ধ্যানগম্ভীর ব্যাকিংহাম প্যালেসের ব্যাক-গ্রাউণ্ডে লম্বা লম্বা পা ফেলা রং চংয়ে সেপাইটি একটি বিশেষ রোমাঞ্চকর দ্রষ্টব্য। মাপা মাপা পা ফেলে যতটা যাবার গিয়ে, খটাং ক'রে ঘুরেই

আবার যাওয়া আর এক সীমায়। এমনি শুধু যাওয়া আর আসা, আসা আব যাওয়া। লোকে ঘোরে চাকরির জন্যে, এ লোকটার ঘোরাব জন্যেই চাকরি। দেখলাম, প্রহরীর ক্রমাগত বুটের ঘায়ে ফুটপাথের খানিকটায় কালসিটের দাগ। রাজদর্শন মেলেনি সেদিন, দেখেছিলাম ঐ রাজসেবককে। ঠকিনি।

ডেরায় ফেরবার পথে ভাবছিলাম, তীর্থ গিয়ে ধুলো পায়ে সর্বাগ্রে দেবদর্শনই রীতি ; আশ্চর্য, ইংলণ্ডের রাজধানীতে এসে তেমনি প্রথম দিনেই তালেগোলে রাজকীয় দর্শন ব্যবস্থাটা ঘটে গেল, প্রায় নিজের অজ্ঞাতেই। একেই বলে নাড়ীর টান। দু'শো বছরের স্নেহের টান কি দু'দশ বছরের যায় ?

বেনারসী-তীর্থে পৌঁছুলাম যখন তখন ডিনার খাবার সময়। ভারতীয় কলরবে সেটা মালুম হ'লো হলে ঢুকতেই। বাঙ্গালী টেবিলের বন্ধুরা আমায় দেখে লুফে নিতেই তাদের মধ্যে দু'জনের ফাঁকে চালিয়ে দিলাম নিজের বপুটিকে। স্যাণ্ডুইচ্‌ড্‌ অবস্থা।

টেবিলে কারি-চাপাটিব ব্যবস্থা এবং সরবরাহের ব্যবস্থা যথারীতি কুসুম চাপাটির হাতে। কুসুম ঘুরচে ফিরচে দিচ্চে ; তবু যেন মনে হচ্চে, সে বার বার যাচ্চে তাকে-সিনেমায়-নিয়ে-যাওয়া ছেলেটার টেবিলে। বেশি করে দিচ্চেও নাকি ছেলেটাকে চাপাটি আর কারি ? দিতে পারে। যাকে মন দেওয়া যায়, তাকে একটু বেশি ক'রে কারি-চাপাটি দেওয়াটা কি বেশি দেওয়া ? তা দেখে চোখ টাটানো চলে না।

•

বেনারসী তীর্থের বারো-ইয়ারী ঘরখানা দু'দিনেই অসহ্য হ'য়ে উঠলো। হাটে হাঁটাহাঁটি করা চলে, চুপ ক'রে বসা চলে না, আরাম ক'রে শোয়া চলে না, বরং একপায়ে খানিকক্ষণ দাঁড়ানো যেতে পারে। মিসেস বেনারসী আশ্বাস দিয়েছিলেন, ঘর খালি পেলেই আমাকে অনুগ্রহ করবেন তিনি। সেই আশায় ছিলাম। একদিন মূর্তিমতী বিভীষিকা আমাদের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জানালেন, কাল একটা ঘর খালি হবে, কে যাবে ? 'আমি-আমি' ক'রে দু' তিন জন হাত তুললো স্কুলের ছেলের মত,

আমি কিন্তু পেছনে হাত দুটো রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম নেপোলিয়ানের ভঙ্গীতে। কিন্তু দেখা গেল, আমার পৌরুষ তাঁর মনকে নাড়া দিলো না একটুও। বরং তিনি যে ব্যবস্থা করলেন, আশ্চর্যের। আঙুল দিয়ে দেখালেন বন্ধুবর আর্টিষ্ট শ্রীঘোষকে: ইউ। দিস্ টাইম, ইউ। হাতগুলো ঝপাঝপ ঝুলে পড়লো। ঘোষ একটা বেড়ে বসেছিল, হাতও তোলেনি। তাই এ হেন সৌভাগ্যে বেচারী প্রস্তুত ছিল না, অপ্রস্তুত হ'লো। বুঝলাম, এই স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্‌টি এ দেশের কোয়াশা আর ধোঁয়ার ছোঁয়া পেয়ে আরো যেন ধোঁয়াটে হ'য়েছেন। প্রমাণ, ঘোষস্য ভাগ্যং।

ইংলণ্ডে তো নেপোলিয়ন বা নেপোলিয়ানি কায়দার পরাজয় হবেই। তা বলে দমে যাওয়া চলে না। আমি ঘোষ, ঘোষণা করলাম (অবশ্য শ্রীমতী বেনারসীর প্রস্থানের পর, এবং ঘরের দরজা রীতিমত বন্ধ হ'য়েচে দেখে) যে, ঐ মিঃ ঘোষ মিসেস বেনারসীর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করায় তাকে এই মিঃ ঘোষ বারো-ইয়ারীর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্চে। হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!

একঘরে একানি হ'য়ে থাকায় পদমর্যাদা বাড়লেও এই বারো-ইয়ারী ঘরের গণযুগীয় আকর্ষণ কম লোভণীয় নয়। এ ঘর ছেড়ে যাওয়া মানে 'পাতি বুর্জোয়া' ব'নে যাওয়া। সামনে দিয়ে যাবার সময়, এ ঘরের কলরব তুমি এড়িয়ে যেতে পারবে না, 'মে আই কাম ইন' ব'লে নাক গলাতেও হবে, এলে সমস্বরে স্বাগতম্ ধ্বনি উঠার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো এসে বসলে তোমার প্রাক্তন বারো-ইয়ারী কারোর এক বেড়ে, যোগও দিলে ফাঁকে-ফাঁকে চলতি আলোচনায় কিন্তু তেমনটি আর জমে যেতে পারলে না। এখানকার বিশৃঙ্খলতার সৌন্দর্য তুমি হারিয়ে বসেচো, হে সদ্য পাতি-বুর্জোয়া।

এ ঘরখানা ফিটফাট হয় প্রতি শুক্রবারে। মিসেস বেনারসীর ঠিক করা ইংরেজ মেড এসে নাক সিটকোয় আর ঘর ঝাড়ে। ওঃ, সপ্তাহের এই দিনটায় এই ভারতীয় ঘরখানায় বিলিতী আবহাওয়া যেন হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়ে। মেড তার নগদা পয়সা নিয়ে চলে যায়। বাসিন্দারা সে সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকেই বলে ওঠে—আ-আঃ।

সেদিন খানিক আগেই এসে দেখি, মেডটি ঘর গোছাতে ব্যস্ত। ইংরেজী ভদ্রতায় প্রবেশানুমতি চেয়ে এবং পেয়ে নিজের বেড়ে এসে বসলাম। তখনও আরো দু' তিনটে বিছানা তৈরী বাকি।

বললাম : ঘরটা সত্যিই এবার অনেক পরিষ্কার হয়েচে।

বললো মেয়েটি হাত ঘুরিয়ে : তাও তো ভালো ক'রে হ'লো না। যা নোংরা ছিল!

বললাম : তা তো হবেই, এক ঘরে এতগুলো লোক।

আমার কথা শুনে মেয়েটি ঘরের বন্ধ দরজাটা একবার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলো, নীচু গলায় বললো : আর ব'লো না, তোমার ঐ ল্যাণ্ডলেডিটি, বুঝেচো, এক নম্বরের একটি জিউ, কেবল টাকা চেনে।

হেসে বললাম : টাকা আর কে না চেনে বলো?

কথাটা পছন্দ হ'লো না মেয়েটার। বললো : তা ব'লে এমন টাকার পাগল দেখিনি। এই বোর্ডিং ব্যবসা ছাড়াও আরো দু'তিন রকমের ব্যবসা আছে ঐ গিন্নীর।...এই ছাখো না, এই ঘরে এতগুলো লোক থাকে, হেল্‌থ খারাপ হ'য়ে যাবে না? অথচ হপ্তায় মাত্র একদিন ক'রে ঘর পরিষ্কারের ব্যবস্থা। হরিব্‌ল!

সত্যিই।

এবার আমার কাছে খানিকটা সমর্থন পেয়ে উছ্‌লে উঠলো মেয়েটি : আসল কথা হচ্চে, আমাকে বেশি দেবার ভয়েই এই হরিব্‌ল ব্যবস্থা। নইলে এ ঘর রোজ পরিষ্কার করা রীতিমত দরকার, অন্ততঃ, একদিন অন্তর। ফের হাত ঘুরিয়ে বললো : আমার কি? আমায় যেমন দেবে, আমিও তো তেমনি করবো?

ব'লে উঠলাম : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

মুখখানায় ছলছলে ভাব এনে বললো : আসলে তোমাদেরই কষ্ট। টাকা দিচ্চো অথচ আরামে থাকতে পারচো না।

আমিও একটা চিন্তার ভাব মুখে মাখিয়ে বললাম : আমার মনে হয়, আমরা যেমন টাকা দিচ্চি, উনিও বোধহয় ঠিক তেমনই ব্যবস্থা করচেন।

তাই নাকি? মেয়েটি চমকে থমকে গেল : আই অ্যাম সরি স্যার। মেয়েটি ছিটকে চলে গেল নিজের কাজে। গম্ভীর হ'য়ে বিছানা তৈরী শুরু করলো। বুঝলো হয়তো, জাত ভায়ের কাছে জাত ভায়ের (এ ক্ষেত্রে জাত ভগ্নীর) নিন্দে করাটা, আরে ছ্যা, বড় ভুল হ'য়ে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বেনারসী তীর্থে একটি নতুন তীর্থবাসীর আমদানী হ'ল। কিন্তু শোবে কোথায়? ঘরে বেড তো আর নেই। ক্ষতি নেই। ডিনারের পর মাষ্টার বিবেক পেঁচামুখে এসে অভ্যস্ত হাতে ঘরের বড় সোফাটাকে উল্টে পাল্টে একটা গদী-খাট বানিয়ে দিলো। আমি তো দেখে হাঁ...। সোফাটিকে এতদিন একটি নিরীহ বসবার বস্তু হিসাবে এবং আমাদের সবাইকার জিনিষ রাখবার আলনা হিসাবেই দেখে এসেছি। ওটির যে এমন একটা কোয়ালিফিকেসন আছে ভাবতেও পারিনি। ভয়ে ভয়ে একবার ঘরের টেবিল, ওয়ার্ডরোবগুলোকেও দেখে নিলাম। আরো দু'একটি বাড়তি মক্কেল এলে, আমাদের মাষ্টার বিবেক ভেল্কিবাজি দেখিয়ে ওগুলিকেও একএকটি বেড ক'রে দিতে পারে নাকি?

তীর্থভাইটির সঙ্গে তিন-চারটে প্যাকেজ। জাহাজ কোম্পানীর লেবেল সাঁটা। পরনের ট্রাউজারে ডবল ক্রীজ, টাইয়ের নট্ ঢিলে, মাথার চুল কপালে এসে পড়েচে—একটা নতুন নতুন গন্ধ। আমরা লুফে নিলাম তাকে। ছেলেটি বম্বেতে জাহাজে উঠেচে, টিলবেরীতে নেমেচে—মাঝপথে জাহাজে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আবহাওয়াতে কাটিয়েচে কটা দিন; খাস বিলিতী আবহাওয়ায় মাত্র কয়েক ঘণ্টার প্রবেশ। লণ্ডনের ঝিরঝিরে বৃষ্টির জল হয়তো তার মাথায় পড়েচে, কলের জল এখনো পড়েনি পেটে। অবশ্য এহেন দেশয়ালী পাইকে ঘসে মেজে 'মানুষ' ক'রে তোলার কাজের কাজি লণ্ডনের আনাচে কানাচে বহুৎ। না থাকলে চলে না। দু'পক্ষই অচল হ'য়ে পড়ে। নতুন আগত পক্ষটি যদি হাতের কাছে একটি 'হেল্পিং-হ্যাণ্ড' পায়, তবেই তো নতুন আকাশে একটু ঝটপট্ পক্ষ বিস্তার করে উড়তে পারে; আর এ হেন দু'চারটে আনকোরা ক্লায়েণ্ট না পেলে বাপের-বরাদ্দ-বাদ অবস্থায় লণ্ডন-প্রাচীন পক্ষটির পক্ষে স্ফূর্তির ফোয়ারা চালু রাখা তো রীতিমত দুষ্কর ব্যাপার!

প্রথমেই শুরু হয়, ক্লায়েণ্টের কাছ থেকে জাহাজ-থেকে-আনা কম পয়সায় ভালো সিগ্রেটগুলো এক এক ক'রে চেয়ে ফুঁকে দেওয়া। এক শিলিং তিন পেন্সে দশটা মাত্র সিগ্রেট কিনতে পাওয়ার দেশে এভাবে ফোকট্সে সিগ্রেট ফোঁকা রীতিমত একটা আর্ট। অবশ্য কাজ দেখাতে হয় অনেক। তাকে টিউবে ট্রেনে চড়বার নিয়ম কানুন দেখানো, (যাতে দক্ষিণে যেতে গিয়ে উত্তরে না যায়) লণ্ডন ট্রান্সপোর্টের লাল দোতালা বাসের কোনটা কোন

দিকে যাগ বাৎলানো, কোন রেষ্টুরেণ্টে খেতে গেলে টিপস্ দিতে হয় না, আর কোথায় দেবার নিয়ম এবং এই খাস বিলেতেও কোথায় দেশী ঝালঝাল তরকারি, ডাল, ভাত, মায় চপ-কাটলেট পাওয়া যায় তার হদিস্ দেওয়া—যাকে বলে রীতিমত প্রাথমিক শিক্ষাদান বা বর্ণপরিচয় পড়ানো। এসবের যাবতীয় খরচ ছাত্রেরই করা বিধেয়, শিক্ষকের নয়। করেও তাই।

দ্বিতীয় পর্যায়ে কথামালার কোর্স। ফ্রেণ্ডশিপ ক্লাব চেনানো, কথা শেখানো, ডান্সিং ক্লাস দেখানো, নানান 'বার'এ কাঁচের সুইং-দরজা ঠেলে ঢোকানো। তারপর সেখানে কোন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, এবং শিষ্যটির দরকার হ'লে (দরকার হবেই এবং সেকথা গুরুর কানে কানে জানালে) মেয়েটির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া। আর, কে না জানে, এ সব ব্যাপার বুড়োআঙুল চুষে হয় না, পাউণ্ড-সিলিং-পেন্সগুলোকে ননসেন্সের মত ছড়ানো দরকার। সিনেমার খরচ আছে না? রেষ্টুরেণ্টের খরচ আছে না? প্রেজেণ্ট দেওয়া আছে না? ট্যাক্সির খরচ আছে না? এমনি এমনি? ওদেশের অধিকাংশ রূপসীরা রূপ দেখে যত না মজে, রূপো দেখলে আরো মজে।

পরে গুরুদেব শিষ্যকে নব-নীতি-সুধা পাঠ দেবার ব্যবস্থা ক'রে অন্তর্ধান হন। শিষ্য তখন রূপসুধায় ভরাডুবি। কিন্তু ভিতরের রস তখন প্রায় মরে আসে; আর কোথাও বা শিষ্যই ততদিনে গুরুমারা বিদ্যালাভ ক'রে বসে। তবে এমনও দেখা গেছে গুরুদেব যে বিশেষ বস্তুটি তার ঘাড়ে সযত্নে চাপিয়ে গেছে—সেটি একটি বিশুদ্ধ সবৎস-গাভী।

বৎসটি অবশ্য তখনও এ পৃথিবীতে অনাগত এবং যাঁর চেষ্টায় এই সৎকার্যটি হয়েচে, তিনি স্বয়ং ঐ গুরুদেব। যেদেশে প্রেমিকা সুবিধামত এহাত-ওহাত হয় সহজেই, সে দেশে উক্ত প্রেমিকার অভ্যন্তরীন মাংসপিণ্ডটিও যে স্বভাবতই হস্তান্তর যোগ্য—এ সহজ সত্যকে মেনে নিয়ে মনকে প্রবোধ দেওয়া ছাড়া শিষ্যটির তখন আর কোন উপায়ই থাকে না। অবশ্য, কর্তব্য-বোধে উক্ত 'সবৎস গাভী'টির গায়ে প্রকাশ্যে সস্নেহে হাত বুলোতে হয় এবং নিজের চুল ছিঁড়তে হয় গোপনে।

ইংলণ্ডে পা-দেওয়া কোন কোন ছেলের পক্ষে যদিও ঐ অবস্থাটিই চরম, তবে পরম সৌভাগ্য যে রঙীন আশায় ঢাকা এ দুর্দশায় পড়বার মত দুর্দমনীয় আকাংখা সবার মনে বাসা বাঁধে না। ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের অতীত-

কালের আচার-ব্যবহারের বিবরণের সঙ্গে বর্তমানের আচরণ চর্মচোক্ষে মিলিয়ে দেখবার পর, বোঝা গেল, অবস্থা উন্নতির দিকে। কারণ ছু'টি। প্রথম কারণ, অতীতে বহু ভারতীয় ছাত্রদের বেলেল্লাপনার দরুণ এখন সহজে কেউ ইংরেজ পরিবারের চৌকাঠ মাড়াতে পারে না আর দ্বিতীয় কারণ হচ্চে আমাদের মেয়েরা আজকাল স্কার্ট না প'রেও শাড়ীতেই যা স্মার্ট হ'য়েচে, তাতে ইঙ্গ-ললনাদের দেখে ইণ্ডো-তরুণদের 'লাল' ফেলাবার বিশেষ কোন কারণ থাকে না। তাই অধুনা দেশী ছেলের বিলিতী-মেম বিয়ে করার হিড়িক অনেক কম, তারা দেশী মেমেই সন্তুষ্ট।

বরং এই সংক্রামক রোগটা দেখা দিয়েচে আমাদের পড়োশী রাজ্যের পাকিস্তানী ভাইদের মধ্যে। প্রমাণ পেয়েছিলাম, ফেরবার পথে জাহাজে। দেখি, ছু'টি পাকিস্তানী ছাত্র ছু'টি বিলেতী বিবি নিয়ে পাঠান্তে দেশে ফিরচে। একটি তো ইতিমধ্যেই পায়জামা, সালোয়ার, ওড়না পরতে শুরু করেচে। তা' মন্দ দেখতে লাগছিল না। মেয়েটিরও বোধহয় আঁট-সাঁট খাটো পোষাক প'রে প'রে ঘেন্না ধ'রে গেছলো, তাই ঢিলেঢালা পোষাক পরতে মজাই লাগছিল—রিহার্শালটাও হ'চ্ছিল সেই সঙ্গে। কানাঘুষোয় খবর পাওয়া গেল, মেয়েটি নাকি কন্ট্রাক্ট ক'রে ছেলেটির সঙ্গ নিয়েচে। করাচী যদি ভাল না লাগে—ফেরৎ চ'লে আসবে ইংলণ্ডে, আপত্তি করা চলবে না। ছেলেটি হয়তো বলেচে, তাই সই। তবু তো দেশের লোককে বিলিতী মেম দেখানো যাবে। বোরখায় শ্রীমুখ ঢাকা আজো যে দেশের নিয়ম, সে দেশে লিপষ্টিক-রুজ মাখানো চোখ ধাঁধানো সুন্দর মুখের কদর তো থাকবেই।

ওদেশের ডরোথী বা জেনী যদি আমাদের অসীম মিত্তিরের সঙ্গে বা নুর আলীর সঙ্গে প্রেম করেও, তবু যেন সে প্রেমে খানিকটা অনুগ্রহের খাদ মেশানো থাকে। অনুগৃহীত প্রেমিকবর সর্বদাই যেন শশব্যস্ত। দামী টিকিট কেটে সিনেমা থিয়েটার দেখানো, একটু চলতে হলেই ট্যাক্সী ডাকা, ওদের দেশের চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাওয়ানো এবং তাকে নিয়ে নাচা—তবু যেন মনে হয় মন পাওয়া গেল না। আর সে মেয়েরও মন থাকে একটু হাসি দিয়ে কাজ হাঁসিল করার দিকে। সাদায়-কালোয় সহজে কি মিল খায়? শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায়, 'দূর-ছাই'গে'ছের ব্যাপার!

কিন্তু ঐ ডরোথী বা জেনীই যদি জন বা পল-এর প্রেমে পড়তো?

তখন সাদায়-সাদায় প্রেম। মন দেয়া-নেয়া থেকে পার্থিব খরচ-খরচা পর্যন্ত সব ব্যাপারেই দাতা এবং গ্রহীতা দু'পক্ষই সমান সমান। গায়ে ঢলে প'ড়বার জন্যে তখন ট্যাক্সীর দরকার হয় না, ট্রেনে-বাসে-পার্কেই চলে। একখানা স্যাণ্ডুইচে দু'জনে কামড় দিয়েই হো-হো ক'রে হেসে ওঠে। প্রেমিক যদি সিনেমায় থ্রি-সিক্সের টিকিট কাটতে যায়, প্রেমিকা বাধা দেয়: না, ডার্লিং, ওয়ান-সিক্সেরই কাটো।

এই দেশোয়ালী প্রেমে বিদেশী টাকা তো আর ঘরে আসচে না—কাজেই কী হবে অযথা খরচ করিয়ে?

কালো চুলের মাথায় হাত বুলোবার জন্যে শ্বেত-কর-কমলের যেমন অভাব নেই দেশটায়, তেমনি ব্লণ্ড-এর রূপোলী বা ব্রুনেটের বাদামী চুলের মাথায় হাত বুলোবার মত কালো পাকা হাতও যে দেখা যায় না, তা নয়।

এমনি একটা পাকা ভাইয়ের গল্প বলি। ছেলেটি উৎকলবাসী। নামটা গোপনই করা যাক। বরং রাখা যাক্: চক্রধর মহান্তি, বিলিতি চালে মিঃ সি, মোহান্টি—আমার পরিচিত মিঃ মিশ্রের দেশেরই লোক, এক গ্রামেই বাড়ি। মিঃ মিশ্র লণ্ডনে এসেচেন, ফিলসফিতে পি-এচ-ডি দিতে। নিয়মিত ইউনিভার্সিটিতে যান আর দিস্তে দিস্তে থিসিস্ লেখেন। ভারি আমুদে। মোটা-সোটা গড়ন। উড়িয়া টানে বাংলা বলেন। বেশ লাগে শুনতে।

এই সময় এক কাণ্ড ঘটলো। বি-বি-সি, টেলিভিসনে জর্জ অরিয়েলের '১৯৮৪' নাটকখানা করলো রূপায়িত। নাটকখানা কমিউনিষ্ট শাসিত দেশের ডিক্টেটরশীপের বিরুদ্ধে একটি তীব্র কটাক্ষ। ভবিষ্যতে ঐসব দেশে মানুষের স্বাধীনতা কী ভাবে লোপ পাবে, তারই এক মর্মান্তিক কাহিনী। বিদ্রোহী হবার শাস্তি অমানুষিক। সর্বত্র চক্রান্ত, গোয়েন্দাগিরি। পারিবারিক শান্তি ব'লে কিছু নেই, ভালবাসা ব'লে কিছু নেই, বন্ধুত্ব অবলুপ্ত। যন্ত্র-জীবনের যন্ত্রণা সবার চোখে-মুখে। কিন্তু মুখ বন্ধ। 'বিগ্-ব্রাদার' বা 'ডিক্টেটর'-এর অন্তর্ভেদী-দৃষ্টি ঘরে-বাইরে, যেখানে-সেখানে।

বি-বি-সির টেলিভিসনে এ হেন একখানি বিভীষিকাময় চিত্র-নাট্য অভিনীত হওয়ায় প্রায় দেশশুদ্ধ লোক আঁৎকে উঠলো। কাগজে কাগজে

সংবাদ বেরুলো : হবিবল্, টেরিবল্, অব্জেকসনেবল্। একজন ভদ্রমহিলা নাকি দেখে অজ্ঞানই হ'য়ে গেছলেন, তাও পড়লাম। তবে নাটকখানার পক্ষে ওকালতি করবার মত লোক, প্রতিষ্ঠান বা সংবাদপত্রেরও অভাব ছিল না। কাগজের 'চিঠি-পত্র বিভাগে' দু'পক্ষের পত্র-যুদ্ধ চললো কিছুদিন।

কিন্তু আশ্চর্য বি-বি-সির সাহস! কাগজে খবর বেরুলো, আবার অমুক তারিখে নাটকখানিকে টেলিভিসনস্থ করা হবে। প্রথমবারে নাটকটা দেখবার সুযোগ ফস্কে গেছলো, এবার ঠিক করলাম, দেখতেই হবে।

অভিনয়ের দিনেই কথায় কথায় ইচ্ছেটা জানিয়েছিলাম মিশ্রকে। মিশ্র বললেন : নাটকটা আমারও দেখবার ইচ্ছে। টেলিভিসন আছেও আমার জানা এক ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটে। কিন্তু একটু মুস্কিল আছে।

কি মুস্কিল ?

মানে, আর কাউকে জানাবেন না। মিশ্র বললেন : বেশি লোক নিয়ে যাওয়া যাবে না। আর যদিও খুবই জানাশোনা, এক দেশেই বাড়ি, মানে এক গ্রামেই—তবু একবার টেলিফোন ক'রে জানতে হবে, গেলে তার অসুবিধা হবে কি না।

এবার আমি অবাক হ'লাম : কেন ?

মিশ্র হাসলেন : হঠাৎ গেলে অপ্রস্তুতে পড়তে পারে। কারণ, তার গার্ল ফ্রেণ্ড থাকতে পারে ঘরে।

আমি হতাশার সুরে শুধু বললাম : অ।

মিশ্র আশ্বাস দিলেন : একবার টেলিফোন ক'রে দেখাই যাক না ?

দেখুন।

রাস্তায় পাবলিক টেলিফোনের কাঁচ দেওয়া লাল বাক্সের মধ্যে ঢুকে মিশ্র ফোন ক'রে বেরিয়ে এলেন হাসি মুখে। বললেন : চক্রধর বললে, আসতে পারেন। অবশ্য, আজ ওর এক গার্ল ফ্রেণ্ডের আসার কথা আছে ঐ সময়, তবে ক্ষতি নেই।

বললাম : সে আবার কেমন হবে ?

বললেন : ভালোই হবে। তাকেও দেখবেন।

ডিনারের পর সসংকোচেই গেলাম মিঃ চক্রধর মহান্তির ফ্ল্যাটে। প্রিমরোজ হিলের কাছে। বেশিদূর নয়।

উপরে উঠে দরজায় 'নক' করতেই দরজা খুলে দিল মহান্তি। বয়স বছর

ত্রিশ-বত্রিশ হবে। স্মার্ট চমৎকার চেহারা। চোস্ত ভদ্রতায় আমাদের ভিতরে নিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো, আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলো তার গার্ল ফ্রেণ্ডটির সঙ্গে। জেনেট হেপওয়ার্থ। হ্যাণ্ডশেক করলাম প্রথামত। দোহারা চেহারা মেয়েটির। মাথায় একরাশ বাদামী কোঁকড়ানো চুল। একগাল হাসি। দেখতে আহ্লাদী-আহ্লাদী। মেয়েটি আমাদের দেখে আহ্লাদে যেন গ'লে গেল।

আমি ওভারকোটের বোতামগুলো খুলতেই মহান্তি বিলিতি কায়দায় সেটি আমার গা থেকে খুলে নিয়ে হাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলো। মিশ্রেরটাও। টেলিভিসনের সামনে পাতা সোফাতে ব'সতে বললো, সামনে ধরলো সিগ্রেটের দামী কেস। জেনেট বসলো আমার পাশেই। নাটক হ'তে তখনও প্রায় আধঘণ্টা দেরী। গল্পগুজব চললো।

জিগ্যেস করলাম জেনেটকে: আগে দেখেচো নাটকটা?

হুঁ! ওরে বাব্বা! ভীষণ!

মহান্তি হাসলো: ভারি নার্ভাস ও।

আর তুমি ভারি বীরপুরুষ! জেনেট ঠুকলো।

মিশ্র বললেন: আজ দেখবে তো?

আবার!

তবে?

আরম্ভ হবার আগেই পালাবো।

মহান্তি বললো: ওকে আটকে রেখেছিলাম, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো ব'লে। নইলে যদি শোনে, আমার ইণ্ডিয়ান ফ্রেণ্ডরা এসেছিলেন, আর ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিইনি, তা হ'লে খেয়ে ফেলবে। ভীষণ ঝগড়াটি!

জেনেট বললো: আর তুমি নিজে? স্বার্থপর।

দু'জনের প্রেম-দ্বন্দ্ব শুরু হ'লো। আমরা মুখে হাসি মাখিয়ে উপভোগ করতে লাগলাম।

খানিক পরে জেনেট তার হাতঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালো: আর মিনিট পাঁচেক দেরি শুরু হ'তে। এবার উঠি। গুডনাইট।

উঠে দাঁড়িয়ে হাত-ঝাঁকুনি দিয়ে বিদায় জানালাম। মহান্তি অভ্যস্ত হাতে জেনেটের ওভারকোটটা পরিয়ে দিলো, তার হাণ্ডব্যাগটা হাতে নিলো,

আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে দু'জনে ঘর থেকে গেল বেরিয়ে। ভারতীয় চক্ষুলজ্জায় 'পার্টিং-কিস'টা এ যাত্রায় ঘরে না সেরে মহান্তি সেটা ঠোঁটে ক'রে নিয়ে গেল সদর দরজায় দেবে ব'লে।

আমরা দু'জনে একটু এলিয়ে মেলিয়ে বসলাম।

মিশ্র হাসলেন : কেমন দেখলেন ?

বললাম মন্দ কি ?

ড্রেসিং টেবিলে একটা ফটো দেখিয়ে বললেন : ওটি ঐ মেয়েটির।

চেয়ে দেখলাম। ছবিটা আমাদের দিকে চেয়ে হাসচে।

মিশ্র বললেন : ওর গল্প বলবো'খন পরে।

ঘরখানার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। চমৎকার সাজানো। টেবিলে ফুলদানীতে এক গোছা ফুল। আর একটা টেবিলে কতকগুলো প্যাকেটে খাবার। একটা সেল্‌ফে কয়েকখানা ইংরেজী-বাংলা বই।

মহান্তি বাংলা পড়তে জানে বুঝি ? জিগ্যেস করলাম।

খুব ভাল জানে। মিশ্র বললেন : রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা ওর মুখস্থ।

এমন সময় ঢুকলো মহান্তি ঘরে।

টেলিভিসনটা খুলে দিলো। নিভিয়ে দিলো ঘরের আলো। একটু পরেই শুরু হ'লো নাটক।

এক ঘণ্টার নাটক। নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দেখতে হয় যেন। অন্যায় অত্যাচারের অমানুষিক ঘটনাবলী। ভবিষ্যৎ মানুষের অন্ধকার দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে, বুক কাঁপিয়ে দেয়, মন কেঁদে ওঠে। নাটক শেষ হ'লো যখন, ঘরের আলো জ্বালালো মহান্তি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

নাটকের বিষয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা ক'রে আমরা বেরিয়ে এলাম পথে।

পথে মিশ্র বললেন : কেমন দেখলেন মহান্তিকে ?

চমৎকার।

সত্যিই চমৎকার। মিশ্র বললেন : ওর বুদ্ধি আরো চমৎকার।

কী রকম ?

মিশ্র হঠাৎ বললেন : আপনি যদি প্রেমে পড়েন তো কি করেন ?

বললাম হেসে : লুকিয়ে গোছা-গোছা প্রেমপত্তর লিখি।

না, কিসসু জানেন না আপনি প্রেমের। মিশ্র বললেন : আপনি মনের আনন্দে প্রেম-পত্তর লিখবেন আর ওদিকে আপনার প্রেমিকাটি ঘুস

খেয়ে অন্য প্রেম-পাত্তর ঠিক ক'রে ফেলবে। ঘুস চাই মশাই, ঘুস। আজকাল সবেতেই ঘুস। প্রেমেতেও ঘুস, মানে প্রেজেণ্টেসন, উপহার। কিন্তু মহান্তির প্যাঁচ অদ্ভুত। ও প্রেম করে, আর সেই সঙ্গে আদায় করে প্রেজেণ্টেসন। অবশ্য, সেটা ওর আমানতী টাকার সুদও বলতে পারেন।

তার মানে?

মিশ্র বললেন: আগে মহান্তি অনেক মেয়ের পেছনে অনেক টাকা ঢেলেচে। আমাদের দেশের জমিদারের ছেলে; বাপের কাছে টাকা চাইলেই পেতো। কাজেই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া বন্ধ ক'রে প্রেমে পড়াই শুরু করলো ও। অথচ দেশে বৌ আছে, একটি ছেলেও। বাপ প্রথমদিকে চাওয়া মাত্রই টাকা পাঠাতেন: আহা, ছেলেটা হয়তো বিদেশে কষ্ট পাচ্চে। শেষে আসল ব্যাপারটা জানলেন যখন, বোধহয় হাত কামড়ালেন: এ হে-হে বড় ভুল হ'য়ে গেছে। টাকা পাঠানো বন্ধ করলেন। কিন্তু ছেলের তখন চার পাঁচটা বান্ধবী। আর এতগুলির সঙ্গে যাব মন-দেওয়া-নেওয়া চলচে, তার পক্ষে হুট ক'রে মনের দরজায় খিল আঁটা রীতিমত শক্ত। তাই বাপের বরাদ্দ বন্ধ হ'লেও, বেচারী প্রেমের দরজা বন্ধ করতে পারলো না। এর ওর কাছে টাকা ধার ক'রে প্রেম চালালো কিছুদিন। আমার কাছেও ধার নিয়েছিলো দু'একবার, ফেরৎ দেয়নি।

বললাম: এখন তবে ওসবের টাকা পাচ্চে কোথায়। চাকরী করে?

না। জমিদারের ছেলে, খাটবার ক্ষমতাও আছে নাকি?

তবে? টেলিভিশনই বা এলো কোত্থেকে?

ওসব বাপের পয়সার বাবুগিরি। তবে খাওয়া থাকার খরচা আছে তো? বান্ধবীদের এক-এক ক'রে সুবিধেমত জানিয়ে দিলো, যতদিন পেরেচি খরচ করেচি, এখন ফতুর, বাবা আর টাকা দেবেন না—অতএব হে বান্ধবী বিদায়। হয়তো ছলছল চোখে চেয়েছিলো তার মুখের দিকে, আর চেহারাখানাও তো ভালো—জিতে গেল মহান্তি।

মানে?

যে দু'একজন মহান্তির রূপ দেখে ভোলেনি, তারা রস ফুরিয়েচে বুঝেই কেটে পড়লো, থেকে গেল সত্যিকারের তিনটি প্রেমিকা—ঐ জেনেট তাদের মধ্যে একটি। তিনটেই চাকরে মেয়ে। ওর সব খরচ চালায় ওরা। দেখলেন না, জেনেট প্যাকেট করা সব জিনিষ রেখে গেছে টেবিলে।

কথাটা ঠিক পছন্দ হ'লো না। বললাম: এক নায়কের তিনটি নায়িকা। বলেন কি। এক বনে পাঁচটা বাঘিনী থাকতে পারে মিলে-মিশে—কিন্তু এক সংসারে তিন গৃহিনী তো ভাবাই যায় না। ম্যানেজ করে কি ক'রে?

মিশ্র নিজের মাথায় দু'বার টোকা মেরে হেসে বললেন: আরে মশাই, এ ঘটে বুদ্ধি থাকা চাই। প্রেমিকা তিনটির কেউ জানে না, যে আর দু'টি আছে। সবাই ভাবে, তিনিই ডারলিং মহান্টির একমাত্র 'হানি'—মাথার মণি। এক-একজনের এক-এক দিন ঠিক করা আছে আর বলা আছে, অন্য ক'টাদিন সে লণ্ডনের বাইরে যায় সামান্য মাইনের একটা চাকরী বজায় রাখতে। পুরুষমানুষের কি ব'সে খাওয়া সাজে?

বলেন কি? অবাক হ'লাম।

মিশ্র বললেন: আজ ড্রেসিং টেবিলে কার ফটো দেখলেন?

জেনেটের।

পরশু হয়তো ইভা অটওয়ের পালা। সেদিন ওখানে থাকবে তার ফটো। জেনেট যাবে ড্রয়ারে পোষাকের ভাজে। আবার বেট্টী লেভির দিনে ইভা লুকোবে ড্রয়ারে।

বললাম: বলেন কি, অ্যাঁ!

মিশ্র হাসলেন: আজ্ঞে হ্যাঁ।

লোকমুখে শুনেছিলাম, যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা নাকি জার্মানী গেলে ক্যামেরা কেনেন, সুইজারল্যাণ্ডে কেনেন ঘড়ি আর ইংলণ্ডে তৈরী করান স্যুট। আমিও আর দুটি জায়গায় গিয়ে বুদ্ধিমানের মতই কাজ ক'রে এসেছি। শুধু তাই নয়—সুইজারল্যাণ্ডের ঠাণ্ডায় জমে যাবার ভয়ে একটি বিশুদ্ধ পার্বত্যদেশীয় ভেড়ার লোমের তৈরী চেক কোটও কিনতে হ'য়েছিল জেনেভা থেকে।

বাড়ী থেকে সাদামাটা ড্রেসেই বেরিয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম, কোট প্যান্টের দেশেই যাচ্ছি যখন, তখন ওদেশী কাট-সাঁটের পোষাক প'রেই স্মার্ট সাজা যাবে'খন। বেরিয়ে দেখলাম ভুল করিনি হিসেবে।

সিরিয়া. লেবানন, টার্কি, গ্রীসে তো প্যাণ্টের মধ্যে সার্ট গুঁজেই চালিয়ে আসা গেল ওদেশীদের দেখাদেখি, ইতালী থেকে চাপাতে হ'লো বাড়তি বোঝা—সঙ্গে-আনা স্বদেশী কোট। ইংলণ্ড ছাড়া আর কোথাও গলায় ফাঁস পড়বার বাহারি নেকটাই বা ফিতের দরকার নেই, মাথায় টুপি চাপাবারও ঝামেলা নেই। বিশ্বের গলায় যে ফাঁস পরাতে গেছ্‌লো হিটলার আর হিটলারী বোমার ভয়ে মাথায় পড়তে হ'য়েছিল লোহার টুপি তাতে সবার এখন গলায় বাহারি ফিতে আর মাথায় নানান আকারের টুপি পরার সখ মিটে গেছে একদম। ঘর-পোড়া গরুর লাল মেঘ দেখার অবস্থা হয়েচে যেন!

দামাস্কাস থেকে 'প্যারি' পর্যন্ত পাড়ি দেবার সময় কড়া লক্ষ্য রেখেছিলাম লোকগুলোর পোষাক আষাকের দিকে—দেখলাম সার্ট প্যাণ্ট কোটটাকেই সবাই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের পোষাক ক'রে নিয়েচে। কিন্তু আশ্চর্য, এ বিষয়ে আমাদের দেশের মত কেউই উগ্রগতিতে অগ্রগতির দিকে এগুতে পারেনি—সবাই প্যাণ্টের মধ্যে সার্ট গুজেচে, প্যাণ্টের উপরে ঝুলিয়ে পরেনি সার্ট আর সেই সঙ্গে চপ্পল। গরমের দেশেও তো গেছ্‌লাম। হাওয়াই সার্ট তো চোখেই পড়লো না!

সেপ্টেম্বরের শেষ তখন। ইয়োরোপের গাছগুলোয় তখন সবে পাতা পড়েচে, শীত পড়েনি। অথচ আল্পসের কোলে সুইজারল্যাণ্ডে শীত পড়া ছেড়ে বরফ পড়ি পড়ি সুরু হ'য়েচে। কাজেই একটি গরম গরম কোট কেনবার দরকার হ'লো। ঢুকলাম একটা দর্জির দোকানে। বহুৎ রেডি-মেড কোট হ্যাঙারে ঝোলানো। গায়ে দাম সাঁটা। দোকানে ঢুকতেই, বোধহয় মালিক আর তার এসিষ্ট্যাণ্ট মেয়েটি দু'ধার থেকে এগিয়ে এলো আমার সামনে। আধ ইংরেজীতে বললো মেয়েটি: কি চাই স্যার? বললাম: কোট। ব্যস্। মালিক লেগে গেল হাঙার থেকে কোট নামাতে, আর মেয়েটি লেগে গেল ক্রেতার বপুতে কোটগুলি পরাতে আর ছাড়াতে। আমার ছাঁট পছন্দ হয়, তো গায়ে ফিট হয় না আর গায়ে ফিট হয়, তো রং পছন্দ হয় না; আবার রং পছন্দ হয় তো, দাম পছন্দ হয় না। শেষ পর্যন্ত একটা কোট গায়ে ফিট হ'লো, তার ছাঁটও পছন্দ হ'লো, দামও কিন্তু রংটা তেমন মনে রং ধরালো না। খুঁৎখুঁৎ করছিল মনটা। তবে পুরুষের মন বোধহয় মেয়েরা চট্ ক'রে বুঝতে পারে, তাই

কোটের গায়ে হাত বুলিয়ে, পেছিয়ে দাঁড়িয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে একটা দামী ছবি দেখার মত আমাকে দেখে হেসে ফট্ ক'রে বললো মেয়েটি : আঃ, কী চমৎকার দেখাচ্ছে এখন। এ কোট প'রে বেরুলে, মেয়েরা 'লভে' প'ড়ে যাবে!

শুনে মালিকের মুখেও একগাল হাসি। আমি হেসে বললাম : কোন মেয়ে যদি 'লভে' প'ড়ে তো তোমার এই কোটের 'লভে'ই পড়বে, আমার 'লভে' নয়।

এবার দুজনেই হো হো ক'রে হেসে উঠলো। মেয়েটির এমন রং-ধরানো কথার পর, কোটের রংটা আর অপছন্দ করা গেল না। গায়ে সাঁটা ৬০ সুইস ফ্রাঁ দাম দেখে বাড় ক'রে দিলাম দামটা—আমাদের প্রায় ৭৫৲ টাকা। বেরুবার সময় মেয়েটি আমার হাতে গুঁজে দিলো একটা প্লাসটিকের ম্যাচ-বক্স-কভার। 'বাঃ! চমৎকার তো!' বলতেই মেয়েটি অন্য রংয়ের আর একটি গছিয়ে দিলো আমায়। বললাম : ধন্যবাদ!

এ হেন কোট প'রে, পরে বাকি ইয়োরোপটা ঘোরা গেছলো এবং 'পারি'র পথে সন্ধ্যায় রাস্তায় দাঁড়ানো মেয়ের চোখ নাচানো আমন্ত্রণ যদিও পাওয়া গেছলো কয়েকবার (যদিও সেটা কোটের রং দেখে নয়, আমার গায়ের রং দেখে এবং কোটের পকেটের বস্তুর আশায়)—তবু ইংলণ্ডে এসে ইংরেজী স্যুট বানাবার লোভটা সামলানো গেল না। তাছাড়া দরকারও ছিল। ইংলণ্ডে গেছলাম রথ দেখতে, সেই সঙ্গে কলাও বেচতে নয়, কিনতে। কলকাতায় কল-কব্জা বেচা-ই আমার পেশা, সাহিত্য করা নেশা। কাজেই ইংরেজের দেশে গিয়ে সাহিত্যের খোরাক যেমন হাতড়ানো যাবে, তেমনি ইংরেজী কল কিনে কলকাতায় বেচলে পেটের খোরাকও বাড়ানো যাবে, এ আশাও মনে ছিল বদ্ধমূল। অতএব এ ব্যাপারে অফিসে অফিসে দেখা করা দরকার, কাজেই বিশেষ ক'রে দরকার হ'লো ইংরেজী কাটের একটি ভাল স্যুট। ভেখ্ না হলে ভিখ্ পাওয়া যায় না—এ সত্যের অদৃশ্য প্ল্যাকার্ড দেশটার ঘরে বাইরে সর্বত্র সাঁটা।

তাছাড়া কলকাতার কল-কারবারি 'শ্রীআমি' খদ্দেররূপে ইংলণ্ডের বাজারে

এসেচি— 'ইণ্ডিয়া-হাউস' মারফত জানতে পেরেই বেনিয়া ইংরেজের 'মেসিনারী-লয়েডস' পত্রিকায় আমার একটি সচিত্র পরিচিতি প্রকাশিত হ'য়ে গেল। তার দু'একদিন পর থেকেই শুরু হ'লো ক্যাটালগ বগলে ইংরেজ সেলসম্যানদের আমার সমীপে আসা-যাওয়া। ইংরেজ বাজে কথা বলে না, কিন্তু কাজের কথা এত বলে আর এত সুন্দর ক'রে বলে, যে, শুনতে শুনতে মনে হয় প্রিয়ার মধুমাখা কথাও বোধকরি এতটা মিষ্টি নয়। ততদিনে এসে গেছ্‌লো বিলেতী খোলস, খালাস পেয়েছিলাম 'বেনারসী-তীর্থ' থেকে; তাই ইংরেজ বাড়ীর ড্রইংরুমে ব'সে বেশ খোলা মনেই শুনতাম তরুণ ইংরেজ সেলসম্যানদের মধু-ঝরা কথা আর শিখতাম ইংলিশ সেলসম্যানশীপ।

একদিন সকালে বেরুনো গেল স্যুটের অর্ডার দিতে। সঙ্গে নকাইবাবু। জেনেভার দর্জি দোকানের মত রেডিমেড মেয়ে কি আর সব দোকানেই পাবো, যে, স্যুটের ছিট বা রং পছন্দ ক'রে বলবে, পরলে ফার্ষ্ট ক্লাস মানাবে, এমন কি—যাকগে! তাই সঙ্গে নিয়েছিলাম নকাইবাবুকে। কথায় বলে, পর রুচি পরনা। তাই তো পোষাকের দোকানে গিয়ে বড় বড় কর্মবীররাও কেমন অসহায় বোধ ক'রে কাপড়ের ছিটে হাত বোলায় আর সঙ্গের বন্ধুর মুখের দিকে তাকায় একটু অনুমোদনের আশায়। তাই, 'বাঃ বেশ মানাবে' বলবার জন্যেই শেষপর্যন্ত নকাইবাবুকেই মুরুব্বি মানা গেল।

হ্যাভারষ্টক হিলের পথে এগুচ্চি বেলসাইজ পার্ক টিউব ষ্টেসনের দিকে। যাবো ষ্ট্রাণ্ডে দর্জির দোকানে। হঠাৎ একটি লোককে দেখিয়ে নকাইবাবু বললেন: চেনেন ওকে?

ভদ্রলোক কয়েক গজ দূরে আমাদের আগে আগে চলেছেন। পরনে সাদা ফ্লানেলের প্যাণ্ট, গায়ে স্পোর্টস-কোট, পায়ে সাদা কেডস্। হাতে টেনিস ব্যাট। বুঝলাম না, কে। বললাম: চিনলাম না।

নকাইবাবু বললেন: প্রেমনাথ।

জিগ্যেস করলাম: কে প্রেমনাথ? বোম্বাই ছবির?

হ্যাঁ।

বললাম: ওঁকে সামনে থেকে দেখলেও চিনতে পারতাম না। ও ব্যাপারে একটু খাটো আছি।

আলাপ করবেন ?

আপত্তি কি, যখন এক ফুটেই চলেচি।

হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে গেলেন নকাইবাবু। প্রেমনাথের পাশে গিয়ে কী যেন বলতেই থেমে গেলেন ভদ্রলোক। আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম কাছে, আলাপ পরিচয় হ'লো। পরে তিনজনে গল্প করতে করতে এগুলাম।

খবর জানা গেল, ভদ্রলোক আপাততঃ চলেচেন বেলসাইজ পার্কের কাছেই টেনিস ক্লাবে খেলতে। মাস খানেক হ'লো এসেচেন এখানে, তাঁর একটা ছবির বিষয়ে ব্যবস্থা করতে। আছেন আমাদের ডেরার কাছেই। ঠিকানা দিলেন লিখে। আরো জানা গেল, ভদ্রলোকের তারকা-পত্নী বীণা রায় নাকি বোম্বাইতে একটা ছবির কাজ সেরে দিন-পনেরো-কুড়ির মধ্যে এখানে উড়ে আসবেন স্বামীর কাছে। পরে স্বামী উড়ে যাবেন মার্কিন মুল্লুকে হলিউডে ঐ ছবির ব্যাপারেই ; আর স্ত্রীও উড়ে ফিরবেন বোম্বাইয়ে।

আমার কাঁধে ক্যামেরা ঝুলোনই ছিল। এযাবৎ ঝুলিয়ে রাখা অভ্যেসই হ'য়ে গেছ্লো, কী জানি কোথায় কী ফস্কে যায়। নকাইবাবু কানে কানে বললেন : ছবি নেবেন ?

নিতে পারি, ফিল্ম যখন আছে।

কথায়-কথায় আমরাও ক্লাবের কম্পাউণ্ডে ঢুকলাম। নকাইবাবু তাঁর মনের ইচ্ছে প্রকাশ করলেন প্রেমনাথকে। ছবি তোলানোই যাঁর পেশা, তাঁর পক্ষে এ সামান্য অনুরোধটুকু না রাখবার কারণ নেই ; বিশেষ ক'রে চলচ্চিত্রের চাহিদামত যখন দৌড় ঝাঁপ করতে হবে না, একটু দাঁড়াতে হবে। রাজী হলেন প্রেমনাথ।

ভদ্রলোক ব্যাট হাতে বেশ একটা তারকোচিত পোজ-এ দাঁড়ালেন, আমি তুললাম একটা ছবি। এবার নকাইবাবু দাঁড়ালেন তাঁর গা ঘেঁষে, তুললাম আর একখানা। নকাইবাবু এবার এগিয়ে এলেন আমার কাছে, বললেন : ঠিক করে দিন ক্যামেরা, আপনি যান দাঁড়ান গিয়ে পাশে, আমি তুলি।

'আর আমি কেন ? তবে হ'লে মন্দ হয় না—' গোছের একটা ভাব নিয়ে প্রেমনাথের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। নকাইবাবু ক্যামেরা টিপলেন ক্লিক। বললেন প্রেমনাথকে : অ্যান এক্টর য়্যাণ্ড অ্যান অথার। আমাকে দেখিয়ে বললেন : ইনি সাহিত্যিক, অনেক বই লিখেচেন।

তাই নাকি ? প্রেমনাথ বললেন : বেঙ্গলি লিটারেচারের উপর আমার

যথেষ্ট শ্রদ্ধা।. বেঙ্গলি পিকচারের গল্পগুলো সত্যিই উঁচু ষ্ট্যাণ্ডার্ডের, নতুন কিছু পাওয়া যায়। আমার নতুন কিছু দেবার ঝোঁক বরাবরই। নতুন গল্প থাকে তো—

নকাইবাবু লুফে নিলেন কথাটা: ওঁর দুটো উপন্যাস পড়েছি, দুটোই সিনেমার উপযুক্ত।

প্রেমনাথ বললেন: তার 'জিষ্ট' আমাকে দিন না? কবে ফিরবেন ইণ্ডিয়ায়?

জানুয়ারীর শেষে।

বললেন: ওঃ, আমি তার আগেই ফিরবো। ইতিমধ্যে 'জিষ্ট' ক'রে ফেরবার পথে বম্বেতে যদি দেন আমাকে তো ভাল হয়।

ভদ্রলোক বম্বের ঠিকানা লিখে দিলেন। বললাম: দেখবো।

কথা কিন্তু রাখতে পারিনি আজো। কারণ, কুঁড়েমি। লণ্ডনে থাকতে বোম্বাইবাসী বাঙ্গালী নট অভি ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভাইপোর সঙ্গেও আলাপ হ'য়েছিল। লিখি জেনে, অভিবাবুর নামে 'মাই ডিয়ার ছোট্কা' ব'লে একখানি পরিচয় লিপিও লিখে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। কিন্তু বম্বে থাকার সময় সে চিঠির কথা ভুলেই মেরেছিলাম। আহা, মনে থাকলে একবার আলাপ ক'রেও তো আসা যেতো। এ খবর পেলে, সিনেমা-ফ্যানরা আর সিনেমা পত্রিকার 'সাক্ষাৎকারী'রা আমাকে ধিক্কার দেবেন জানি; কিন্তু ভুলো মন আর কুঁড়ে দেহের উপর কারোর হাত নেই যে।

•

ষ্ট্রাণ্ডের এফ-এস-টি বা ফিফ্‌টি শিলিং টেলর্স-এ ঢোকা গেল। নামটি ভারি লোভনীয়। যেন পঞ্চাশ শিলিং, মানে প্রায় তেত্রিশ টাকায় পুরো স্যুট বানিয়ে খদ্দেরের আশায় ব'সে আছে। এককালে থাকতো। যখন আমাদের দেশে চালের দর ছিল দু'টাকা মণ, ওদের ব্রেড-বীয়ারের দামও ছিল স্বপ্নাতীত সস্তা। সেই যুদ্ধ-পূর্ব দিনে। কিন্তু দোকানটা সেই পুরোন নামটা আঁকড়ে ব'সে আছে, কিন্তু পোষাকের দাম হাঁকড়াচ্ছে প্রায় তিনগুণ। দোষ নেই, যেমন দিনকাল। বরং শুধু লণ্ডনে কেন, তামাম ইংলণ্ডের শহরে শহরে, পাড়ায় পাড়ায় এই এফ-এস-টি দর্জির দোকান আর লেয়ন্স বা এ, বি, সি-র সেলফ-হেলপ মার্কা রেঁস্তোরা আছে ব'লেই মধ্যবিত্ত

ইংরেজ তার অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা মেটাতে পেরেছে।

তাছাড়া কাজের শেষে ঠাণ্ডা আর বাদলা সন্ধ্যায় মগ-মগ বীয়ার খেয়ে শরীর গরম করার জন্যে আছে দু'চার পা অন্তর পাবলিক বা সেলুন 'বার'। আর আছে প্রতি পাড়ায় দু'তিনটে ক'রে ব্যাঙ্ক—যাতে পাউণ্ড-শিলিংটা পেলেই জমা দিতে পাবে, আর তুলতে পারে যেটুকু দরকার। ব্যাঙ্ক-বার-দর্জি-হোটেল—এই চারটে খুঁটির উপরেই হিসেবী ইংরেজের মধ্যবিত্ত কাঠামো বাঁধা। চতুর ইংরেজের চতুর্বেদ বা বেদী।

শো-কেসে নানারংয়ের, নানা কাটের স্যুট। প্রত্যেকটায় দাম লেখা। পাকা দাম। নড়চড় নেই। কাজেই দামাদামির বালাই নেই, শুধু রং, জমিন আর কাট পছন্দ হ'লেই হ'লো। বিলেতী স্যুটের 'কাট' পছন্দর কথাই উঠে না, সমস্যা শুধু 'জমিন' আর রং নিয়ে। 'জমিন' পছন্দ মানিব্যাগের উপর নির্ভর করে, যত ঝামেলা স্যুটের রং নিয়ে। গায়ের রং যদি দুধে-আলতায় হয়, তবে সাদা থেকে কালোর মধ্যে সব কটা রং-ই হয় মানানসই। কিন্তু আমার গায়ের বিশেষ রংয়ের সঙ্গে স্যুটের কোন রং ম্যাচ করবে—তা ঠিক করা সহজ সমস্যা নয়। দোকানের ইংরেজ সেলসম্যানটি বোধহয় জানতো এই সমস্যার কথা। আর না জানারও কথা নয়। এই বিশেষ রংয়ের খদ্দের, অন্ততঃ এই লণ্ডন শহরে, নিশ্চয়ই আমিই প্রথম নই। কাজেই গলায় ফিতে ঝুলানো সেলসম্যানটি ঝটপট নানারংয়ের ও দামের ছিটের এল্যাবাম থেকে হাল্কা রংয়ের ছিটগুলো চোখের সামনে তুলে ধরলো, সেইসঙ্গে জানাতে লাগলো পুরো স্যুটের পাকা দাম।

নকাইবাবুর কালো চোখে আর ইংরেজটির নীল চোখে শেষপর্যন্ত একটি হাল্কা রং পছন্দ হ'লো, দামটা শুনে আমারও অপছন্দ হ'লো না, অতএব বললাম: ইয়েস, দিস ওয়ান।

অ' রাইট স্যার। ব'লেই গলায় ফিতে টেনে নিয়েই আমার আগা-পাছ-তলা মাপতে শুরু করলো। কাছেই ক্যাশ-কাউণ্টারে একটি সুবেশা তন্বী খাতায় যোগ দিচ্ছিল নিজের মনে, তাকে বললো মাপ টুকতে। নির্মল নগ্নতা যে বয়সে অশ্লীলতার সীমায় এসে ঠেক খেয়েছিল, সেই সুখময় শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত পোষাকের তাগীদে বহু দর্জির বহু ফিতেয় বহুবার এই বরবপুকে মাপিয়েছি, কিন্তু ঐ ইংরেজ দর্জির বিলেতী ফিতেয় মাপের কায়দাই আলাদা। মাপের জন্যে আমাকে নানাভাবে দাঁড় করানো ভঙ্গী আর তার

মাপ নেবার অপরূপ নৃত্য ভঙ্গী—দুইয়ে মিলিয়ে দাঁড়ালো যেন দ্বৈত নৃত্যে।

মাপ নেওয়া শেষ হ'লে, নাম-ঠিকানা-বায়না দিয়ে যথারীতি জিগ্যেস করলাম : ট্রায়ালটা কবে দিতে আসবো ?

মিঃ দর্জির নীল-চোখ দুটো গোল হ'য়ে গেল। হাত নেড়ে বললো : কোন ট্রায়াল লাগবে না স্যার। অমুক দিন আসবেন, স্যুট নিয়ে যাবেন, পরবেন, দেখবেন একদম অ' রাইট। থ্যাংকু স্যার।

অগত্যা ভারাক্রান্ত মনে রসিদখানা ভাঁজ করে পকেটে পুরে নকাইবাবুর সঙ্গে বাইরে এলাম। বললাম : টাকাগুলো জলে যাবে না তো ?

নকাইবাবুর মুখেও খুশীর তেলাভাবের অভাব। তবু সাহস দিলেন : আরে না, না, ওরা ঐ কম্মোই করচে হরদম। ঠি-ই-ক ক'রে দেবে। আর নইলে—

নইলে কি করতাম জানিনে, তবে কিছু করতে হয়নি এই যা রক্ষে! ডেলিভারি-দিনের ঠিক আগের দিন ডাকে এক কার্ড এসে হাজির : তোমার স্যুট রেডি। —দুরু দুরু বক্ষে গেলাম, দামটি দিয়ে দাঁড়ালাম। আশা, হয়তো পরিয়ে দেখে নেবে। নাই থ্যাড্। দেখি স্যুটটাকে দিব্যি প্যাক ক'রে আমার হাতে গছিয়ে দিয়ে বললো : থ্যাংকু স্যার।

উঃ কি আত্মবিশ্বাস। একবার পরিয়ে দেখাও দরকার মনে করলো না! পরে খেয়াল হ'লো, ঠিকই তো, ঐ আত্মবিশ্বাসটুকুর জোরেই তো ইংরেজ সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে গিয়ে আমাদের অতগুলো লোককে দাবিয়ে রেখেছিল এতদিন। এমন কি যাবার দিনেও ঐ আত্মবিশ্বাসের জোরেই ভারতমাতার বর-অঙ্গেও দরকার মত চালিয়ে গেল কাঁচি! অতএব সেই মায়েরই এক নগণ্য সন্তানের দেহের মাপে কাপড় কাটতে পারবে না ইংরেজ? নাঃ, ভুল আমারই।

অতএব হাল্কা মনেই বেনারসী-তীর্থে ফিরলাম।

এবং যখন স্যুটটা পরলাম পরের দিন, আমার তীর্থ-ভায়েরা একবাক্যে রায় দিলেন : চমৎকার ফিট হ'য়েচে স্যুটটা। রংটাও চমৎকার। আর অনেকেই দেশী বুদ্ধিতে দামটাও জিগ্যেস ক'রে বসলেন। ন' পাউণ্ড দাম। বলতেই হ'লো। বাড়িয়ে বলিনি। বললেন সবাই : ঠকিনি।

না:, বেনারসী-তীর্থে আর থাকা গেল না।

আলাদা ঘরের দরকার, অথচ বেনারসী-দেবীর অনুগ্রহের কোন লক্ষণই নেই। ঠিক করলাম, অন্য যায়গায়, বিশেষ ক'রে কোন ইংরেজ পরিবারের ভাড়াটে অতিথি হ'তে হবে। এলাম ইংরেজের দেশে, ইংরেজের আকাশ-বাতাস-পথ-ঘাটই দেখলাম, ঘরের খবর পেলাম কৈ? ভারতবর্ষে ইংরেজ দেখিনি এতদিন, দেখেছি লর্ড। ঐ লর্ডদের ল্যাণ্ডে এসে আসল ইংরেজের রূপ দেখতে হবে। সেজন্যে চাই একটি ল্যাণ্ডলেডির আশ্রয়।

কাছাকাছি টোব্যাকোনিষ্টদের দোকানের শো-কেসে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগলাম। আশেপাশের ল্যাণ্ডলেডিরা তাদের ঘর ভাড়ার বিজ্ঞাপন দেয় টোব্যাকো-শপের শো-কেসে। ইংলণ্ডে কোন কাজই ফোকটে হয় না। ঐ বিজ্ঞাপনের জন্যে ল্যাণ্ডলেডী প্রতি সপ্তাহে ছ' পেনি, কোথাও এক শিলিং দক্ষিণা দেয় দোকানীকে তার শো-কেসে বিজ্ঞাপনের কার্ডটুকু সেঁটে দেবার জন্যে।

বেশ লোভনীয় খবর সাঁটা। আসবাব-পত্রে সাজানো ঘর, ঠাণ্ডা গরম জলের ব্যবস্থা, গ্যাস হিটার, ষ্টোভ ইত্যাদি, ডবল-বেড, ব্রেকফাষ্ট, ডিনার—সব নিয়ে সপ্তাহে তিন-চার পাউণ্ডের মধ্যে। অস্ত্রীক বিরহী আমি। আমার সিঙ্গল-বেডের দরকার। তা' সিঙ্গল-বেড ঘরও আছে সর্ব ব্যবস্থায় সুসজ্জিত, রেট সপ্তাহে আড়াই পাউণ্ড থেকে শুরু। কিন্তু আশ্চর্য, সব বিজ্ঞাপনেই নাম আর টেলিফোন নম্বরটুকু লেখা, ঠিকানা লেখা নেই। ভালো রে, ঠিকানাটা নোট ক'রে নিজের সুবিধেমত যাবো, খটাখট কড়া নেড়ে জিগ্যেস করবো, হ্যাগা, ঘর খালি আছে?—তার উপায় রাখেনি দেখছি। বুঝলাম, পাবলিক ফোনে থ্রি-পেন্স মানে, তিনটি পেনি গচ্ছা দিয়ে এপয়েণ্টমেণ্ট ক'রে ঘরওয়ালীর সুবিধেমত আমাকে যেতে হবে।

তাই সই। বিজ্ঞাপন বেছে বেছে শুরু করলাম টেলিফোন। কয়েক জায়গায় আমার মুখে ইংরেজীর ইণ্ডিয়ান উচ্চারণ শুনেই বোধকরি জানিয়ে দিলো: সরি, অকুপায়েড। অবশ্য, কেউ বললে, কয়েকদিন আগে অকুপায়েড, কেউ বললে, কালকে, কেউবা বললে, এই কয়েকঘণ্টা আগে। আবার কয়েক জায়গায় উচ্চারণের বাধা টপকে ল্যাণ্ডলেডির দরজায় বেল টেপবার সৌভাগ্যও হ'লো এবং দর্শনও পাওয়া গেল। কিন্তু আমার দর্শন পেয়ে অনেক ল্যাণ্ড-লেডির মুখ ফ্যাকাশে হ'লো লক্ষ্য করলাম। বুঝলাম, এখানে বাধা, গায়ের রং। কিন্তু আশ্চর্য এই ইংরেজ মহিলাদের অভিনয় ক্ষমতা আর ভদ্রতা। মুখে

একগাল হাসি ভ'রে জানালো : আ মিঃ গস্, তুমি এসেচো, ভা-আ-রি খুশী হ'লাম ; কিন্তু মিঃ গস্, আমি অ'ফুলি সরি, এই একটু আগে একজন এসে ঘরটা সেট্‌ল ক'রে গেল। সরি, তোমার অনেক কষ্ট হ'লো।

এই 'সরি' ব'লে লোক সরানো ইংরেজের এক রীতি। 'হবে না' ব'লে চোখ রাঙায় না কখনো, বরং 'না' বলতে নিজেরাই হয় লজ্জা-রাঙা। তার লজ্জা দেখে লজ্জিত হ'য়ে নিজের থেকেই স'রে পড়তে হয় তখন।

বেনারসী-তীর্থের ভাইরা আমার ঘর খোঁজার অভিজ্ঞতা সবিস্তারে শুনে যা মন্তব্য করলেন, তার মানে দাঁড়ায় : বেঁচে থাক আমাদের বেনারসী-মাসী আর কুসুমের হাসি! বাদামী মুখের মুখ-ঝাড়া খাওয়াও ভালো, অভ্যেস আছে। কিন্তু রাঙা-ঠোঁটের বাঁকা কথা? অসহ্য! রোলিং-ষ্টোন দত্তদা ইংরেজ চরিত্রে ওয়াকিবহাল। বললেন : ওভাবে হাজার ঘুরলেও ঘর পাবেন না। পরিচয়পত্র পকেটে না থাকলে ইংরেজ বাড়ীর দরজার ওপিঠে যাওয়া রীতিমত শক্ত। এ দেশটা কন্টিনেণ্ট থেকে আলাদা, এদের জাত-ধর্মও আলাদা। 'কলর-বার' এদের অস্থি-মজ্জায়। মন থেকে কালো রং এরা এখনো ওঠাতে পারেনি সবাই। তবে একবার যদি খুলতে পারেন দরজা, খুলে দেবে এদের মন। 'বড়ফের চাঙাড' ভাঙলেই সব গ'লে স্রেফ জল।

দত্তদা একটা রীতিমত বড় বক্তৃতা দিয়ে দিলেন। শেষ, বেশ বুঝলাম, ঐ মহিয়সী বেনারসীর কার-চাপাটিই আমার ভাগ্যে নাচচে। উপায় নেই। দত্তদার কথাটা মনে গেঁথে গেল, যে দিন চোখে পড়লো হ্যামষ্টেডেই এক টোবাকো-শপে। শো-কেসে ঘর ভাড়ার বিজ্ঞাপনের মাঝে আর একটা বিজ্ঞাপন : নো কলর অ্যাপ্লিকেণ্ট্ প্লীজ! উঃ, এত অহংকার! তোমাদের চামড়াটাই না হয় সাদা ; রক্ত আমাদের, তোমাদের মতই লাল হে!

তীর্থের ভাইদের অনেকেই শুনে বললো : ও দোকানের ঐ বিজ্ঞাপন আগেই চোখে পড়েচে, কাজেই আর দেখিনে ওদিকে, ঘাড় ফিরিয়ে যাই।

আগরওয়ালা বললেন : ও কথাটা আমাদের জন্যে নয়, মামাদের জন্যে।

মামা? অবাক হ'লাম।

শৈলজাবাবু বললেন : মামাদের চেনেন না? নিগ্রোরা।

নিগ্রোরা আমাদের মামা? মায়ের ভাই? কিন্তু বহু মাথা ঘামিয়েও

মামাদের সঙ্গে আমাদের এই প্রীতির সম্পর্কের সূত্র খুঁজে পেলাম না। কেউই বলতে পারলেন না। শুনে আসচেন তাই বলচেন। অথচ মিল তো কোথাও নেই ? রংয়েও না। আমাদের চামড়া পালিশ করতে যদি 'ব্রাউন' বা 'অক্স-ব্লাড' কালি লাগে, ওদের লাগবে পাকা কালো কালি। তাছাড়া আচারে-বিচারে, আকারে-প্রকারে, বাসায়-ভাষায় কোনো মিল নেই। মিল শুধু এক জায়গায় : সাদা বুটের ঘা খেয়েচে ওরাও, আমরাও। ছু'জনেরই লাল রক্তে ভিজে গেচে দেশের মাটি।

বেনারসীধাম যখন ছাড়বোই, ঘর তখন চাই-ই। শুরু করলাম খবরের কাগজ কিনতে। হ্যামষ্টেড-হাইগেট গেজেট, লণ্ডন-এডভার্টাইজার, টাইমস কিনে কিনে 'ঘরভাড়া'র স্তম্ভে চোখ বুলোতে লাগলাম আর স্তম্ভিত হ'য়ে ভাবতে লাগলাম : হায় এত যে ঘরের খবর, অথচ পোড়া কপালে ঘর জুটচে না ? এ দেশটায় ঘর পেতেই যত বাধা ! অথচ অস্থায়ী শ্বেত বরণী ঘরনী তো বহুৎ বাদামী দাদা-ভাইদের কনুই ঝুলে যাচ্চে দেখেচি পথে ঘাটে। এমন কি শ্রীকৃষ্ণ মামাদেরও বিলেতী শ্রীরাধিকা মামী জুটে গেচে।

দেখা যাক্। শেষপর্যন্ত ইণ্ডিয়ান হোষ্টেল আছে; পাছাড়া বিলিতী বৌ নিয়ে সংসারী বহু ইণ্ডিয়ান আছেন, যাঁরা দেশোয়ালীদের মাথা গোঁজবার ব্যবস্থা করেন। দেশী ছেলেগুলি সেখানে দেশী আবহাওয়ায় বাস ক'রে বাঁচে, ছুটো খেয়ে আরামে ঢেঁকুর তোলে। বেনারসী তীর্থেরই উন্নত সংস্করণ। এগুলির পাত্তা পাবার উপায় ইণ্ডিয়ান হাউস। যাক্, শেষপর্যন্ত কয়েকটি ঘরের খবর পাওয়া গেল। বিনা বাধায় ঘরও দেখলাম, কিন্তু রেট শুনেই ধ্যেৎ ব'লে বেরিয়ে আসতে হ'লো।

এই ভাবে ঘরের জন্যে ঘোরাঘুরি করচি, এমন সময় একদিন অবনী ডাক্তার, মানে ইউনিভার্সাল বড়দা বেনারসী-তীর্থে খবর আনলেন, তিনি কলচেষ্টারের হাসপাতালে যাচ্চেন চাকরি নিয়ে। থাকতেন, বেলসাইজ রেসিডেন্সিয়াল ক্লাবে। বললেন আমাকে : আমার সীট খালি হবে। অবশ্য থাকতে হবে আর একজনের সঙ্গে। তবে ভালো ব্যবস্থা, রেটও কম। যাবেন ?

চলুন দেখা যাক।

গেলাম। সত্যিই ভাল ব্যবস্থা। অন্তত: দেখে ভক্তি আসে। ইংরেজের পরিচালনায় ক্লাবটি। ভিজিটর্স রুম, সিটিং রুম, ডাইনিং রুম, বেডরুম, বাথরুম বহুৎ রকম রুমের ব্যবস্থা। কিচেন রুম থেকে যে বিজাতীয় রান্নার ঘ্রাণ এলো নাকে, তাতেও দেখলাম নাক সেঁটকাবার কিছু নেই। মনে বেশ আশাই হ'লো। ডাক্তারের সঙ্গে ম্যানেজারস্ রুমে ঢোকা গেল।

ডাক্তার সব বলতেই, ইংরেজ ম্যানেজার তাঁর সেকেলে কটা আর কড়া গোঁফে মোচড় দিয়ে বললেন: বেশ তো। ঘরটা দেখিয়ে দিন ডক্টর।

ডাক্তার বললেন: মিঃ ঘোষ কিন্তু ভেজিটেরিয়ান। এমন কি, এ দেশীয় মতে নিরামিষ ডিম পর্যন্ত খান না।

বলেন কি? ম্যানেজার কপালে চোখ তুললেন: তা'লে তো মিঃ গসের বড় কষ্ট হবে। এখানে যে শুধু নানা জাতের মাংসের কারবার। জানেন তো সবই ডক্টর।

ডক্টর বললেন: জানি তো সবই। তবে এঁর জন্যে যদি স্পেশ্যাল···

একজনের জন্যে সে বড় অসুবিধে হবে ডক্টর। ম্যানেজার যথারীতি লজ্জা-রাঙা হ'লেন: আ মিঃ গস্, আই অ্যাম সো সরি ফর্ ইউ। প্লীজ ডোণ্ট মাইণ্ড।

আমিও দুই গালের মধ্যে যথাসম্ভব হাসি ভরে এমন ভাব দেখালাম, আহা-হা, তাতে কি হয়েচে, তাতে কি হয়েচে, ঠিক আছে। ডাক্তারের কোটের কোন ধ'রে টানলাম: চলো হে ডাক্তার।

দু'জনেই বেরুতে যাচ্ছিলাম ঘর থেকে, এমন সময় ম্যানেজারই থামালেন: জাষ্ট এ মিনিট প্লীজ। ···ম্যানেজার কাগজের তাড়া হাতড়াতে লাগলেন: আই রিমেম্বার, এক ভদ্রমহিলা আমার কাছে তাঁর নাম ঠিকানা রেখে গেছেন পেয়িং গেষ্টের জন্যে। ইণ্ডিয়ান ডিশও রাঁধতে পারেন তিনি। কাছেই।

ইস্, এ যেন আকাশের চাঁদ নিয়ে লোফালুফি খেলা। এই ধরচি, এই ছাড়চি, এই ধরচি আবার।

তা' পাওয়া গেল চাঁদ হাতে। মানে ম্যানেজার খুঁজে পেলেন নাম ঠিকানা লেখা কাগজখানা। দিলেন আমার হাতে।

থ্যাংকু। চাঁদটুকু ভাঁজ ক'রে পকেটে ভরে বেরিয়ে এলাম দু'জনে।

পরদিন।

দরজায় বেল টিপবার একটু পরেই দরজা ঈষৎ ফাঁক ক'রে চাঁদ মুখখানি বার করলেন আমার ভাবী-ল্যাণ্ডলেডি। বব-ছাঁটা চুল, নীল চোখ, গালে যথারীতি রুজ এবং ঠোঁটে লিপষ্টিক। একেই মেয়েদের বয়েস বোঝা দায়, তায় আবার মেমসাহেবের বয়েস। তবে ভদ্রমহিলার মুখচন্দ্রের আকার এবং প্রকার দেখে আঁচ করা গেল, সেটি প্রায় পঁয়ত্রিশটা বিলিতী শীতের ঠাণ্ডা ঝাপটা খাওয়া বস্তু।

পকেট থেকে নাম-ঠিকানার কাগজটুকু বার ক'রে এগিয়ে ধরলাম তাঁর চোখের সামনে। বললাম: বেলসাইজ পার্ক রেসিডেন্সিয়াল ক্লাবের ম্যানেজারের কৃপায় এই ঠিকানা পেয়েচি। আশ্রয় চাই।

ও, আই সি। কাম ইন প্লীজ। আমার বপু যে ফাঁকটুকুতে ঢুকতে পারে, ঠিক সেইটুকুই ফাঁক করলেন দরজা। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কথা যারা মেপে বলে, ঘরের দরজা তারা বেশি ফাঁক করবে কেন?

বিনা বাক্যব্যয়ে সুড়ুৎ ক'রে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। খুটুস ক'রে দরজা দিলেন বন্ধ ক'রে। ল্যাণ্ডলেডির সারা অঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম, দেখলাম বয়সের আঁচ করতে ভুল হয়নি।

মামনুসর। ব'লেই ভদ্রমহিলা বংকিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলি ষ্টাইলে গম্ভীর পদক্ষেপে ম্যাটিং পাতা পালিশ করা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে খুট খুট উপরে উঠতে লাগলেন। আমি তাঁর পশ্চাতে। দোতলার বারান্দায় উঠলাম। পাশাপাশি ঘরগুলির ধবধবে সাদা দরজা সব বন্ধ। ঝকঝকে পিতলের হাতল ঘুরিয়ে ঈষৎ ফাঁক ক'রে বললেন: এটি ডাইনিং অ্যাণ্ড সিটিং রুম কম্বাইণ্ড। গ্যাস হিটার আছে। অসুবিধে নেই।

দেখলাম, চমৎকার সাজানো ঘর। জানালায় কুঁচি দেওয়া সাদা পর্দা, দেওয়ালে ছবি, শেলফে পুতুল, তার নীচেয় ফাবার প্লেস। ঘরের এককোনে সোফা সেট, মাঝখানে মাঝারি টেবিল। তাতে কাজকরা টেবিলক্লথ পাতা। তার উপরে ফুল সমেত ফুলদানী। কাঠের মেজেয় নক্সা করা কার্পেট। ঘরটা দেখেই ভক্তিরস জাগলো প্রাণে। ল্যাণ্ডলেডি বন্ধ করলেন দরজা।

এবার দেখালেন বাথরুম। রবার শীট পাতা ঘর। বাথরুম, কামোড, বেসিন ইত্যাদি। ভক্তিরসের ব্যারোমিটার আর এক ধাপ উঠলো।

বললেন: পাশেই কিচেন। তবে খুলে দেখালেন না। ওটি মেয়েদের

নিজস্ব গণ্ডি। আর উনুন দেখে লাভটা কি? উনুনে তৈরী খাদ্যদ্রব্য নিয়েই আমার সম্পর্ক।

তারপর ডাইনিং রুমের পাশের আর একটি বন্ধ দরজা দেখিয়ে বললেন: ওটি আমাদের বেডরুম। আমার কৌতুহল বন্ধ দরজা পর্যন্ত গিয়েই থেমে রইল। কারণ, ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আমার বেডরুম?

আমার মনের কথা বোধকরি জানতে পেরেই ল্যাণ্ডলেডি বললেন: এবার তেতলায়।

ল্যাণ্ডলেডিকে ফলো ক'রে তিনতলার বারান্দায় এলাম। তাঁদের বেড-রুমের ঠিক উপরের ঘরখানার বন্ধ দরজা খুলে বললেন: এই বেডরুম।

ঘরখানার ভিতরে এসে দাঁড়ালাম। কাঁচের জানলা দিয়ে প্রচুর আলোর আভাস। দু'খানা খাট পাতা, গদি মোড়া। ওয়ার্ডরোব, দেরাজ, আলনা, সোফা, টেবিল ইত্যাদি। তবে কয়েকদিন যত্নের হাত পড়েনি ঘরখানায়, বোঝা গেল।

ভদ্রমহিলা আমার মুখ দেখে মনের কথা বুঝলেন কিনা জানিনা, বললেন: এঘর এরকম থাকবে না। সেট্‌ল হ'লে সব ঠিক ক'রে দেব। জানলায় পর্দা, খাটে বিছানা, মেঝেয় কার্পেট—সব থাকবে। তোমার কোন অসুবিধে হবে না বলেই মনে করি।

কথাগুলো যেন কানে মধু বর্ষণ করলো। ভক্তিরসের পারা নেমে যাচ্ছিল, হঠাৎ চড়-চড় ক'রে দু'ধাপ প্রায় উঠে গেল।

ল্যাণ্ডলেডি আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন জানালার কাছে। বললেন: লণ্ডনের মধ্যে এই দিকটাই উঁচু। ওই দ্যাখো, দূ-উ-রে পিকাডিলির বাড়ি-গুলো, একটু ওধারে বিগবেন আর পার্লামেণ্টের চুড়ো। খুব চমৎকার! না?

দেখলাম, বললাম: হুঁ।

রাত্রের দৃশ্য আরো চমৎকার। বললেন ভদ্রমহিলা: যখন নানা রঙের আলোগুলো জ্বলে উঠে, ঠিক মনে হয় লণ্ডন নগরী যেন মনি-মুক্তোর মুকুট পরে দাঁড়িয়ে আছে। চমৎকার লাগে।

উত্তর দিলাম না। ভারত-হাতড়ানো ধন-দৌলতের ঝলকানি দেখে

আমার মন তো ঝলমলিয়ে ওঠবার কথা নয়। সে উঠবে তোমার মন, হে ইংলণ্ড-নন্দিনি।

বললাম: সবই তো হ'লো, কিন্তু ডবল-বেডরুম আমার দরকার নেই যে! একলা মানুষ! একলাই থাকতে চাই। একটু নির্জনে লেখবার ইচ্ছে।

তুমি লেখো বুঝি? অথার?

মাথা চুলকে বললাম: হুঁ। এই আর কি······

ভদ্রমহিলা যেন হাঁ হ'য়ে গেলেন। বললেন: কী সৌভাগ্য! অ্যান অথার আণ্ডার আওয়ার রুফ!

তাঁর কথায় হাঁ হ'লাম আমিও। কেউ লেখে শুনলে মুখ বেঁকিয়ে হাসতে হয়, তাই তো জানতাম; শ্রদ্ধায় কারোর মুখ হাঁ হ'য়ে যায়, চোখ কপালে ওঠে, এই দেখলাম! বুকখানা যেন দশ হাত ফুলে গেল।

তুমি গল্প লেখো বুঝি?

গড়গড় ক'রে বললাম: গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রম্যরচনা, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইত্যাদি এবং ব্যবসাপত্রের পত্রাদিও। আর একটা মাসিক পত্রিকার সম্পাদকও বটি!

আত্ম-পরিচয় ও প্রশংসার একটি দেড়গজি ফর্দ ফব্‌ফব্‌ ক'রে বলতে পেরে আনন্দে মনটা ফুরফুর ক'রে উঠলো। নেকটাইয়ের নট্‌টাকে একটু নেড়েচেড়ে ঠিক ক'রে নিয়ে, দু' পকেটে হাত গুঁজে ডিঙি মেরে দাঁড়ালাম। উপায় কি? আমি যে একটি বিশেষ বস্তু সেটা আমি ছাড়া আব কে প্রমান করবে এখানে? তাছাড়া প্রচার-পোক্ত দেশে এইটুকু আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টা বিশুদ্ধ আত্মরক্ষারই সামিল।

তুমি এই দেশভ্রমণের কথাও লিখবে? ল্যাণ্ডলেডি জিজ্ঞাসিলেন।

বললাম: নিশ্চয়ই; সেই জন্যেই তো একটু নির্জনতা···। আর আমার সে কাহিনীতে তোমাদের কথাও থাকবে।

ইজ ইট মিঃ গস? উই উইল বি সো হ্যাপী! বলেই বললেন ল্যাণ্ডলেডি: সো মিঃ গস্‌, আমি ঠিক করলাম, তুমি একলাই এই ঘরে থাকবে, আর বাড়তি দিতে হবে না কিছুই।

থ্যাংকু ম্যাম। পাকা বাস্তববাদীর মত জিগ্যেস ক'রে বসলাম: জানতে পারি চার্জটা কত?

হাসলেন তিনি। বললেন: বেশী নয়। দু' পাউণ্ড পনের শিলিং দিয়ো।

হপ্তায়। বেড, ব্রেকফাষ্ট, ডিনার। শনিবারে ডিনার নেই আর রবিবারে ডিনারের বদলে লাঞ্চ।

তাঁর কথায় বোধহয় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম, তাই বললেন হেসে: মানে, শনিবার আর রবিবার সন্ধ্যেটা আমার হাজব্যাণ্ডের সঙ্গেই কাটাতে চাই। এই কোথাও একটু বেড়িয়ে আসা, একটু সিনেমা থিয়েটার কিংবা কনসার্ট বা ড্যান্স……

বটেই তো, বটেই তো। ফর্দ আর বাড়াতে দিলাম না: সঙ্গীও তো আশা করেন সঙ্গ তব! হেঁ, হেঁ!

ও ইয়েস! এক্স্যাক্‌টলি।

কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গ কবে পাচ্ছি বলো। আসলে আসল কথায় আসা দরকার।

বললেন ল্যাণ্ডলেডি: পরশু থেকে। কাল ঘর গুছিয়ে রাখবো। দুধ নেবে কি?

হ্যাঁ।

তা' হলে আরো আড়াই শিলিং হপ্তায়।

এবার পাত্রী দেখার মত আমি দু'চারটে প্রশ্নবান ছাড়লাম: শুনলাম ইণ্ডিয়ান ডিশ রাঁধতে জানো, ভাত রাঁধতে জানো?

জানি।

কারি?

পারি। তবে তোমার পছন্দ হবে কিনা জানিনে।

ডাল?

ভদ্রমহিলা চমকে গেলেন, ডাল? হাউ ইজ ডাল? বললেন পরে: যদি প্রসেসটা ব'লে দাও চেষ্টা করতে পারি!

প্রসেস! মনে মনেই হাসলাম। খাওয়ার প্রসেসটাই জানা আছে। ডালে-ভাতে মাখিয়ে সপাসপ্ সাঁটা। আর সেই সঙ্গে ভাজা বা তরকারির টাকরা। রাঁধার প্রসেস কি জানি ছাই।

বললাম: মানে, ভেজিটেরিয়ান মানুষ কিনা, তাই খাবার তালিকার দিকে এত নজর।

ভদ্রমহিলা বললেন, ডিনারে রাইস, কারি, বয়েল্ড পটেটো, স্যালাড পুডিং, কফি; আর ব্রেকফাষ্টে ব্রেড, বাটার, জ্যাম, জেলি আর টি—হবে না?

মেনুর বহর দেখে আপনা থেকেই মনে হ'লো, বাহবা। একগাল হেসে বললাম, অলমতি বিস্তারেন।

পরে ল্যাণ্ডলেডির সঙ্গে দোতলায় নেমে এলাম। ভদ্রমহিলা নিজের বেডরুমের দরজায় টোকা দিলেন। একটু পরেই দরজাটা খুললো। দেখা দিলেন এক ভদ্রলোক—স্মার্ট, দোহারা চেহারা, মুখে পাইপ।

ল্যাণ্ডলেডি পরিচয় করিয়ে দিলেন: মিঃ গস, আওয়ার অনার্ড গেষ্ট। মিঃ লাফোরকেড, মাই হাজব্যাণ্ড।

ভদ্রলোক বললেন: সো গ্ল্যাড টু মিট ইউ।

বললাম হেসে: আমিও আহ্লাদে আটখানা।

ল্যাণ্ডলেডি মিসেস লাফোরকেডও দেখলাম আহ্লাদী-আহ্লাদী সুরে বললেন: মিঃ গস ইজ এ্যান অথার, ডিয়ার। ইজণ্ট ইট ইনটারেষ্টিং?

অ' কোর্স। বললেন ডিয়ার।

নাও, গুডবাই মিষ্টার অ্যাণ্ড মিসেস লাফোকেড। বিদায় নিচ্ছিলাম।

মিষ্টার বাধা দিলেন: অও মিঃ গস। উই আর নট্ লাফোকেডস, বাট লাফোরকেডস।

ও, আই অ্যাম সরি। বললাম: আমিও কিন্তু গস্ নই, ঘোষ।

ইজ ইট মিঃ গ-গ-গস।

তবু 'ঘোষ' বলতে পারলেন না ভদ্রলোক। পারবেন কি ক'রে? ঐ মোটা জিবেয় আমাদের সংস্কৃত জিবের উচ্চারণ করা সহজ নাকি? অ থেকে ৺ পর্যন্ত উচ্চারণে মুখের মধ্যে জিবের খেলা দেখানো চাট্টিখানি কথা!

গুড বাই, মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস লাফোরকেড। বিদায় নিলাম।

•

ঘাড় বেঁকিয়ে বুক ফুলিয়ে মিসেস বেনার্সীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিচেনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে রুটি বেলছিলেন তিনি, আমার ডাক শুনে বেলুনটা হাতে নিয়েই সামনে এসে দাঁড়ালেন।

তবু সাহস ক'রেই বললাম: দেখুন মিসেস, আপনার হাতের ঐ চাপাটি আর কারি আমার পরম প্রিয়! কিন্তু তবু আপনাদের মায়া আমায় ত্যাগ করতে হচ্ছে।

সত্যি মিঃ ঘোষ, আপনার অনেক অসুবিধে হ'লো ঘরের জন্যে। বললেন মিসেস বেনারসী : উপরে একটা ঘর আসচে হপ্তায় খালি হবে। আপনি নেবেন সেটা ?

বললাম : আর দরকার নেই। পেয়েচি একটা ঘর। ঘরটা ভাল। কিন্তু কারি চাপাটির মজা নেই সেখানে।

মিসেস হাসলেন শুধু।

বললাম : মিসেস বেনারসী, এটুকু বুঝেচি, আপনার এ তীর্থের দরজা সব সময়েই সকলের জন্যেই খোলা। আমাদের ভারত-তীর্থের মতোই। ইণ্ডিয়ায় ফিরে ভাবী বিলেতযাত্রীদের জানাবো এই তীর্থের কথা। বলবো যদি বিলেতে গিয়ে কারি চাপাটি খেতে চাও, আর থাকার ব্যবস্থায় না চটো, তবে সোজা চলে যেও বেনারসী তীর্থে।

মিসেস হাসলেন : ও ইউ নটি।

হাসি-মেয়ে কুসুম চাপাটি কিচেনেই ছিল। স্যালাড তৈরী করছিল। হঠাৎ কাছে এসে বললো : সত্যিই যাবেন মি ঘোষ ?

বললাম : সব ঠিক হ'য়ে গেছে কুসুম। আর যেতে তো হবেই একদিন।

মিসেস বললেন : কবে যেতে চান ?

পরশু।

কুসুম ম্লান হেসে বললো : সো উই আর মিসিং ইউ মিঃ ঘোষ।

বেনারসী-তীর্থ ছাড়লাম। মিসেস বেনারসীর হাঁড়ি-মুখ আর কুসুম-চাপাটির হাসি মুখ আর সকাল সন্ধ্যায় দেখতে পাবো না বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে অমন উপাদেয় চাপাটি-কারির মুখ দেখতে পাবো না, সেই দুঃখুই যেন মনে বেশি ক'রে বিঁধতে লাগলো। এযে কতবড় দুঃখু, বঙ্গের বাঙ্গালী তা মোটেই বুঝবে না, যতটা হাড়ে-হাড়ে বোঝে বিলেতে-বাঙ্গালী। মশলা খেয়ে মানুষ আমরা। আমাদের রান্নায় মশলা, পানে মশলা, তত্ত্বে মশলা—মশলায় মশগুল আমরা ; আমাদের জিবেয় রোগীর পথ্যি সেদ্ধ আর রোষ্ট, স্রেফ নুন-গোল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে রোচে নাকি ? নিষিদ্ধ মাংস সুসিদ্ধ অবস্থায়

ঈষৎ নুন-মরিচ সংযোগে গলাধঃকরণ করা—আর দেশে মা-মাসির হাতের মাছের ঝাল-ঝোল-অম্বলের কথা মনে ক'রে চক্ষু ছল-ছল করা—এ ট্র্যাজেডি বিলেতবাসী বঙ্গসন্তানের একচেটিয়া ব্যাপার। ধার্মিক ইংরেজ খাবার টেবিলে ব'সে বলে, হে ঈশ্বর, আজ আমার খাদ্যের ব্যবস্থা ক'রে দিলে, সেজন্যে তোমায় অশেষ ধন্যবাদ। বাঙ্গালী ছেলে ইংরেজী খাবার টেবিলে ব'সে বলে, হে ঈশ্বর, এ খাদ্যের বরাদ্দ থেকে কবে মুক্তি পাবো?

তবু বেনারসীর চাপাটি-কারির লোভ সংবরণ করতে হ'লো। এসেচি জীবন দেখতে, জিব নিয়ে ব্যস্ত থাকতে নয়। তাছাড়া বেনারসী-আড্ডাতেও ভাঙন ধরতে শুরু হলো। ডাক্তার ভাইরা চাকরি জোগাড় ক'রে যে যেদিকে পারচে, ছিটকে পড়চে; নকাইবাবু জাহাজ অফিসে যাতায়াত করচেন, দেশে ফেরবার আশায়; আর্টিষ্ট ঘোষ বললেন, আর্ট স্কুলের কাছে একটা হোটেলে উঠে যাবেন শীগ্রী; আর বোলিং-ষ্টোন দত্তদা এ তীর্থের একজন স্থায়ী বাসিন্দা, বললেন: এমন চাপাটি, ডাল-ও, মরি যদি সেও ভালো, সে মরণ স্বরগ সমান। আসল কথা, সস্তায় এমন পেটোয়া-ব্যবস্থা লণ্ডন সহরে দুর্লভ। বেনারসী-তীর্থটা যেন তীর্থস্থানী ইষ্টিসানের প্ল্যাটফর্ম। প্যাসেঞ্জাররা ট্রেন থেকে নামে। খানিকটা থামে। বোঁচকার উপর ব'সে ভাবতে থাকে—কোথায় যাবে। শেষে পাণ্ডা বা গাইডের সঙ্গ ধরে ওঠে গিয়ে তাদের পছন্দ-করা আস্তানায়।

নতুন আস্তানাটা মনের মতই হলো। স্যালকট্ গার্ডেনস্। সামনে দিয়ে বাস যায়। বেলসাইজ পার্ক আর চকফার্ম টিউব ষ্টেশনের মাঝামাঝি জায়গা। পথের দু'ধারে সার বন্দী গাছ। পথের একধারে পাশাপাশি বহুৎ দোকান যথা-লণ্ড্রী, ডেয়ারী, কেমিষ্ট, গ্রসারী, বার, পোষ্ট আফিস, ব্যাঙ্ক—একটি সভ্যযুগ-জীবের আর কি চাই? পথের আর এক ধারে একই ধরনের বাড়ির সারি। সামনে একটু করে খোলা জায়গা। প্রথমে সাদা গেট, একটু ঢুকে বাড়ির সদর দরজা, সদা বন্ধ। বাড়ির লোক হ'ও তো, পকেট থেকে ল্যাচ-কী বার ক'রে খুট্টুস ক'রে দরজা খুলে ঢুকে পড়ো; আর বাইরের লোক হ'ও তো, বেল টিপে দাঁড়াও একটু।

যথা দিনে স্যুটকেশ হাতে বেল টিপ্তেই হাসি মুখে দরজা খুললেন মিসেস লাফো: মর্ণিং মিঃ গস।

মর্ণিং মিসেস লাফোরকেড। 'র'য়ের উপর জোর দিলাম ভাল ক'রে।

ঘরে গিয়ে দেখি, ভোল্ বদলে গেছে একদম। মোম দিয়ে মেঝে মাজা। তাতে কার্পেট পাতা। দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা। জানলায় পর্দা। আলনায় তোয়ালে। টিপয়ে জল ভর্তি কাঁচের জগ। তার তলার এনামেলের বালতি। টেবিলে টেবিল-ল্যাম্প, এ্যাশট্রে, চেয়ারে গদি, সোফায় কভার। হিটারের পাশে গ্যাস ষ্টোভ, পাশে কেটলি। একেবারে সাজানো সংসার।

মিসেস বললেন: কী, পছন্দ হয়েচে তো?

তা' হয়েচে।

ল্যাণ্ডলেডি বললেন: আশাকরি তোমার কোন অসুবিধে হবে না। তাছাড়া আমরা খুব সাবধানেই চলাফেরা করে থাকি; কাজেই দুমদাম আওয়াজ বা হৈ চৈ পাবে না এ বাড়িতে। অতএব নির্বিঘ্নে তুমি লেখার কাজ করতে পারবে বলেই মনে করি। তবু, কোন অসুবিধে হলে ব'লো।

কেমন যেন সংকুচিত হয়ে পড়েছিলাম। তাড়াতাড়ি বললাম: নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। সত্যিই তুমি আমার জন্যে এত ভাবচো। অশেষ ধন্যবাদ।

ও, নো! ইট্স্ মাই ডিউটি মিঃ গস। 'বাই মিঃ গস। বিদায় নিলেন মহিলা।

আমি দরজাটি বেশ এঁটে বন্ধ করে, সপোষাকেই চার হাত পা ছড়িয়ে বিছানার উপরে ধপাস করে শুয়ে পড়লাম: আঃ! ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা, করেছিনু আশা। হৃদয় শান্ত হলো, পাওয়া গেল, ঘর এক খাসা॥

সন্ধ্যা সাতটায় ডিনার খাবার সময়, সুবিস্তৃত আলাপ পরিচয় হ'লো ল্যাফরকেড পরিবারের সঙ্গে। আমিও প্রয়োজন মত আত্মবিবরণ পেশ করলাম। আমার ল্যাণ্ডলেডি বা গৃহ-মহিলা (গৃহলক্ষ্মী কথাটা ব্যবহার করতে গিয়েও করলাম না, আমার দেশী গৃহলক্ষ্মীর মুখ চেয়ে), যা বললেন কথার-কথায়, তাতে বুঝলাম তাঁর শরীরে ইংরেজ রক্ত আর তাঁর স্বামীর শরীরে ফরাসী। এই ইঙ্গ-ফরাসী প্যাক্টের কোন 'সুফল' দেখা যায়নি, তবে সেজন্যে দুঃখিত নন স্বামী কিংবা স্ত্রী। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রমহিলার যোগাযোগটা কি ভাবে হ'য়েছিল, সেটা প্রথম আলাপেই বলতে যাওয়া তাঁর

পক্ষে বোকামি, আর আমার পক্ষে শুনতে চাওয়া অভদ্রতা। দেখা গেল, তিনিও বোকামি করলেন না, আমিও ভদ্রতা করলাম। কাজেই প্রসঙ্গটার আলোচনা হলো না, তবে বোঝা গেল, সেই পুরাতন প্রেম। মিষ্টার এখন ইষ্ট এণ্ডে এক ফরাসী ব্যাঙ্কের অফিসার এবং মিসেসের ব্যবসা গৃহস্থালী। অর্থাৎ, তিনি অফিসে না গিয়ে ঘরে পেয়িং গেষ্ট রেখে, খরচখরচা বাদে যা বাঁচাতে পারেন, সেটা তাঁরই প্রাপ্য। বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল, আমি মিসেসের পোষ্য এবং কিছু দরকার হলে তাঁর স্কার্ট ধরে টানলেই হবে, মিষ্টারের নেকটাই ধরে নয়।

আসলকথা, 'জানিনা কোথায় আছি, রাশিয়া কিংবা রাঁচি' ব'লে গলা কাঁপিয়ে গান গাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রথাটি অচল। তুমি কোথায় আছো, কার কাছে আছো, কেন আছো, সর্বাগ্রে সেটি হৃদয়ঙ্গম করা বিশেষ দরকার। জানা গেল, বাড়িখানি কর্তার ; বোঝা গেল, কর্তাটি গৃহিনীর ; এবং দেখা গেল, আমি সেই গৃহিনীর পোষ্য। অতএব নিরাপদ।

সুতরাং বহালতবিয়তে দুচোখ খুলে লণ্ডন ইনস্পেকসন শুরু করলাম।

ক'দিন ধরে লক্ষ্য করছিলাম, প্রায় রাস্তার মোড়ে কম-রেঁস্তোর ছেলেগুলো (অবশ্য পোষাক দেখে যতটা বোঝা গেল) ন্যাকড়ার বড় পুতুল করে বাড়ির দেওয়ালে ঠেকিয়ে রেখে, যে যাচ্ছে তার কাছেই চাইচে : এ পেনী, ফর্ দ্য গই। বুঝলাম না ব্যাপারটা কি? কাজেই ডিনার টেবিলে আমার অগতির গতি ল্যাণ্ডলেডিকে জিগ্যেস করে জানলাম ওর বৃত্তান্ত। চার'শ বছর আগে প্রথম জেমস-এর রাজত্বে পার্লামেণ্ট বিরোধের সময় এই গই ফোকাস নাকি বোমা দিয়ে পার্লামেণ্ট উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। অবশ্য পারেনি ইংরেজের এবং পার্লামেণ্টের ভাগ্যের জোরে। কারণ গই ফোকাসের ষড়যন্ত্র ফাঁস হ'য়ে যাওয়ায় তার টাইম-বোমাটি ঠিক সময় মতই পার্লামেণ্ট থেকে সরিয়ে ফেলা হয় এবং সেই সঙ্গে গই ফোকাসকেও এই পৃথিবী থেকে। তাই সেই দিনটাকে স্মরণ করে, এই ছেলেগুলি ঐসব ন্যাকড়ার গই ফোকাসকে পোড়ায় আর সেই সঙ্গে নানারকমের বাজীও পোড়ায় দুড়ুম ধাড়াম। অর্থাৎ আমাদের দশেরা আর দেওয়ালীর বিলিতী ব্রত উদযাপন

করে সেদিন। কয়েকদিন পরেই দেখলাম লণ্ডনী আকাশে বিলিতী হাউই, তুবড়ী ; কানে এসে বাজলো বিলিতী পটকা-বোমার শব্দ, যার মারাত্মক বাস্তব নিদর্শন পেয়েছিলাম আমরা পলাশীর আম বাগানে। লণ্ডনের ধোঁয়াটে আকাশ বাজীর ধোঁয়ায় ব্যাজার হ'য়ে গেল।

নভেম্বরের শেষ তারিখ সেদিন। ব্রেকফাষ্ট টেবিলে মিসেস লাফরকেড বললেন : মিঃ গস আজ পার্লামেণ্ট ডে। আজ আমাদের রাণী প্রসেসন করে পার্লামেণ্টে যাবেন। হোয়াইটহলের রাস্তায় দাঁড়ালে সব দেখতে পাবে। কী, যাবে ? আমিও তোমার সঙ্গে যেতাম, তবে বাড়ীতে কাজ আছে একটু।

বললাম : তা যেতে পারি আমি। ইংলণ্ডেশ্বরীকে একবার দেখাও তো দরকার।

হাসলেন মিসেস : আমাদের রাণীর চেহারা কিন্তু এমন আহা-মরি গোছের কিছু নয়।

এঁ্যা, বলে কি ? জন্ম অবধি শুনে আসচি, পড়ে আসচি, ইংরাজ অতি রাজভক্ত জাতি। আর এ ইংরেজ ভদ্রমহিলা কিনা রাণীর রাজ্যে বসেই করচেন রাণীর রূপের আলোচনা। হায় নারী। জানি, তোমার কাছে তুমি ছাড়া আর সবাই খেঁদী পেঁচী টিপকপালী।

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে সেজেগুজে বেলসাইজ টিউব ষ্টেশনে ডুব দিলাম, মাথা চাড়া দিয়ে উঠলাম গিয়ে ওয়েষ্টমিনিষ্টার ষ্টেশনে। ভূগর্ভে চেরিংক্রসে নর্দান লাইন ছেড়ে সার্কেল লাইনের ট্রেন ধরতে হলো।

হোয়াইটহলে এসে দেখি চওড়া রাস্তাটার দুধারে লোকে লোকারণ্য। লোকের মাথার সাদা আর বাদামী চুল নয়তো, যেন পাটের আঁশ ছড়ানো চারধারে। মাঝে মাঝে গোঁড়া মেম সাহেবের টুপি, যেন রঙীন ফুল। তবে অত যে ভীড়, একটুও ঠেলাঠেলি নেই, হৈ হৈ নেই। শুধু মৃদু গুঞ্জন। পুলিশ আছে ভীড় নিয়ন্ত্রণ করতে, কিন্তু তারা অকেজো হ'য়ে দাঁড়িয়েই আছে। লাঠি নিয়ে ভীড় ঠেলে 'হঠো হিঁয়াসে' বলবার জন্যেই তো পুলিশ। এ লোকগুলি দেখলাম, পুলিশকে একদম বেকার করে দিয়েচে।

আমিও একটা জায়গা করে নিলাম। দেখলাম, না ঠেলাঠেলি করেও

ভদ্রভাবে বেশ জায়গা করা যেতে পারে। আমার বাঁ পাশেই এক ভদ্রলোক, আমার মাথাটা তাঁর কাঁধ পর্যন্ত, আর আমার ডান পাশে এক অল্প বয়সী মহিলা, তাঁর মাথাটা আমার কাঁধ পর্যন্ত। হাতে তাঁর একটি ক্যামেরা, ফটো তুলবেন, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছেন না। কারণ সামনেই তিন চারটি তরুণী দাঁড়িয়ে। মহিলাটি কেবল উঁকি ঝুঁকি মারচেন, ফাঁক খুঁজচেন, তবু পেলেন না। আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই মিঠি হাসি হেসে মৃদুস্বরে বললেন : নো হোপ্।

বললাম বটে : আই থিংক সো। —কিন্তু আমি তো জানি, এধরণের কথা এই নতুন এলো কানে। এসব ক্ষেত্রে একটু ফাঁক পেলেই ঢুঁ মেরে বলতে হয় : দেখি একটু সরে, কিসসু দেখা যাচ্চে না যে।

আমাদের পেছনের ফুটপাথ দিয়ে একটি লোক প্রোগ্রাম বিক্রী করছিল, গলার স্বর সামান্য বাড়িয়ে। একখানা কিনলাম। তাতে রাণী, রাণীর স্বামী আর রাজবংশের ছবি। দেখলাম, দ্বিতীয় এলিজাবেথ এবং তাঁর স্বামী ডিউক অব এডিনবার্গ আইরিশ ষ্টেট কোচে চড়ে ঠিক ১০-৩০ মিনিটে বাকিংহাম প্যালেস থেকে বেরুবেন এবং ম্যাল, হর্স-গার্ড আর্চ, হোয়াইটহল, পার্লামেণ্ট ষ্ট্রীট হয়ে পার্লামেণ্টে গিয়ে বাৎসরিক দ্বার উদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। পথে হাউসহোল্ড ব্রিগেড বাজাবে জাতীয় সঙ্গীত এবং সেণ্টজেমস পার্ক থেকে ৪১ বার তোপধ্বনি পড়বে। তারপর দেখি এক লম্বা ফিরিস্তি। দু'জন দু'জন ক'রে কাদের পর কারা থাকবে পার্লামেণ্টে ঢোকবার সময়, তাদের পদ পরিচয়। অর্থাৎ একটু এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

দিব্যি বিনা উপদ্রবেই সবটা পড়া গেল। 'একটু দেখি তো দাদা' ব'লে হাত থেকে প্রোগ্রাম বা কোন কাগজ ছিনিয়ে নেবার রীতি এরা জানে না কেউ। এমন কি, একটু ঘাড় ফিরিয়েও আমার প্রোগ্রামখানা কেউ উঁকি মেরে দেখলে না গা ?

সামনের তরুণী কটি নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কথা বলচে আর চাপা হাসি হাসচে। তাদের মধ্যে একটির রং আর চেহারা দেখে মনে হলো বিদেশিনী। হয়তো ইতালীয়ান, কিংবা স্পেন দেশীয়া। একটু চাপা রং, বাদামী চুল, মুখে লালিত্য, কথায় 'ট' উচ্চারণ নেই, 'ত' উচ্চারণ। বাকী কটি মেয়ের ভিনদেশীয়া বান্ধবী হয়তো। ওদের মধ্যে, একটি মেয়ে হঠাৎ ফুট-পাথের দি ক আসতে চাইলো। সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি সবাই সরে গিয়ে দিলাম

পথ ক'রে। মেয়েটি বেরিয়ে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এলো কয়েক প্যাকেট চকোলেট নিয়ে। ভাগাভাগি ক'রে খাওয়ার পরেই দেখি, যে যার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে যার যা দাম, মিটিয়ে দিল চকোলেট-আনা মেয়েটীর হাতে। মেয়েটীও নিলো হাত পেতে। কী ঘেন্না। বন্ধুদের সামান্য একটু চকোলেট খাইয়ে, তার আবার পয়সা বুঝে নেওয়া। বুঝলাম, এরা ভাগাভাগি ক'রে খেতে জানে, ঘাড় ভেঙে খেতে শেখেনি এখনো। নাঃ, অনেক কিছুই এরা জানে না তো।

একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। শোভা যাত্রা আসচে। শৃঙ্খলায় সৌন্দর্যে ও গাম্ভীর্যে ভরা এক রঙীন অপরূপ দৃশ্য। রাণী কাছে আসতেই সবাই হাত তুলে জানালো তাদের সরব অভিনন্দন। রাণী চার ঘোড়ার ষ্টেট কোচ থেকে মৃদু হেসে গ্রহণ করচেন তাঁর রাজভক্ত প্রজাদের শুভেচ্ছা। ছোট্ট সাধারণ দেখতে মেয়েটি। সরল সুন্দর মুখখানি। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবতী। ইংলণ্ডেশ্বরী।

ডিউক ওধারের দর্শকদের দর্শন দিচ্চেন।

শোভাযাত্রা চলে গেল, কিন্তু ভীড় জমাট বেঁধেই রইল। তাদের রাণীকে আবার দেখতে হবে না? এই পথেই তো ফিরবেন।

একটু পরেই শুরু হবে পার্লামেণ্টে বহুদিনের বহু রকম প্রথা পালন।

ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী সর্বত্র যেতে পারেন, কিন্তু হাউস অব কমন্সে নয়। কমন্স, টম-ডিক-হ্যারির জন্যে, রাণী বা রাজার জন্যে নয়। প্রথম চার্লস কমন্সে ঢুকেছিলেন, আইন কানুন বদলেছিলেন, কিন্তু তাতে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল গোলমেলে। তাই আজো সেই গোলমেলে প্রথা মানতে হয় তাঁর বংশধরদের এই পার্লামেণ্ট ডে-তে।

হাউস অব লর্ডসে রাণী এসে বসেন সিংহাসনে। একলাই। অদূরে পাশে একটা চেয়ারে বসেন তাঁর স্বামী, ডিউক। তিনি তো আর রাজা নন। তারপর রাণী পুরোন প্রথামত ব্ল্যাক রড হাতে জেণ্টলম্যান ইউশারকে পাঠান হাউস অব কমন্সে: যাও, খবর দাও, হার ম্যাজেষ্টীর ইচ্ছে, ওঁরা এই হাউসের সভায় এসে অনুষ্ঠানে এখনই যোগ দিন। কিন্তু কমন্সের সবাই জানেন, দূত আসচেন। কাজেই তাঁর মুখের উপরেই কমন্সের দরজা দেওয়া হয় বন্ধ

ক'রে। কিন্তু রাজদূতও দমবার পাত্র নন। ব্ল্যাক রড দিয়ে দরজায় তিন বার ঠোকেন। অগত্যা দরজা খুলে তাঁকে ঢুকতে দিতে হয়।

কমন্সের হলে থাকেন মিঃ স্পীকার, মন্ত্রীরা এবং সভ্যরা। রাজদূত তাঁদের অভিবাদন জানান, তাঁরাও ভদ্রতা করেন। পরে রাজদূত চীৎকার ক'রে জানান: মিঃ স্পীকার, রাণী এই হাউসের মান্যবরদের এক্ষুনি হাউস অব লর্ডসে যেতে আদেশ করেছেন। বক্তব্য শেষ ক'রে রাজদূত পেছু হটতে থাকেন এবং কমন্সের সবাই ভাল ছেলের মত গুটিগুটি জোড় বেঁধে আসতে থাকেন হাউস অব লর্ডসে। প্রথমে মিঃ স্পীকার। পরে প্রধান মন্ত্রী এবং অন্য মন্ত্রী এবং সভ্যরা। অথচ কারোর জন্যেই বসবার চেয়ার থাকে না। সবাইকেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এমন কি মিঃ স্পীকার এবং প্রধান মন্ত্রীকেও। আর হাউস অব লর্ডসের লর্ডরা তখন দিব্যি চেয়ারে ব'সে আড়চোখে ওঁদের অবস্থাটা দেখতে থাকেন। এর পর রাণী তাঁর তৈরী ভাষণ দেন। ভাষণটি অবশ্য তৈরী হয় প্রধান মন্ত্রীর কলম থেকেই। ভাষণের পর শেষ হয় অনুষ্ঠান।

কিন্তু অনুষ্ঠানটী শুরু হবার আগে, অর্থাৎ রাণী পার্লামেণ্টে ঢোকবার আগে একটি চারশ বছরের পুরোন প্রথা পালন করে ইংরেজ। ঐ যে গই ফোকাস পার্লামেণ্টের মধ্যে টাইম বোমা রেখেছিল আর সেটাকে খুঁজে বার করা হ'য়েছিল—আজো তাই 'ইয়োমেন অব দ্য গার্ড'রা পার্লামেণ্ট হাউসে সেই বোমা খোঁজবার অভিনয় করে। নিয়ম।

নিয়ম মানতে এরা ওস্তাদ। মায়ের পেট থেকে প'ড়ে মাটির তলায় যাওয়া এস্তক এরা নিয়ম মানে। সকালে চোখ খোলা থেকে রাত্রে চোখ বোজা পর্যন্ত এরা নিয়মানুদাস। সারা জীবনটা এরা নিয়মের বেতের আগায় এক-পায়ে দাঁড়ানো। নিয়ম মানায় রবিঠাকুরের তাসের দেশকেও হার মানায় এই ইংরেজের দেশ। তবে তাসেদের মত এরা হাই তোলে না, 'হাইয়ার-আইডিয়া' নিয়ে মাথা ঘামায়। তাই লণ্ডন সহরেই দেখা যায় সেকেলে কাঠের 'বার' বাড়ীর পাশেই একেলে স্ট্রীমলাইনড্ বাড়ি। দেখা যায়, একেলে খালি মাথার মাঝে মাঝে সেকেলে টপহ্যাট। এদের এক পা পুরোন ডিঙিতে, আর এক পা জেট প্লেনে। নিজের দেশের মাটিতে পুরোন খুঁটিটাকে শক্ত ক'রে

পুঁতে, তাতে নিজেকে লম্বা দড়িতে বেঁধে চ'ড়ে খাচ্চে অন্য দেশের ঘাস।

ইংরেজ অনেক কিছুই প্রথমে করেচে কিন্তু কোন প্রথাকেই ভাঙেনি আজো। আশ্চর্য জাত। একহাতে পুরোনকে আঁকড়ে আছে, আর এক হাতে হাতড়াচ্চে নতুনকে। এতদিন ধ'রে এত যে ক'রেচে, আজো করচে, এত যে গড়েচে, আজো গড়চে, এতসব অতটুকু দ্বীপটায় রাখবে কোথায় ভেবেচে কি? অথচ রেখেচেও তো। কেমন সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেচে। এখান-ওখান থেকে কুড়িয়ে কাড়িয়েও রেখেচে; আর যক হ'য়ে সব পাহারা দিচ্চে, যেন যকের ধন!

সত্যই, মিউজিয়ামগুলো দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এদেশে এসে স্কুল কলেজে ভর্তি না হ'য়ে চোখ খুলে ঐ মিউজিয়ামগুলো দেখলেই একজন পাকা পণ্ডিত হ'তে পারে। মিশ্র একদিন বলেছিলেন, মানুষের ক্রমবিকাশের ব্যাপারটা অনেক দুর্দান্ত মোটা মোটা বই প'ড়েও ভালো করে বুঝেছিলাম না, কিন্তু ন্যাচারাল হিষ্ট্রি মিউজিয়ামে ঐ ব্যাপারটি এমন চমৎকার ক'রে মডেলের সাহায্যে বুঝিয়েচে, যে দেখেই সবটা জলবৎ হ'য়ে গেল। কথাটা মিথ্যে নয়।

রাস্তা দিয়ে চলি; এদের দেখি আর ভাবি, কী দিয়ে তৈরী এরা। দিব্যি তো ভালমানুষের মত কোট-ওভারকোট প'রে চলেচে, গট গট ক'রে চলেচে, মেয়েরা ভ্যানিটি ব্যাগটি বগলে চেপে খুট খুট ক'রে চলেচে—অথচ কী এমন মাল-মশলা এদের মধ্যে আছে, যা দিয়ে গোটা পৃথিবীটাকে ধাঁধিয়ে দিলো। শুধু সাহস আর শৃঙ্খলা? হয়তো। আর বোধ করি আছে, পেটে বিদ্যে, ঘটে বুদ্ধি; দেহে শক্তি, দেশভক্তি।

এই ইংরেজ জাতটার সঙ্গে যেন কারোর মিল নেই। আড্ডার ব্যাপারে ফরাসীদের সঙ্গে আমাদের মিল আছে; লোক ঠকানোর ব্যাপারে আর চেহারায় ইতালীয়ান আর আমরা ভাই-ভাই; গৃহস্থালীতে জার্মান্ আর দেশী গিন্নীরা একই প্রায়ই; ভেতো হিসেবে জাপান-ইণ্ডিয়ার নাম আছে; সংস্কৃতির দিক দিয়ে চীনে ও আমরা সুপ্রাচীন জাত।

কিন্তু এই ইংরেজ ইংরেজেই। একম্ অদ্বিতীয়ম্। ইয়োরোপে থেকেও এরা ইয়োরোপের বাইরে। কন্টিনেন্টে এরা বিদেশী। কন্টিনেন্টের কেউ বলে, এরা নাক-তোলা; কেউ বলে, এরা গোমড়ামুখো; কেউ বলে, এরা বোবা; কেউ বলে, এরা একাসেরে।

আর ইংরেজ বলে, হ্যাঁ আমরা একাসেরে। একা, তাই অসাধারণ! বেশি কথা বলিনে, বেশি কাজ করি কিনা! আর আমাদের হাসি? আমাদের রঙ্গ-ব্যঙ্গের পত্রিকা দেখো।

আমরা না হয় সাত সমুদ্র তের নদীর পারে থাকি, কালা আদমি, নেটিব—কিন্তু ওদের আশেপাশের সাদা চামড়ার ভায়েরাও এই ইংরেজ জাতের হদিশ পায় না। হাতের কাছে ফরাসীরা ইংরেজদের ঠাট্টা করে, গোমড়া মুখো জাত। মাঝখানে তো এক ফালি জল—ইংলিশ চ্যানেল। কিন্তু দুটো দেশে যেন আকাশ পাতাল তফাৎ।

স্কচদের সঙ্গে আবার জলের ফারাক'ও নেই, অথচ আচারে বিচারে আকাশ পাতাল ফারাক।

ইতালীতে, জার্মানীতে, ফ্রান্সে সকলকেই প্রায় বলতে শুনেচি, ইংলণ্ডে থাকবে ক'দিন? কেন? মানে, এসময়টা ঠাণ্ডা হাওয়ায় আর সবসময় ওদের ঠাণ্ডা ব্যবহারে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে হবে। তাছাড়া সাজ পোষাকে, চাল-চলনে, কথা-বার্তায়, আচার ব্যবহারে তটস্থ হ'য়ে থাকতে হবে সর্বদা।

এ বিষয়ে প্রখ্যাত ফরাসী লেখক আঁদ্রে মোরয় তাঁর একটি রচনায় ভারি রসিয়ে এঁকেচেন ইংরেজ চরিত্র। ইংলণ্ডে গমনোদ্যত দেশোয়ালী ভাইদের উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেচেন: ভাইরে, ওদেশে যাচ্চো তো, একটু দেখে শুনে চলা ফেরা ক'রো। নইলে সবাই তোমাকে উজবুক বা অভদ্র মনে করবে—অবশ্য মুখে বলবে না। এ তোমার ফ্রান্স নয়, যে, নেচে কুঁদে, হেসে খেলে চেঁচিয়ে, পাড়া মাতিয়ে, ফুটপাতে চেয়ার পেতে বীয়ারের গেলাস সামনে নিয়ে আড্ডা মেরে সময় কাটাবে। ওটি ইংলণ্ড। প্রথম ক'দিন তো মনে হবে, এ আবার কোন লোকারণ্যে এলাম রে বাবা! এত লোক, তবু যে অরণ্যের মতই নিঃসঙ্গ ব'লে মনে হচ্চে! এরা কথা বলতে জানে তো? না, স্প্রীং দেওয়া সব কলের পুতুল হট্ হট্ ক'রে, গট্ গট্ ক'রে চলেচে?

পোষাক? ভায়া, ওদের মতই প'রো। যখন ইচ্ছে, যা-তা প'রো

না। আবার বেশি সাজ গোজ করাও পাপ, হাঁ ক'রে দেখবে। আর ঘোড়ায় চড়া পোষাবে যদি গলফষ্টিক হাতে করো, কিংবা একটা নিকার বোকার প'রে ডাইনিং হলে ঢুকলে—তবে হয়তো কোন মহিলা মুর্চ্ছাও যেতে পারেন, আর লজ্জায় যদি তিনি চোখে রুমাল চাপা দেন, তবে বুঝলে ভাগ্য ভাল।

কথা? মেপে-মেপে, ভেবে-ভেবে। বরং কথা না বললে কেউ কিছু বলবে না। তিনটে বছর মৌনব্রত অবলম্বন করলে, প্রশংসা পেতে পারো: ভদ্রলোক ভারি অমায়িক। আর নম্রতায় নত হয়ে থাকো যদি তো, হয়তো তোমার জানিত ইংরেজ ভদ্রলোক বলতে পারেন একদিন: আমার একটা কানট্রি হাউস আছে ছোটখাটো, যাবেন? গেলে ভদ্রলোকের আমন্ত্রণে আর সেখানে গিয়ে দেখবে তাঁর ছোট্ট কানট্রি-হাউসে আছে শ'তিনেক ঘর। অতএব তুমি যদি টেনিস খেলায় চ্যাম্পিয়নও হও, ব'লো, এই একটু ব্যাট নিয়ে নাড়াচাড়া করি। আটলান্টিক পাড়ি দিয়েচো? ব'লো, এই একবার গেছলাম ওপারে। বই লেখো? স্রেফ চেপে যাও, উচ্চবাচ্য ক'রো না। তারপর ইংরেজ যখন তোমার গুণপনা খুঁজে বার করবে (আর গুণ আগুনের মতই ছাই চাপা থাকে না কোনদিনই) তখন দেখো, কাছে এসে ঘেঁসে বসে হেসে হেসে বলবে, আপনার সত্যিকার পরিচয় পেলাম এতদিনে। ওঃ যেন, আমেরিকা ডিসকভার করলে। একবার জিগ্যেস করলে তো, তুমিই ফর্‌ফর্‌ ক'রে সব ব'লে দিতে পারতে।

তবে হ্যাঁ, ইংরেজের কাছে যদি অবিচার পাও, রুখে দাঁড়াবে। নরমে আসবে ইংরেজ। ফ্রান্সের বদনাম করলে, ওদেরও বদনাম ক'রো—তোমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবে।

আর একটি কথা। ভুলেও প্রশ্ন ক'রো না ইংরেজকে। ইংরেজের সঙ্গে এক তাঁবুতে দু'মাস কাটিয়েচি, একই টবের জল ব্যবহার করেচি, কিন্তু ইংরেজ কোনদিন জিগ্যেস পর্যন্ত করলে না, আমার বিয়ে হয়েচে কিনা, আমি কি করি, বা আমার হাতের বইটার কি নাম? বলবার জন্যে আমি মুখিয়ে থাকতাম, কিন্তু আমার তাঁবু-সঙ্গিটি নির্বিকার। আর যদি গায়ে প'ড়ে বলতেই চাও, বলো, বাধা দেবে না ইংরেজ, তবে না শোনার ভানই করবে। তখন থামতেই হবে।

হড়বড় করা ইংরেজের ধাতে সয় না। দরকারের বেশি ইংরেজ ম'লেও

করবে না। ভাবচো ইংরেজ কুঁড়ে? বরং ঠিক তার উল্টো। . দেখো না ওদের হাঁটা। তড়বড় ক'রে হাঁটে না—লম্বা লম্বা পা ফেলে ধীর ভাবে এগিয়ে চলে। আর কথা বলে ইংরেজ থেমে থেমে, চিবিয়ে চিবিয়ে, বক বক ক'রে যা তা বকে না। ভারি ওস্তাদ এই জাত। মনে ইচ্ছে থাকলেও জিবের ডগায় সেটি আনবে না কখনো। আমন্ত্রণ করলে প্রত্যাখ্যান করবে না; না করলে বলবে না, ডাকলেই যাবো।

মহিয়সী বেনারসে দেবী হাতের ঝাল-ঝাল তরকারি যেন মুখে লেগেছিল, কিন্তু এই ল্যাণ্ডলেডি মেমসায়েবের পানসে তরকারি মুখে তুলতে মুখ বিমুখ হ'য়ে উঠলো। প্রথম দু'দিন চোখ কান বুজে গলাধঃকরণ করেছিলাম, কিন্তু তৃতীয় দিনে ভাত-তরকারির ডিনার খেতে বসে মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলো, মুখে বলেই ফেললাম, তবে বেফাঁস কিছু নয়। জানি তো, সর্বদেশের সর্বকালের মেয়েদের রান্নার প্রশংসা করলে গলে জল, দোষ ধরলেই রেগে আগুন।

তাই সবিনয়ে বললাম: মাম্, তোমার হাতের রান্না অতি চমৎকার, বিশেষ ক'রে, এমন চমৎকার সাজিয়ে আনো, দেখলেই জিবেয় জল ঝরে যায়। (বললাম না, আসলে চোখেই জল ঝরে।) তবে কী জানো, আমার এই মসলা-খাওয়া জিবেয় কড়া কিছু না পড়লে যুৎ হচ্চে না।

মিসেস ল্যাফোরকেড বললেন: তা তুমি যদি মসলা এনে দাও, আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। রাসেল স্কোয়ারে একটা বম্বে প্রসারী শপ্ আছে—লাল-জোলি। সেখানে হয়তো তোমাদের দেশী মশলা পেতে পারো। বাট্ আই ডো-নো হাউ টু কুক।

সে আমি দেখিয়ে দেবো, যদি কিছু না মনে করো। সোৎসাহে বললাম বটে, কিন্তু মনে মনে জানিতো, এ বিদ্যায় কত বড় ওস্তাদ আমি।

পরদিনই গেলাম লালজোলির দোকানে। দেখলাম দোকানে প্লাসটিকের ব্যাগে চাল, সেলোফোনের প্যাকেট করা নানারকমের ডাল, পাঁপড়, মশলা; শিশিতে সরষের তেল, জ্যাম, জেলি—সব দেশী মুদীখানার মাল বিলিতী

কায়দায় সাজানো। এদেশে আমরা যেমন বিলিতী পোষাকে, আমাদের দেশী খাদ্য গুলিও তেমনি বিলিতী প্যাকেটে মোড়া।

কিনলাম কিছু হলুদের গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কার লাল গুঁড়ো, গরম মশলার বাদামী গুঁড়ো-সব তু'পেনী ক'রে আর সেই সঙ্গে এক বোতল হাফ পাইন্ট বিশুদ্ধ সরিষার তৈল। দাম সাড়ে তিন শিলিং।

এই ফাঁকে বাজার দরটা জানিয়ে দেওয়া মন্দ নয়। এদেশে যাঁরা রোজ সকালে থলে হাতে বাজারে যান, তাঁরা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন: বেঁচে থাক আমাদের বাংলা দেশ। এক পাউণ্ড চিনি ৮ পেনী ; এক পাউণ্ড আলু আড়াই পেনী ; টমেটো ১ শিলিং ৯ পেন্স পাউণ্ড ; ডিম, গরমকালে এক একটা ৩ পেনী, শীতকালে ৭ পেনী ; আর মাছ? স্প্র্যাট ১ শিলিং পাউণ্ড ; হেরিং-এর দাম ঐ রকমই ; আর রাজা মাছ স্যালমন ১৪ শিলিং পাউণ্ড।

কিন্তু শুধু পেটায় নমো করলেই তো চলে না। আরো পাঁচটা খরচা আছে। সিগ্রেট? ১০টার প্যাকেট ১ শিলিং ৪ পেন্স ; দেশালাই একটা ট'পেন্স বা তু' পেনী ; ১৬ খানা খাম ৬ পেনী, ইনল্যাণ্ড খাম আড়াই পেনী ; বুকপোষ্ট খরচ দেড় পেনী ; বাস ভাড়া ৪ পেনীর কম কোথাও নেইই প্রায়। একটা সার্ট কাচতে হলে ১ শিলিং ৩ পেন্স ; চুল ছাঁটতে গেলে কমসে কম তিন শিলিং।

বিলিতী মুদ্রার সঙ্গে আমাদের মুদ্রার মোটামুটি সম্পর্কটা অনেকেই জানেন, তবু জানাই, হিসেব করবার সুবিধে হবে। এক পেনী মানে প্রায় এক আনা, এক শিলিং মানে প্রায় বারো আনা আর ১ শিলিং ৬ পেন্স হচ্চে একটাকার সমান। এখন একটু মাথা ঘামালেই মনে হবে—বেশ আছি, এই দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি।

সন্ধ্যাবেলায় তেলের বোতল আর মশলার প্যাকেট হাতে নিয়ে ঢুকলাম ডেরায়। মিসেস ল্যাফোরকেডের হাতে সব তুলে দিয়ে গম্ভীর হ'য়ে বললাম: অয়ি আর্যে, অবদান করো। ষ্টোভে প্যান চাপিয়ে, এই যে দেখচো সোনালী রংয়ের তেল, তার তু চামচ প্যানে দিয়েই স'রে দাঁড়াবে ; একটু পরেই চড়বড় করা কমবে যখন, তখন তাতে তোমার ইচ্ছামত আলু, কপি, টমেটো কেটে

একটু ভেজে নেবে। তারপর?—একটু ভেবে নিতে হ'লো মশলার ভাগটা এবং একটু ঢোঁক গিলে নিজের মতলব মতই বললাম: তারপর আধ চামচে হলদে রংয়ের গুঁড়ো, আধ চামচে লাল রংয়ের গুঁড়ো আর আধ চামচে বাদামী রংয়ের গুঁড়ো আর কিছুটা নুন দিয়ে খানিকক্ষণ বড় চামচে দিয়ে নেড়ে সামান্য জল ঢেলে দিয়ো। তারপর—

আরো বলতে যাচ্ছিলাম, থামিয়ে দিলেন মিসেস: ও মিঃ গস। তোমার এত লম্বা ইনস্‌ট্রাকসন আমার মনে থাকবে না, দাঁড়াও লিখে নিই।

তাই লেখো। ভদ্রমহিলা কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলেন, আমি আবার বলে গেলাম।

এবং তার পরদিন সন্ধ্যায় খেতে বসে দেখি এক চমৎকার (যেমন পিকনিকে যা-তা ক'রে রান্নাও চমৎকার লাগে) এক দো-আঁশলা তরকারি। সে সন্ধ্যায় ডিনারে দু'চামচ ভাত বেশিই খেলাম।

মিসেস ল্যাফোরকেড মুচকে হেসে বললেন: কী, ঠিক মত হয়েচে রান্না?

বললাম: অদ্ভুত হয়েচে।

কিন্তু দু'দিন পরেই দেখি মিসেস ল্যাফোরকেডের মুখখানি কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে গেছে।

বললেন: মিঃ গস।

বললাম: কি?

বললেন: তুমি যে ইয়েলো পাউডার এনে দিয়েচো, তা যে প্লেট থেকে তোলা যায় না সহজে?

তাই নাকি? তাড়াতাড়ি বললাম: তা'লে আর ইয়েলো পাউডারটা দিয়ে দরকার নেই। তোমার অসুবিধে হবে।

না না তা কি হয়? ভদ্র মহিলা লজ্জা পেলেন: তোমার খাওয়ার কষ্ট হবে যে।

আমি বলছিলাম কি, ঐ রংটা সহজে তোলা যায় কি ক'রে? তোমাদের দেশে কি ক রে তোলে মেয়েরা, জানো?

খুব জানি। মনে মনেই বললাম: কিন্তু তুমি তো তা পারবে না ইংলণ্ড-নন্দিনী। কলতলায় উবু হ'য়ে বসে ছাই আর শালপাতা নিয়ে বসতে হবে।

একটু. 'কিন্তু' হ'য়েই বললাম : সাবানের সঙ্গে একটু সোডা ব্যবহার ক'রে দেখো, হয়তো উঠে যাবে দাগ।

মনে আছে, সেদিনের ডিনারে ভাত-তরকারি মুখে তুলতে তুলতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ছিলাম।

তবে তবিবৎ ক'রে তরকারি খাওয়ারও যে বিপদ আছে, তা আগে বুঝিনি। বুঝলাম একদিন বর্ষা মুখর দিনে।

সেদিন লণ্ডনী আকাশ চুইয়ে ঝিম ঝিম বৃষ্টি পড়চে। শরীরটা বেশ ঝিমিয়ে এলো জলো আলসেমিতে। জানলার কাঁচে এসে লাগচে বৃষ্টির ছোঁয়া। দূরে পার্লামেণ্ট বা বিগবেনের চুড়ো ম্লান। এদিনে ওসব শাসন আর সময়ের চোখ রাঙানো ভাল লাগে না। বাইরে দুরন্ত ঠাণ্ডা হাওয়া, কিন্তু ঘরটা গ্যাস-হিটারে গরমা গরম। এমন ঘন ঘোর বরষায়, বিছানা-লেপ ছেড়ে যাওয়া যায়? কাজেই দুপুরের হাতের কাজ ফেলে একখানা সচিত্র 'পোষ্ট' ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে সুড়ুৎ ক'রে ঢোকা গেল সাটিনের লেপের তলায়।

কিন্তু কে জানতো, বঙ্গ ছেড়ে এলাম বটে ইঙ্গে, 'কপাল' কিন্তু এসেচে মোর সঙ্গে। কানে এলো, দরজায় ঠুক ঠুক শব্দ।

লেপ ছেড়ে উঠতে হ'লো। কে?

দরজাটা ঈষৎ ফাঁক ক'রে দেখি, মম ল্যাণ্ডলেডি।

কী ব্যাপার?

ভেরি সরি মিঃ গস, তোমাকে অসময়ে বিরক্ত করতে হলো।

বিরক্তই হয়েছিলাম, তবু মুখে হাসি-হাসি ভাব এনে বললাম : ছাটস্ অ'রাইট। বলো, আমি কী করতে পারি?

মানে, আই মীন, মিসেস বললেন : তোমার ঐ মাষ্টার্ড অয়েল একদম ফুরিয়ে গেছে। আজ না পেলে ডিনারের কারি করাই মুস্কিল হবে।

হা ঈশ্বর! এখানেও সেই সরষের তেল বাড়ন্ত। সাত সাগরের পারে রান্নাঘরে দরজার কাছে দাঁড়ানো গৃহিনীর তেলা মুখখানি ভেসে উঠলো মনে : আজ কিন্তু তেল না হ'লে রান্না হবে না। হায় নারী! তোমাদের স্কার্ট আর শাড়ি একই। কিন্তু পুরুষের কাছে বিদেশ আর বাড়িও কি এক?

বললাম : কিন্তু এই বৃষ্টি !

উত্তরে স্রেফ বললেন : আমার হাজব্যাণ্ডের ম্যাকিনটসটা দেবো ?

শুনে মেজাজ বিগড়ে গেল। কিন্তু অসীম ধৈর্যের রাশ টেনে বিগড়ানো মেজাজকে বাগে এনে বললাম : থ্যাংকস্ ম্যাম, ম্যাকিনটস তো আমারও আছে ! কিন্তু...

আরো বলতে যেতেই বাধা দিলেন ভদ্রমহিলা : আ মিঃ গস। প্লীজ। নইলে ডিনারে তোমার বড় কষ্ট হবে !

বুঝলাম, সদা-বৃষ্টির দেশের এই বীরাঙ্গনা বৃষ্টি দেখে ভয় পাবার মেয়ে নয়। কাজেই বললাম : বেশ, পাবে তুমি তেল, বিকেল বেলায় !

আশ্বাস পেয়ে চলে গেলেন মিসেস ল্যাফোরকেড।

আমি লেপটার দিকে চেয়ে একটা দেড়গজি নিঃশ্বাস ছেড়ে, ধড়াচুড়ো প'রে নিলাম। পরলাম আমার ম্যাকিনটসটা। বেরুলাম পথে।

শুনেচি, তেলে-জলে বাঙ্গালী। কাজেই এই বাঙ্গালী ভদ্রলোক জল মাথায় ক'রে বেরুলেন তেল আনতে।

একে অত্যাচার বলো ? হয়তো। তবে স্নেহের অত্যাচার ! আমারই ভালোর জন্যে আমাকেই কষ্ট দেওয়া ! আমার খেতে কষ্ট হবে, তার চাইতে একটু কষ্ট ক'রে...। আমার খাওয়ার উপর মহিলার উপর তীব্র লক্ষ্য, পরা-র উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি !

নইলে আর একদিন দিব্যি সেজে গুজে বেরুচ্ছি, গায়ে ওভার কোট, পেছন থেকে ডাক পড়লো : জাস'এ মিনিট মিঃ গস !

কেন, কী হ'লো ?

আই'ম কামিং জাস' নাও ! ব'লেই মিসেস ল্যাফরকেড ছুটে গেলেন নিজের ঘরে।

হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি, দেখি হাতে একটা কাঁচি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ব্যাপার কি ?

দাঁড়াও, এক্ষুনি দেখাচ্ছি। ব'লেই আমার পেছনে উবু হ'য়ে বসে কী

যেন কেটে নিয়ে আমার সামনে ধরলেন। দেখি একটুকরো কালো কাপড়ের ফালি।

বললেন : ওভারকোটের লাইনিংয়ের কাপড় ঝুলছিল। বিশ্রী দেখাচ্ছিল। কেটে দিলাম।

হেসে বললাম : থ্যাংকস্।

বললেন : ঘুরে এসে ওভারকোটটা খুলে দিয়ো, সেলাই ক'রে দেবো।

বললাম : তাই দিয়ো। এটি আমার বড় প্রিয় জিনিষ। বাবা কিনেছিলেন জাপান থেকে।

আর একদিন বললাম : মিসেস ল্যাফোরকেড, আমার এ ঘরের হিটার থেকে টেবিল-চেয়ারটা অনেক দূরে। কাজেই চেয়ারে ব'সে লেখা যায় না, ঠাণ্ডায় জমে যেতে হয়। তাই ঠিক করেছি সোফাটাকে হীটারের কাছে টেনে নিয়ে লিখবো।

বললেন : বেশ তো। তোমার যাতে সুবিধে হয় করো।

কিন্তু ভাবছি, কিসের উপর রেখে লিখবো।

তাই তো। মিসেস গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

মতলব ঠিক করাই ছিল। সোফায় ব'সে দেশে যে ব্যবস্থায় লিখতাম, তাই বললাম ল্যাণ্ডলেডিকে : মাম্, তুমি যদি আমাকে একটা তিন ফুটি তক্তা এনে দাও, তবেই সব সমস্যার সমাধান হয়।

তক্তা!

হ্যাঁ গো তক্তা। এই এমনি ক'রে বসে, হাতলের উপর তক্তা রেখে খচ্ খচ্ করে লিখে যাবো।

সোফায় ব'সে হাতে-কলমে লেখার উপায়টা বাৎলে দিলাম। শুনে ভদ্রমহিলা খুব খুশি। শুধু তাই নয়, প্রশংসায় পঞ্চমুখ : আ মিঃ গস। অদ্ভুত তোমার ব্রেন, অদ্ভুত তোমার পলিসি। আই অ্যাডমায়ার ইউ।

আমি বিজ্ঞের হাসি হেসে ভাব দেখালাম, এ আর কতটুকু ব্রেন দেখলে মিসেস? এ ঘট বুদ্ধিতে ঠাসা।

আমি দেখছি প্ল্যাঙ্ক পাই কিনা। মিসেস গেলেন তক্তা আনতে।

কিন্তু আমি ভাবতে লাগলাম, এরা এতটুকুতে এত প্রশংসা করে কেন? হয়তো মৌখিক। ক্ষতি কি? অন্তরের? তবে তো অভিভূত হবার কথা। লেখার এ ব্যবস্থা তো আমার দেশেও ছিল, কৈ এমন ক'রে তো সমর্থন পাইনি কোনদিন? আমরা নিন্দে করি, নিন্দেই শুনি। প্রশংসা করতে জানিনে, তাই পাইওনে। নিন্দে করা সোজা, প্রশংসা করা বড় শক্ত।

মিসেস আনলেন তক্তা। শুধু তক্তা নয়, একটুকরো চমৎকার ডিজাইনের অয়েল ক্লথ, কতকগুলো পেতলের পিন আর ছোট্ট একটা হাতুড়ি। সব যেন, যাদুবলে নিয়ে এলেন।

বললেন: এই যে সব এনেচি তোমার জন্যে। দাঁড়াও, সব ঠিক করে দিচ্ছি।

তাড়াতাড়ি বললাম: অশেষ ধন্যবাদ মিসেস ল্যাফরকেড। তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমি সব ক'রে নেবো'খন।

না, না। মিসেস বাধা দিলেন: আমি যা ক'রে দেবো, আশাকরি তোমার তাতে কোন অসুবিধে হবে না।

মনে মনেই বলতে হ'লো, তাই করো দেবি। জানি তো, দেবীবা যখন গোঁ ধরেন, তখন সারা গাঁয়ের লোক এসে বো'ঝালেও তাঁরা বোঝেন না।

মিসেস তক্তাটাকে অয়েল ক্লথ দিয়ে মুড়ে নিজে মেঝেয় কার্পেটে হাঁটু গেড়ে ব'সে পিন ঠুকতে লাগলেন হাতুড়ি দিয়ে। আমি হাজার হোক পুরুষ মানুষ তো। হাত-পা গুটিয়ে অবলার পুরুষালি কাজ দেখে চক্ষু মুদে থাকি কি ক'রে? কাজেই অয়েল ক্লথটাকে টেনে টুনে ধরালাম।

ও হরি। কাজ শেষ হ'য়ে যাবার পর ঐ একটু ধরাবার জন্যে মিসেসই দেখি দিলেন আমায় ধন্যবাদ।

আমি তাড়াতাড়ি ফেরৎ দিলাম: থ্যাংক ইউ মিসেস ল্যাফরকেড।।

আর প্রশংসায় আমিও বা কম যাই কেন? তাছাড়া এদেশে এসে একটু শিক্ষাও তো হয়েচে। অতএব দশমুখে প্রশংসা করলাম: এ যা হয়েচে অপূর্ব অদ্ভুত চমৎকার।

সত্যিই ভালো হয়েছিল এবং শেষদিন পর্যন্ত ঐটিই ব্যবহার করেচি।

এই ধন্যবাদ দেওয়া, এজাতের এক মজ্জাগত অভ্যাস। আমাদের ইষ্টমন্ত্র জপের মত। ভোরে চোখ মেলা থেকে রাতে চোখ বোজা পর্যন্ত যে লোক দিনে অন্তত পাঁচশোবার 'থ্যাংকু' না বলে, সে বোধহয় ইংরেজই নয়।

থ্যাংকস দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত, কিন্তু বাড়াবাড়ি শ্রুতিকটু। বাসে কণ্ডাক্টর আর কণ্ডাকট্রেসদের তো 'থ্যাংকু-থ্যাংকু' করতে করতে মুখের ফেকো উড়তে থাকে। তবু একদিন কাগজে দেখলাম, এক পত্রলেখক সম্পাদকের নিকট পত্র দিয়েছেন, আজকাল অনেক বাস কণ্ডাক্টর বা কণ্ডাকট্রেস টিকিট দেবার সময় থ্যাংকস দেওয়াও দরকার মনে করে না। যাত্রীরা কি এটুকু ভদ্রতা আশা করতে পারে না?

আবার আর একদিন ঐ এক কাগজে দেখলাম, এক পত্র লেখক লিখেছেন, আজকাল বাসে অনেক প্যাসেঞ্জারকে বলতে শুনি, একখানা পিকাডিলি বা দু'খানা হাইড পার্ক কর্ণার। কেন, তাঁরা কি একটু ভদ্রতা ক'রে 'প্লীজ' কথাটা যোগ করতে পারেন না?

এদেশে ভদ্রতার পান থেকে চুন খসবার কোন উপায় নেই। তাই ইংরেজের ভদ্রতা আজো জগদ্বিখ্যাত।

ইংরেজের পথ-ভদ্রতাও অদ্ভুত। ভোলবার নয়। ঘটনাটা বলি:

পাড়ারই এক রাস্তা। ট্রাফিক লাইট বা পুলিশ নেই, অথচ মোটরের যাতায়াত বেশ। পথ পার হ'তে হবে, কাজেই সাদা দাগের মুখে দাঁড়িয়ে আছি একলাই। দূরে একখানা মোটর আসচে। ভাবচি, ওটি বেরিয়ে গেলেই পার হবো। হঠাৎ দেখি মোটরখানা সাদা দাগের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। দাঁড়িয়ে গেল কেন? কাজেই নজর পড়লো ভিতরে ড্রাইভারের দিকে। দেখি, ভদ্রলোক আমাকে ভিতর থেকে ইশারা করচেন, রাস্তা পার হ'তে।

আশ্চর্য! আমরা তো জানি মোটর বেরিয়ে যাবে সাঁ সাঁ ক'রে, রাস্তায় জল জমা থাকলে ছ্যাড়-ছ্যাড় ক'রে জল ছিটিয়ে দিয়ে—তা নয়, মোটর থামিয়ে আমাকে বলচে রাস্তা পার হ'তে। কোন বদ মতলব নেই তো!

যাক, হকচকিয়ে তাড়াতাড়ি পার হ'য়ে গেলাম রাস্তাটা। এবং থ্যাংকস পেয়ে পেয়ে অভ্যস্ত হওয়ায় পার হবার সময় হাতটা একটু তুলে থ্যাংকস

জানাতেও ভুল হ'লো না।

মোটরটা চ'লে গেল। রাস্তার ওপারে গিয়ে ভাবতে লাগলাম, এ আবার কেমন হ'লো!

হ্যাগো মিসেস, এ আবার কেমনতর ব্যাপার? বাড়ি এসে ল্যাণ্ড-লেডিকে সবটা ব'লে উত্তরের জন্যে তাঁর মুখ চেয়ে রইলাম।

মিসেস হাসলেন। বললেন মিঃ গস, তুমি কোন কাজে হেঁটে যাচ্ছিলে, আর সে ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন মোটরে। কাজেই রাস্তা পার হবার জন্যে তুমি যদি আটকে থাকো, তবে তো তোমার যেতে দেরি হ'য়ে যাবে; আর ও ভদ্রলোকের মোটর আছে, কাজেই তাঁর কাজের জায়গায় যেতে আর কতক্ষণ। তাই তোমার প্রেফারেন্সই আগে। তোমাকে তাই পথ ছেড়ে দিয়েচেন।

আমাদেরই একটা কবিতা আছে না? বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে।

লণ্ডনে সিনেমা দেখো আর নাই দেখো, থিয়েটার না দেখলে জাত যাবে কিন্তু। আমাদের দেশে থিয়েটারের নাম শুনলে নাক কোঁচকাই, ইংলণ্ডে থিয়েটার দেখোনি শুনলে কপাল কোঁচকায় লোকে। ইংরেজ জানে, জাতির সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের প্রকাশ রঙ্গমঞ্চে, রূপোলি পর্দায় নয়। তাই খাস লণ্ডনেই চল্লিশটির বেশি থিয়েটার এবং সবগুলির বাতিই দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে, টিমটিম করে নয়। তার ভিতর কতকগুলির তো জগৎজোড়া নাম। যথা: ওল্ডভিক, ড্রুরিলেন, গ্যারিক, হে-মার্কেট, স্যাডলার্স ওয়েলস্ ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে শেকসপীয়ারের নাটকগুলিতে ওল্ডভিক-এর একচেটিয়া অধিকার। গরম কালে শেকসপীয়ারের দেশ ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-এভনে থিয়েটার-হলে হয় মহাকবির নাটকগুলি আর সেই অভিনয় দেখতে দূর দূর থেকে ইংরেজ ছোটে ঐ ছোট্ট সহরটিতে। থিয়েটার দেখে রাত্রে ফেরবার উপায় থাকে না, তাই ওখানেই হোটেলে রাত কাটাতে হয়। তবু বহু পুরোন এক নাট্যকারের বহুপুরোন নাটকগুলি অভিনয় দেখতে আজকের ইংরেজের একটুও ক্লান্তি নেই। আবার ঐ শেকসপীরিয়ান দল শীতে লণ্ডনের ওল্ড ভিকএ এসে যখন পাদপ্রদীপের

সামনে দাঁড়ায়, তখন তাদের অভিনয় দেখতে বাইরে কিউ করে দাঁড়ায় লণ্ডনাররা। সারা স্কুল উজাড় করে ছেলেমেয়েরাও আসে শেকসপীয়ারের নাটক দেখতে। শেকসপীয়ারের গল্প পড়েচে, নাটক পড়েচে আর নাটক দেখবে না ?

আমরাও প্রফুল্ল, বিল্বমঙ্গল, নীলদর্পণ, মেবার পতন এবং আরো অনেক নাটকের গল্প জানি, পড়েচিও, কিন্তু সেগুলি কোন থিয়েটারে যদি মঞ্চস্থ হয় কোনদিন, তবে হয়তো তার ধার দিয়েও যাবো না। আর এ্যামেচার ক্লাবরা যদি সৎসাহস দেখিয়ে পুরোন নাটকগুলিকে মঞ্চস্থ করে ? করুক। চাঁদা চাইবে ? তাড়িয়ে দেবো। আর বই পেলে না ? নিমন্ত্রন চিঠি দেবে ? যাবো না। গাড়ি পাঠালেও না। দূর, ঐসব বাপ-ঠাকুর্দা-কেলে নাটক একালে চলে ? আমরা না নতুনের সন্ধানে চলেচি। ভুলে যাই, আগামী পুরুষরাও কিন্তু আমাদের ধামা-চাপা দিয়ে আরো নতুনের সন্ধানে চলবে। আসলে আমরা পুরোনকে মনে রাখিনে, ভস্মাৎ করি, নস্যাৎ করি। ওরা পুরোনকে সমাধিস্থ করে, ফুল দেয়, ফল পায়।

ওল্ড-ভিক-এ 'টেমিং অব দি শ্রু' দেখলাম, আর একদিন দেখলাম 'ম্যাকবেথ'। ম্যাকবেথ করলেন পল রজার্স আর লেডি ম্যাকবেথ, এ্যান টড। সাবলীল অভিনয়, প্রানবন্ত। দেখে মনে হয় না, অভিনয় দেখচি। চলন বলন যারপরনেই স্বাভাবিক। পর্দা তোলা থেকে পর্দা ফেলা পর্যন্ত তর তর ক'রে এগিয়ে চলেচে ঘটনাস্রোত, কোথাও হোঁচট খেতে হয় না। দৃশ্যপট নিখুঁত। লণ্ডনের এক থিয়েটার হলে থ্রি-সিক্সের চেয়ারে বসে আছি মনেই হয় না, চলে যেতে হয় সেই সে যুগের এক রোমাঞ্চকর রাজ্যে। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মঞ্চের চারদিক থেকে আসা-যাওয়া করচে, অর্থাৎ দর্শকদের সামনের সিঁড়ি দিয়েও উঠচে মঞ্চে দরকার মত। দর্শকে আর অভিনেতায় মিশে গিয়ে একাকার।

লণ্ডনের হাতিবাগান হচ্চে লিচেষ্টার স্কোয়ার। সিনেমা-থিয়েটার পাড়া। অবশ্য ওল্ড-ভিক একটু দূরে, ওয়াটারলু ষ্টেশনের কাছে। কিন্তু আর সব থিয়েটার সিনেমা-ই লিচেষ্টার স্কোয়ারের চারধারে এবং পিকাডিলি, হে মার্কেট চ্যারিংক্রশের গা ঘেঁসে। লিচেষ্টার স্কোয়ারের মাঝখানে শেকসপীয়ারের প্রতিমূর্তি। ইংরেজের নাটক-জনক। দেখলাম এপোলো-তে হচ্চে বোথ এণ্ডস্ মীট, ফোনিক্স-এ বেল, বুক এণ্ড দি ক্যাণ্ডল, অল্ড্‌উইচ-এ ডার্ক ইজ লাইট

নাফ, হে মার্কেট-এ ম্যাচ মেকার, লিরিক-এ ইবসেনের হেডা গ্যাবলার, প্রিন্স অব ওয়েলস্-এ জাপানী ব্যালে, উইণ্ডমিল-এ অর্দ্ধনগ্ন নৃত্য, গ্যারিক-এ রিলেসন্স আর বেষ্ট এপার্ট।

রিলেসন্স আর বেষ্ট এপার্ট! আত্মীয়রা দূরে থাকলেই ভালো। এ তো আমাদের দেশের কথাই। তবে কি, এদেশের কথাও? কদিন আগেই প্রিন্স অব ওয়েলস্-এ জাপানী ব্যালে দেখেছি, খুব ভাল লাগে নি। তবে ইংরেজ হয়তো নতুন কিছু পেয়েছে, তাই ভীড় করতে ভোলেনি তারা।

প্যারিতে অর্দ্ধ নগ্ন কেন, বলতে গেলে পূর্ণ নগ্ন নৃত্য দেখেছি ক্যাসিনো ছ প্যারি এবং ফলিস বার্জায়ারে মাত্র চার-পাঁচশ ফ্রাঁতে, মানে, আমাদের পাঁচ ছ'টাকার টিকিটে। কাজেই লণ্ডনের উইণ্ডমিলে প্রায় ঐ ধরণেরই জঘন্য-সুন্দর নাচ দেখবার স্পৃহা বা দ্বিগুণ পয়সা খরচ করবার ইচ্ছা, কোনটাই ছিল না। পশ্চিমী নারীর প্রকাশ্যে প্রায় পূর্ণ নগ্নরূপ দেখে এইটুকুই বুঝেচি, ওদের আর কিছুই দেবার নেই। রিক্তা! সব ফুরিয়ে দিয়ে এখন গালে হাত দিয়ে ভাবচে, কি করি? পুরুষকে ভোলাই কি দিয়ে? গুরু ঊরুদেশ দেখিয়ে পুরুষের আক্কেল গুড়ুম করা আর যায় না সহজে, বক্ষ উঁচিয়েও তাদের লক্ষ্য ভেদ করা শক্ত, ভাবি নিতম্বেও আর হতভম্ব হয় না পুরুষরা। মদনদেবের দেওয়া সব ক'টি তীরই হাতছাড়া ক'রে কেমন খাপছাড়া হয়ে গেছেন ঠাকরুনরা। তাই বোধকরি তাঁরা পুরুষ ভোলানো ছেড়ে, পুরুষের ভোল্ ধরতে শুরু করেচেন। কাজেই চুল কাটেন ছোট ক'রে, পরনে থাকে স্ল্যাকস্ বা ফুলপ্যাণ্ট, গায়ে দেন আঁটসাঁট সোয়েটার। হাঁটেন গটমট ক'রে, তাকান কটমট ক'রে, হাত চালান ফটফট ক'রে—আর সব তাতেই ছটফটানি। সব দেখেশুনে এইটুকু তত্ত্বই সত্য বলে মনে হ'ল যে, সাজসজ্জাতে মেয়েদের মাধুর্য ঢাকা পড়ে না, বরং ফুটে ওঠে, মেয়েরা রহস্যময়ী হ'য়ে ওঠেন আর মেয়েরা যদি মেয়ে হয়েই থাকেন, তবে মানায় ভালো। ভালো লাগে। সজ্জা আর লজ্জা নারীর দেহ-মনের ভূষণ। ফ্যাশানে মেয়ে লোভনীয়, কিন্তু নববধূ মধুর!

গ্যারিক-এ ম্যাটিনী শোতে গেলাম 'রিলেসন্স আর বেষ্ট এপার্ট' দেখতে। একটু আগেই গেছলাম। শুধু থিয়েটার দেখা নয় তো, থিয়েটার হলের ভিতরটাও দেখা দরকার। বহুদিনের থিয়েটার। দেওয়ালের বালি ঝরার কথা, চেয়ারগুলো ভেঙে পড়ার কথা, পর্দাটায় তালি থাকার কথা, আর মেঝেয়

নিয়মিত চিনেবাদামের খোসা বা চকোলেটের কাগজ ছড়িয়ে থাকার কথা। কিন্তু সে সব কিছুই এই পোড়া চোখে পড়লো না। দেখলাম পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম হলখানি। বসবার চেয়ারগুলি অক্ষত। মেঝে পরিস্কার। দেওয়ালগুলি অকলংকিত। মঞ্চপদা অম্লান। ভিতরে হকারের হৈ-হৈ নেই। দর্শকের পদপঙ্ক নেই। চারিদিকে নিস্তব্ধ।

এক-এক করে দর্শকরা ঢুকচেন, গাইডরা নিঃশব্দে দেখিয়ে দিচ্চে তাঁদের জায়গা। টফি চকোলেটের ট্রে কোমরে ঝুলিয়ে অতি সন্তর্পণে ঘোরাফেরা করচে মেয়ে হকাররা।

আমার পাশের চেয়ারে এসে বসলো একটি তরুণী। সুবেশা। সুন্দরী। হাতে তার একটি প্রোগ্রাম। মেয়েটি প্রোগ্রাম পেলো কোথায়? হলে তো বিক্রী হচ্চে না! অথচ একখানা দরকার। কে কি অভিনয় করচে, এবং গল্পের সারাংশটাও তো একটু পড়ে নেওয়া দরকার। অথচ 'দেখি একবার' ব'লে ছোঁ মেরে নেওয়াও তো অভদ্রতা, অন্ততঃ এদেশে। তা না হ'লে তরুণীটির মাথায় হাত বুলিয়ে ফোকট্‌সে প্রোগ্রামটায় চোখ বুলিয়ে আবার ফেরৎ দেওয়া যেতো। অথচ মেয়েটি পড়চেও না। চাইবো? দূর! কেমন যেন লজ্জা করে!

মেয়েটির দিকে একটু হেসে মৃদুস্বরে জিগ্যেস করলাম: এক্সকিউস মি, তোমার ঐ প্রোগ্রাম কোথায় পেলে?

হেসে মধুরকণ্ঠে বললো: হলের বাইরে বিক্রী হচ্চে।

তবু একবার মুখ ফুটে বললে না গা, এই নাও দ্যাখো?

থাকগে, চাইনে তোমার প্রোগ্রাম! ভারি তো! উঠলাম। বললাম, নিয়ে আসি একখানা।

বাইরে গিয়ে চার পেনি দিয়ে কিনে আনলাম একখানা প্রোগ্রাম। আটপাতার প্রোগ্রাম, মুখটা আঠা দিয়ে সাঁটা। আমাদের দেশে মুখ-আঁটা যৌন-বই যেন। না জানি, কী মহামূল্য বৃত্তান্তই আছে!

সীটে ব'সে পরম আগ্রহে লেবেল-ছিঁড়ে প্রোগ্রামখানা খুলে দেখি, পাঁচ পাতা ভ'রে শুধু অন্যের বিজ্ঞাপন: কোথায় মদ, খাবার, জামা-পোষাক, চা-কেক পাওয়া যায় তারই হদিস আর অন্য থিয়েটারে কি-কি হচ্চে, তারই ফিরিস্তি। বাকি তিনটে পাতায় নাটকখানির লেখক ও কর্মকর্তাদের নাম, কুশীলবের নাম এবং দৃশ্য ক'টির উল্লেখ মাত্র। তাছাড়া এক ঝুড়ি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার। (থ্যাংকু-জাতের উপযুক্তই বটে।) যথা, অমুক কোম্পানী দৃশ্যপট এঁকেচে, অমুক কোম্পানী দিয়েচে ফার্ণিচার, অমুক কোম্পানী তৈরী করেচে পোষাক-আষাক, নাইলনের মোজাগুলি অমুক কোম্পানীর, পোষাকগুলো কাচা হয় অমুক সাবানে এবং অভিনয়ে সিগ্রেট ফোঁকা হয় অমুক মার্কার। অথচ এইসব কোম্পানীর সঙ্গে ফোকটের কারবার হয়নি কোথাও !!

শুধু তাই নয়, থিয়েটার হলটার আগাপাছতলা জেয়েস ফ্লুয়িড দিয়ে ডিসইনফেক্ট করা এবং ক্লোকরুমে অ্যাডভান্স লিনেন কোম্পানীর অটো-মেটিক তোয়ালে কল বসানো আছে—সে খবরও প্রোগ্রামে। আরো খবর এবং সেটা মোটা হরফে লেখা আছে : বাড়ি ফেরবার সময় মনে ক'রে যেন অপেরা গ্লাসটি থিয়েটারী কর্মচারীদের কাউকে ফেরৎ দেওয়া হয়। যাক্, এখানে এমনো হয় তা'হলে। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা গেল।

লেখা আছে, অভিনয়ের সময় ফটো তোলা নিষেধ। বা রে। আমরা তো কোনো ষ্টেজে তরুণী নৃত্য দেখলেই ঘেঁচাঘ্যাঁচ্ তার ছবি তুলে নিই। কৈ, কেউ তো বারণ করে না? এদের একটু বেশি বাড়াবাড়ি। কর্তৃপক্ষ নাকি দরকার হ'লে কোন এক চরিত্র অন্য কাউকে দিয়ে অভিনয় করাতে পারেন। তাও আবার জানানো? আমরা তো জানি, চারিদিক গোলমালের জন্যে অভিনয়ের কথা পর্যন্ত গোলমেলে বললেও, কাউকে ধরবার উপায় নেই।

এবং শেষটায় লর্ড চেম্বারলেনের রঙ্গমঞ্চ-হুকুমনামা : (১) অভিনয়ের শেষে বাইরের যাবার পথ অবশ্যই খোলা রাখতে হবে, (২) প্যাসেজে বাড়তি চেয়ার সাজানো চলবে না, (৩) প্যাসেজে দাঁড়ানো বা বসা চলবে না, (৪) প্রত্যেক অভিনয়ের পরই সেফটি-কার্টেন উঠাতে এবং নামাতে হবে।

অর্থাৎ সর্বত্র সুশৃঙ্খলার শৃঙ্খল। প্রোগ্রামখানায় শুধু বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন, বিশেষ দ্রষ্টব্য, ঘোষণা, হুকুমনামা ইত্যাদিতেই কণ্টকিত। মনে হ'লো চার পেনি যেন পকেট মেরে নিয়েচে।

বলি হ্যাঁগা মেয়ে, তোমাদের প্রোগ্রামে নাটকের গপ্পো থাকে না?

বললো মেয়েটি : গল্প তো একটু পরে ষ্টেজেই দেখতে পাবে। আগে থেকে জানা থাকলে ইনটারেষ্ট নষ্ট হয়ে যাবে না?

বললাম : আমাদের দেশে, মানে ইণ্ডিয়ায় কিন্তু প্রোগ্রামে খানিকটা গল্প

থাকে, আব নায়ক-নায়িকাব ছবিও!

তরুণী হাসলো ঃ জানি!

জানো মানে? অবাক হ'লাম।

আমি ইণ্ডিয়ায় ছিলাম কিনা কিছু দিন। আমাব ড্যাডিব সঙ্গে গেছলাম। ড্যাডি গেছলেন ইণ্ডিয়ায় একটা ফ্যাক্টরি ফিটিংসের ব্যাপারে। আচ্ছা, ক্যালকাট্টায় তোমাদের সেই ফারপো হোটেল আছে?

আছে!

কোথায় যেন সেটা? চ্যাউব্যাঙ্গিতে? না?

বললাম: চ্যাউব্যাঙ্গি নয়, চৌরঙ্গী!

তরুণী জিব উল্টে-পাল্টে বহুকষ্টে উচ্চারণ করলো ঃ চাউরাঙ্গী। ইজ ইট?

জানি, ঐ বিলিতী জিবেয় দিশী উচ্চারণ বেরুবে না। তাই অগত্যা বললাম ঃ ঠিক হ'য়েচে। কিন্তু একটা কথা বলি, তুমি যে দিব্যি আমার সঙ্গে গল্প করচো, অথচ ইনট্রোডিউসড্ হলাম না আমরা! এ কি রকম!

বা-রে! মেয়েটি বললো: সে বেড়া তো তুমিই ভাঙলে! অথচ আমাকেই—

হেসে বললাম ঃ যাকগে, রাগ করোনি তো?

বললো: রাগ করলে কথা বলতাম নাকি? মুখ ফিরিয়ে বসে থাকতাম! কিন্তু আমি জানি, তুমি বিদেশী, হয় তো আমাদেব নিয়ম জানো না, তাই—

বললাম, খুব জানি। এতটা দিন তোমাদের আওতায় থাকলাম, আর তোমাদের নিয়মকানুন জানিনে? তবে কি জানো, এখানে আমাকে কে তোমার সঙ্গে ইনট্রোডিউস ক'রে দেবে বলো? আর সে আশায় থাকলে, স্রেফ বোবা হ'য়েই থাকতে হবে! কাজেই তোমাদের ভদ্রতা রাখতে পারলাম না ব'লে মনে কিছু ক'রো না।

না, না, মনে কিছু করিনি! বললো মেয়েটি।

যাক আশ্বস্ত হ'লাম। বললাম ঃ কিন্তু এখনো পর্যন্ত জানতে পারলাম না, কার সঙ্গে কথা বলচি!

বটে! মেয়েটি হাসলো: তোমার প্রশ্ন করবার ভঙ্গীটি তো বেশ ঘোরালো। আমার নাম মিস পলিনা রাসেল।

আমার নাম ঘোষ—কে, ঘোষ! এসেচি ব্যবসা আর বেড়াবার ব্যাপারে।

ক্যালকাটায় বাস।

আই লাইক ক্যালকাটা। নাইস সিটি! জানো আমি তোমাদের ইণ্ডিয়ান সুইটস্ খেয়েছি।

কী রকম?

ঐ যে হোয়াইট অ্যাণ্ড সফট্ পেষ্ট-লাইক। স্কোয়ার সাইজড্। সুইট এবং ডিলিসাস্। কী নাম মনে নেই।

সন্দেশ?

ইয়েস-ইয়েস, স্যাণ্ডেশ্। পলিনা রাসেল রসালো ঠোঁট দু'টি যেন সজল হ'য়ে উঠলো: রিয়েলি ভেরি টেষ্টফুল।

আমি আড়চোখে দেখে নিলাম, হলে ক্রমেই লোক ঢুকচে, ভীড় জমচে। তবে রক্ষে, কেউ আমাদের দিকে লক্ষ্য করচে না। অবশ্য কথা আমাদের যথাসম্ভব নীচু গলায় হচ্ছিল। স্বামী-স্ত্রীতে এক বিছানায় শুয়েও বোধকরি অত নীচু গলায় কথা বলে না। আশ্চর্য আমি কি ক'রে পারছিলাম আমার উঁচু গলাকে খাটো করতে, জানিনে।

রাসেল বললো: তোমাদের সেই গডেস কালি টেম্পলে তেমনি ভীড় হয়? গোট্ অ্যাণ্ড শীপ্ স্লটার হয়?

কেন হবে না? আমাদের ধর্মের অঙ্গ ওটি।

হরিব্‌ল কিন্তু।

যুদ্ধে নির্দোষী মানুষ মারা আরো হরিব্‌ল। নয় কি?

তা বটে।

সত্যি, তোমাদের ইণ্ডিয়া এখন রিয়েলি ট্রাইং ফর ওয়ার্লড-পীস্। তোমাদের নেহেরু ইজ এ গ্রেটম্যান, তোমাদের গ্যাণ্ডি ওয়াজ এ সুপার ম্যান—লাইক আওয়ার ক্রাইষ্ট।

আহা, কথাগুলো যেন কানে মধুবর্ষণ করছিল।

বললাম, আমাদের নেতাজীকে চেনো, সুভাষ চন্দ্র বোস্?

নাম শুনেচি। তরুণী বললো: লাষ্ট ওয়ারে হি ফট্ ফর ইণ্ডিয়া। ইজ হি ডেড অর এলাইভ?

তা জানিনে। তবে হি ইজ আওয়ার গ্রেট হিরো। আমরা ঘরে ঘরে তাকে পুজো করি—জাষ্ট লাইক গড।

হঠাৎ মেয়েটি মেয়েলি কথা পাড়লো: তোমাদের মেয়েরা কিন্তু চমৎকার

শাড়ি পরে। অত লম্বা কাপড় কেমন গুছিয়ে পরে, না? ওয়াণ্ডারফুল। আমি ইণ্ডিয়ায় থাকতে একটি ইণ্ডিয়ান গার্লের কাছে শিখেছিলাম, কিন্তু এখন ভুলে গেছি। আচ্ছা, ইণ্ডিয়ান মেয়েরা কী যেন 'চিউ'করে, চিবোয়, ঠোঁট লাল হ'য়ে যায়। না?

বললাম: হ্যাঁ। পান। এক রকম পাতা। হজমের পক্ষে উপকারী। ইণ্ডিয়ান লিপষ্টিক বলতে পারো।

বললো: অনেক মেয়েরা কিন্তু ঠোঁটও পেণ্ট করে আমাদের মতো দেখেছি।

বললাম: ঠিকই দেখেচো। তারা ফ্যাশানে তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়। নইলে আমাদের আদর্শ কি জানো? ঐ পানে রাঙানো ঠোঁট, লজ্জা-রাঙা গাল, কপালে সিঁদুর-টিপ, চোখে কাজল রেখা, মেঘবরণ চুল, আলতা-রাঙা পা, গলায় চন্দ্রহার, হাতে কাঁকনবালা।

অবশ্য যথাসম্ভব বুঝিয়ে দিলাম, কোনটা কি এবং কেমন। শুনে বললো পলিনা: আউটডোর কাজের জন্যে এব্যবস্থা কিন্তু স্যুটেবল্ নয়। তাই নয় কি?

হেসে বললাম: মেয়েরা কিন্তু ইনডোরের জন্যেই। আউটডোরে আজ যেতে হ'য়েচে বাধ্য হয়ে। তাই তার রূপ গেছে বদলে। আমাদের দেশেও। তাই আজ আমাদের দেশের মেয়েরাও স্মার্টলি ড্রেসড। চুল বব করে ছাঁটা, চোখে সুরমা, ঠোঁটে লিপষ্টিক, গালে রুজ, পায়ে জুতো, হাতে রিষ্টওয়াচ, কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ।

দেখেছি তাদের এই লণ্ডনেই।

হ্যাঁ, অনেক ইণ্ডিয়ান মেয়েই আসে এখানে হায়ার ষ্টাডিতে—

আরো বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হলের আলো নিবৃতে লাগলো এক-এক ক'রে। কাজেই কথা বন্ধ রাখতে হ'লো। শুরু হ'লো অভিনয়।

অভিনয় নয়তো, যেন বাস্তব ঘটনা চোখের উপর ঘটতে লাগলো। কোথাও আড়ষ্টতা নেই, অসংযম নেই। কথায় নাটুকে টান নেই, অভিনয়ে নাটুকে ভঙ্গী নেই। সহজ, সরল, সুন্দর—সাবলীল। তবে বিদেশী ভাষা তো? আর বিদেশী জিব আর তালুতে ধাক্কা খেয়ে যা আমার কানে এসে লাগতে লাগলো, তার সবটুকুই যে মগজে হজম করতে পারলাম, তা বললে স্রেফ বাহাদুরী করা হবে। এমনতর অবস্থা কলকাতায় বিদেশী ছবি দেখতে গিয়েও হয়েচে। ডায়ালগে কোন সূক্ষ্ম রসের কথা শুনে বিদেশীরা

হো-হো ক'রে হেসে উঠেছে, আমি পারিনি ; কিন্তু আমার দেশী ভাই-দাদারা হয়তো বুঝেই কিংবা ওদের হাসি শুনেই হে-হে করে হেসেছে। পরের ভাষা পড়ে বোঝা সহজ, শুনে বোঝা শক্ত—এই সহজ কথাটুকু লজ্জা'র ভয়ে অনেকে বুঝেও বোঝে না।

মনটা সামনে রঙ্গমঞ্চের দিকেই ছিল। এমন কি পাশে বসা সুন্দরী সঙ্গিনীর দিকেও নয়। কারণ ছিল। ইস্তাম্বুল থেকে লণ্ডন পর্যন্ত ঘরে-বাইরে প্রায় ব্যাপারেই শ্রেফ মেয়েদের মিষ্টি হাসির মারফতেই সর্বকর্ম হাঁসিল ক'রে ক'রে মনটা কেমন যেন মেয়ে-প্রুফ হ'য়ে গেছলো। দূর থেকে মেয়েদের দেখলেই মন উন্মনা হওয়া, অথচ কাছে গেলে বুক ঢিপ ঢিপ করা ইত্যাদি দেশীয় হার্টের অসুখগুলি পশ্চিমী খোলা হাওয়ায় সেরেই গেছলো প্রায়। কিন্তু সেদিন সেই অন্ধকার হল ঘরে এক মিঠে ফিস্‌ফিসিনি শব্দে আমার হৃৎতন্ত্রী ফুস-ফুস সহসা ধড়াস ক'রে উঠলো, প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়। ফিস্‌ফিসিনি শব্দটা যদি নেহাৎ বিশুদ্ধ হ'তো, হয়তো অতটা ক্ষতিকর হ'তো না। কিন্তু তার সঙ্গে কিসের ভেজাল মেশানো, বুঝতে কষ্ট হ'ল না—'কিস'-এর। সেই সুমধুর প্রেম-শব্দের উৎপত্তি স্থল ঠিক আমার আর আমার বান্ধবীর চেয়ারের পেছনেই। সঙ্কুচিত হলাম, হয়তো বান্ধবীও। কিন্তু প্রেমিক যুগল নিঃসংকোচেই প্রেমাভিনয় চালাতে লাগলো। ঘাড় ফিরিয়ে দেখা অভদ্রতা, তাই ঘাড় সোজাই রাখলাম। চোখ দু'টো বাধ্য হয়েই প'ড়ে রইলো মঞ্চে, কিন্তু কান দু'টো নির্লজ্জের মতই যোগ দিল ওদের রঙ্গে। নাটকের গতির সঙ্গে আনমনা মন আর তাল রাখতে পারলো না, খেই হারিয়ে ফেললাম। মনে হ'লো সত্যিই বিলেসন্স আর বেষ্ট এপার্ট, অন্ততঃ দু'টি প্রেম-আত্মা যখন এক হ'যে একাকার। আর আশেপাশে থাকে যদি কেউ? থাক না। তাদের কাছে তখন 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব। কেবল আঁখি দিয়ে, আঁখির সুধা পিয়ে, হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব—আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

হলে হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো। হলটা হেসে উঠলো বেরসিকের মতো। ইণ্টারভ্যাল। ওদের প্রেম অভিনয়েরও।

আমি আড়চোখে দেখলাম ; পলিনা রাসেলের মুখ চোখ লাল। আমার দিকে তাকাতে পারচে না বেচারী। অন্যদিকে ফিরে আছে। আমিও কথা বলবার সুতোর মুখ হারিয়ে ফেলেচি যেন। ছুতোও পাচ্ছিনে

কিছু। এমন সময় কাছাকাছি এলো একটি চকোলেট মেয়ে। কিনলাম দু' প্যাকেট চকোলেট। পয়সা দেবার সময় যথা সম্ভব ভদ্রতা রেখে দেখে নিলাম প্রকাশ্য প্রেমিকযুগলকে। কৌতূহলের বড় জ্বালা। দেখলাম, নতুন কিছু নয়। সেই চিরাচরিত একটি তরুণ, একটি তরুণী। অতি স্বাভাবিক। তবে এদেশের পক্ষেও অসংযত। আমাদের দেশে? স্বপ্নাতীত।

তাই পলিনা ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, লজ্জিত। স্তব্ধ হ'য়ে আছে তাই।

মিস রাসেল?

পলিনা আমার দিকে ফিরে চাইলো।

বললাম হেসে: তোমাকে চকোলেট অফার করবার সৌভাগ্য হবে কি আমার?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!—হাসলো পলিনা: থ্যাংকু মিঃ গস্। চকোলেটটা নিয়ে তার মোড়ক খুলতে লাগলো: কেন আর এসব খরচ করতে গেলে?

হেসে বললাম; ইচ্ছে হ'লো। যাক্ নাটক কেমন দেখচো বলো।

ভালো। তুমি?

হেসে বললাম: ভালোই তো দেখছিলাম। কিন্তু—

পলিনা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে তাড়াতাড়ি বললো: আমি জানি তুমি কি বলবে। আমি জানি, তোমরা এসব দেখতে অভ্যস্ত নও। কিন্তু এখেনে এসব পথে ঘাটে।

বললাম: জানি। দেখেচি। অভ্যস্তও হ'য়ে গেচি। প্লীজ ডোন্ট ওয়ারি।

পলিনা বললো: ছাখো, এমনি ক'রেই আমাদের মেয়েদের স্বামী জোগাড় করতে হয়। উপায় নেই। তোমাদের দেশের মত, মেয়ের স্বামী খোঁজার ভার তার বাপ-মায়ের ঘাড়ে নেই। এখেনে মেয়েকেই খুঁজতে হয়, ঢুঁড়তে হয় সেই পরম পুরুষটিকে—যার আঙুলে আংটি পরিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে।

বললাম: একদিক দিয়ে ভালো কিন্তু। নিজের ঘর-বর নিজেই দেখে নিলো, লাভ-লোকসান তারই। মামী-ড্যাডির উপর কোন দোষ পড়ে না।

কিন্তু বিলিতী মেয়ে পলিনা বললো: আমার মনে হয়, তোমাদের দেশের সিস্টেমটাই ভাল। কারণ, যৌবনের রঙীন নেশায় মেয়েরা প্রায়ই

ভুল করে। চাঁদ ধরতে গিয়ে ফাঁদে পা দিয়ে বসে। শেষে কাঁদতে হয়।

আশ্চর্য, এসব কথা আমাদের বাপ-ঠাকুর্দারা জানতেন: আর জানতেন বলেই, মেয়ের সঙ্গে কোন পরামর্শ না ক'রে, নিজেরাই চেষ্টা চরিত্তির ক'রে একটি পছন্দমত ছেলে খুঁজে—পাঁজি-পুঁথি দেখে তার সঙ্গে মেয়েকে দিতেন সাত পাক ঘুরিয়ে। আর সে পাক এমনিই শক্ত হ'তো যে, সংসারের নানা দুর্বিপাকের মধ্যে প'ড়েও দাম্পত্য-বন্ধন শিথিল হ'তো না শেষ দিন পর্যন্ত। কিন্তু এ পশ্চিমী-মেয়ে পুবের কথা বলে কেন? বিতৃষ্ণা?

একটু পরেই হলের আলো নরম হ'য়ে এলো, নিভে গেলো।

শুরু হ'লো অভিনয়।

ফের শুরু হ'লো পেছনের প্রেমাভিনয়।

আমি সামনের অভিনয়ের দিকে মন দেবার চেষ্টা করলাম। পেছনের প্রেমাভিনয়ে আমার কোন লাভ নেই, সামনের অভিনয় না দেখলে টিকিটের দামটা খামাকা লোকসান।

অভিনয়ের শেষে পলিনা আর আমি বেরিয়ে এলাম হল থেকে। কাছেই লিচেষ্টার স্কোয়ার তখনো জমজমাট। সিনেমার সামনে নানা বয়সের মেয়ে পুরুষ কিউ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, সিনেমায় ঢোকবার আশায়। হাতে তাদের কাগজ কিংবা পত্রিকা। কেউ তো কারোর সঙ্গে ইনট্রো-ডিউসড্ নয়, অতএব 'হ্যাঁ দাদা' ব'লে গল্প জমানোর উপায় নেই। কাজেই নিজের মনে পড়া আর ফাঁক পেলেই এক-পা এক-পা ক'রে এগোনো। লোক যেমন-যেমন হল থেকে বেরুচ্চে, তেমনি-তেমনি ঢুকচে হলে কিউ-এর লোক।

এ এক মজা। তিনটে-ছ'টা-ন'টার কোন ব্যবস্থা নেই। দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত ছবিঘরে ছবি চলচে। পাঁচ মিনিট ইণ্টারভ্যালে দু'খানা ক'রে ছবি দেখানো হচ্চে—মানে, প্রায় দু' ঘণ্টার ব্যাপার। কিউ-এ গুটি-গুটি পা-পা ক'রে তুমি যখন হলে ঢুকলে, তখন হয়তো দেখলে, প্রথম ছবিখানার অর্দ্ধেকটা হ'য়ে গেচে। হোক্ না। তা' বলে মন খারাপ করবার কিসসু নেই। বাকী অর্দ্ধেকটুকু দেখে যাও, পাঁচ মিনিট বাদে দ্বিতীয় ছবিখানার সবটা দেখো, তারপর পাঁচ মিনিট বাদে প্রথম ছবিখানার প্রথম অংশটুকু (যা

তুমি দেখতে পাওনি) দেখো এবার এবং তাতেও যদি মনটা খুঁত খুঁত ক'রতে থাকে, বেশ তো, গ্যাঁট হ'য়ে বসে আবার না হয় একটানা দেখে নাও ঐ ছবির শেষ তক্। দ্বিতীয় ছবিখানাও ভালো লেগে গেছে? বেশ তো, আবার দেখো।

কিন্তু আবার দেখতে কি আর ইচ্ছে করবে? বোধহয় অতি বড় সিনেমা-পাগলেরও আর দেখতে ইচ্ছে করবে না। কেন, দেশে ম্যাটিনী শো দেখার পর, বাইরে একটু হাওয়া এবং রেষ্টুরেণ্টে কিছু খাওয়া সেরেও কি আবার অন্য হাউসের ইভিনিং শো-তে টিকিট কাটতে ইচ্ছে করে? আর এখানে তো, বন্ধ ঘরে, অন্ধকারে, একটানা দু'খানা বই দেখলে। তার উপর সিগ্রেট আর পাইপের ধোঁয়া যা আমাদের নাকে এখন অসহ্য। তা ছাড়া, তুমি ভদ্রলোক, ভদ্রতা জ্ঞান তোমার টনটনে —শুধু তাই নয়, কাজের মানুষ তুমি—কাজেই দু'খানা ছবি পুরো দেখবার পর তোমার সীটটা নিশ্চয়ই তুমি ছেড়ে দেবে, যাতে বাইরে কিউ এ দাঁড়ানো দর্শনার্থীরা দর্শনী দিয়ে হলে ঢুকতে পারে। তবে বোম্বাই ছবির চলতি গান গলায় তুলতে, আর চোখ-নাচানো 'তারকা'র হাসি ভুলতে না পেরে যারা বার পাঁচেক সাড়ে ছ' আনার টিকেট কাটে—ওঃ, তাদের কানে এ খবরটা গেলে নিশ্চয়ই ভাববে, স্লা, আমাদের দেশে এ নিয়মটা চালু হয় না মাইরি?

লিচেষ্টার স্কোয়ার থেকে পিকাডিলি সার্কাসে ঢোকবার মুখে লেয়ন্সের বড় রেষ্টুরেণ্টটা। পলিনাকে বললাম: চলো ঢুকি।

আবার কেন?

হেসে বললাম: এই অতিথি সৎকার।

পলিনা হাসলো: তা যদি বলো, তবে তো সে অধিকার আমারও আছে।

বললাম: কে বললে নেই? তবে কিনা, জানো বোধহয় আমাদের দেশে মেয়েদের জন্যে ছেলেরাই খরচ করে, মেয়েরা নয়।—রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে খাবারের টেবিলের কাছে যেতে যেতে তার কানে-কানে বললাম: আর যদি মনে করো, দু' পক্ষেরই খরচ করা উচিত, তবে আমার ডিসের দাম তুমি দিয়ো, তোমার ডিসের দাম দেবো আমি। কি বলো?

পলিনা হেসে ফেললো। বললো: ইউ নটি।

তবে মুখে যতই বলা যাক, তা ব'লে একটি মেয়েকে আমন্ত্রণ ক'রে

খাইয়ে তার কাছ থেকে পয়সা আদায় করা—অতি বড় পাষণ্ডও পারে না। অন্তত, চোখের পাতা যার আছে।

দাম চুকিয়ে ডিস হাতে দু'জনে একটা খালি টেবিলে এসে বসলাম। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে শুরু হ'লো গল্প। মেয়েদের পেটে কথা থাকে না—এই থিয়োরীর উপর নির্ভর ক'রে প্রশ্নের আঁকশি দিয়ে রাসেল-কন্যার কাছ থেকে যেসব খবর বার করা গেল, সংক্ষেপে তা হচ্চে এই :

অতি সাধারণ মেয়ে। ফিঞ্চলে রোডে থাকে। ইঞ্জিনীয়ার বাবা, যাঁর সঙ্গে ভারতে পাড়ি দিয়েছিল, মারা গেছেন। মা আছেন বেঁচে। আর ছোট ভাই। সম্প্রতি আর্মিতে ঢুকেচে। পলিনা সেক্রেটারীশিপ পাশ ক'রে একটা এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট অফিসে ষ্টেনো-টাইপিষ্টের কাজ করে। বিয়ে করেনি এখনো। এখন করবার ইচ্ছেও নেই। সংসার দেখবে কে? ডিক আরো কিছু দিন কাজ করুক, নিজের পায়ে দাঁড়াক, তবে তো! তা ছাড়া হাবে-ভাবে বোঝা গেল, মনের মানুষ এখনো খুঁজে পায়নি সে। একালের ছেলেদের সম্বন্ধে তার মন্তব্য : বেশির ভাগ ছেলেরাই প্রেমের জন্যে হাত বাড়ায়, বিয়ের জন্যে ঘাড় বাড়ায় না।

এক কথায়, পলিনার সব কথা শুনে মনে হ'লো, আমি যেন কলকাতার এসপ্ল্যানেডে অন্নপূর্ণা কাফেটেরিয়ায় একালের মেয়ে মিস পলি পল্ (গোপনে বলি, 'পাল'-এর বিলিতীরূপ)-এর মুখ থেকে শুনচি তার জীবন-বৃত্তান্ত। গড মেড্ মেয়েলি মন একই রকম, আর সাত-সাগরের এপার-ওপারের 'রাজপুত্তুর'রা একই ছাঁচে ঢালা।

অবশেষে এলো বিদায় বেলা। বিদায় নিলাম পলিনার কাছে। তার নরম হাতে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম : মিস রাসেল, সময়টা আমার ভালোই কাটলো।

ইংলণ্ড-কন্যা ভদ্রতায় কমতি যাবে কেন? সেও বললো : আমারও কাটলো ভালো।

ডাইনিং টেবিলে আমার কাছে সব শুনে ল্যাণ্ডলেডি হেসে বললেন : 'ডেট' করেচো একটা?

বললাম : না।

ফরাসী কর্তা চোখ তুললেন কপালে : সেকি ? এমন একটা 'চান্স' নষ্ট করলে ? বন্ধুত্ব করবার জন্যে এখেনে বিজ্ঞাপন দিতে হয়, বন্ধুত্বের জন্যে কত খরচ করতে হয়—আর তুমি অমন একটি মেয়ে-বন্ধু হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলে ? খুব আশ্চর্য তো।

কাব্যি ক'রে বললাম : পথ চলতে সামনে পড়লো ফুটন্ত এক গোলাপ। চোখ ভ'রে দেখলাম তার রূপ, বুক ভ'রে নিলাম তার গন্ধ, প্রাণ ভ'রে বললাম যেন, আ-আঃ। হ্যাঁ গো, গোলাপটাকে মুচড়ে ছিঁড়ে কোটের বটন-হোলে ভরলেই কি ভালো হতো।

শুনে মিসেস ল্যাফরকেড উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন : ও মিষ্টার গস্, জাষ্ট লাইক এ পোয়েট।

কিন্তু আমি এবার গম্ভীর ক'রে বললাম : আসল কথা কি জানো, হে ল্যাফরকেড দম্পতি। ঘর পোড়া গরু আমি, দিব্যি ছাড়া পেয়ে ঘুরচি, কিন্তু রাঙা মেঘ দেখলেই বুকটা কেমন ধড়াস ক'রে ওঠে।

কর্তা বললেন : তোমরা ইণ্ডিয়ানরা, সত্যি বড় মিষ্টিরিয়াস্।

ইংরেজ রমণী ঠাট্টা করলেন : নইলে মাই ডিয়ার, দেখলে না, ব্রিটিশের অমন বোমা-বন্দুকের তোয়াক্কাই করলে না ওরা ; স্রেফ 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' ব'লে ব'লেই ভাবত ছাড়া করলে।

তাঁর কথায় খাবার টেবিলে হাসির রোল উঠল।

মিঃ ল্যাফরকেড মিথ্যে বলেননি। বন্ধুত্ব করবার জন্যে অনেক রকমের বিজ্ঞাপন অনেক কাগজেই দেখেচি বটে। তবে সেগুলির মধ্যে বেশির ভাগেরই উদ্দেশ্য, প্রথমে মন বিনিময়, পরে আংটি বিনিময়। আমাদের 'পাত্র-পাত্রী চাই'-এর বিলিতী সংস্করণ। আমরা লিখি, ওগো, আমার ছেলে বা মেয়ে আছে, তার নানারকম গুণ, তোমাদের যদি কারোর বিবাহ-যোগ্য কেউ থাকে তো লেখো। আর ঐসব বিলিতী বিজ্ঞাপণে লেখা, আমি আছি, আমার আকার-প্রকার দিলাম আর আমার দরকার এই-এই ধরণের বন্ধু বা বান্ধবী। মন মজলে ঘর বাঁধতেও রাজি।

বিজ্ঞাপনের ত্থ' চারটে নমুনা দিই। মুখরোচক।

নিঃসঙ্গ ব্যবসায়ী মহিলা। কেণ্ট বাসিনী। বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। আঁটসাট গড়ন। স-'কার' (গাড়ি সহ) কোন ভদ্রলোকের সঙ্গ চাই।

সুরূপা ভদ্রমহিলা। বিদেশেও ঘর বাঁধতে রাজি। বয়েস ৩৮। ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি লম্বা, ওজন ন' ষ্টোন, ব্লণ্ড (অর্থাৎ রীতিমত শ্বেতাঙ্গিনী, পাটের মত চুল) ব্যবসাভিজ্ঞা, চালাক-চতুর, বিশ্বস্তা, অমায়িকা, নিজের ব্যবসা আছে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ-কামিনী (দরখাস্তকারিনী) মহিলা (অর্থাৎ মামলায় তিনিই নির্দোষী, পূর্ব স্বামীই দোষী), বয়েস ৩২, লম্বা। তিন পুত্রের জননী। বন্ধুত্ব আশা করি। দরকার মনে করলে বিবাহও হ'তে পারে।

পুরুষ। একাকী (৩০), কোন (২১-৪০) মহিলার সঙ্গে বসবাসে ইচ্ছুক। চেহারায় জৌলুষের দরকার নেই। বেশি সাধাসাধি করতে অক্ষম।

মহিলা। হোটেল মালিকা। গায়িকা (৪১) বিবাহ-বিচ্ছেদ-কামিনী। বাদামী চুল। মাঝারি গড়ন। লাবণ্যময়ী। সাজ-সজ্জা-অভিজ্ঞা। কোন শিক্ষিত, অমায়িক, চেঙা ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছুক। বর্তমানে বন্ধুত্ব, ভবিষ্যতে বিবাহ।

নিঃসঙ্গ বিধবা (৩৪), ঝামেলা নেই। অভিমানিনী। বিশ্বস্তা। দয়ালু। লোকে বলে সুন্দরী। নিজের ফ্ল্যাট আছে। শিশু ও সঙ্গীতানুরাগিণী। কোন চালাক চতুর, বহুদর্শী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। উদ্দেশ্য, বিবাহ।

কোন ভদ্রলোক, তবে কারখানার শ্রমিক বা নিগ্রো নয়, বন্ধুত্বের হাত বাড়াবেন কি এক বিধবার দিকে? বয়েস ৪৭, লণ্ডনে কাজ করেন। সুখের পায়রা'র দরকার নেই।

নিঃসঙ্গ ইংরেজ বিপত্নীক। নিজের বাড়ি, গাড়ি। মার্জিত রুচির এশিয়ান বা কন্টিনেণ্টাল তরুণী চাই। আশা, বন্ধুত্ব।

বিপত্নীক, (৬২), মিডিলসেক্স, সুগঠিত, বন্ধন নেই, অল্প পুঁজি, বিশ্বস্ত, আমুদে, ঘরোয়া, সাংসারিক, ধূমপান বিরোধী। কোন ৫০-৬০ বয়েসের ভদ্রমহিলার খোঁজে আছি। উদ্দেশ্য, বন্ধুত্ব ও বিবাহ।

অশ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক। বিশ্বস্তা বান্ধবী চাই। যে কোন জাতের।

মিশুক, ঠাণ্ডা মেজাজ, দয়াবতী মহিলা (৪৫), একবার বিবাহিতা—

অনেকের মুখেই শুনেচেন, পুরুষ অবিশ্বাসী। কোন পুরুষ আছেন, যিনি পুরুষের এই বিশেষণের 'অ' কথাটি উঠিয়ে দিতে পারেন?

সত্যিই কোন ভদ্রলোক আছেন, যাঁর মেজাজ নরম, হৃদয় গরম, কথা মিষ্টি, আচরণে কৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাবে? টেলিভিশন্ দেখার সখ থাকলে চলবে না। বয়েস ২৭ থেকে ৩৫ হওয়া চাই। বিজ্ঞাপনদাত্রী কুমারী, (২৭), ষ্টেনোটাইপিষ্ট, অর্থাৎ গোল্ড-ডিগার নয়, রান্না জানে, চেহারা একরকম, তবে বড্ড ফিটফাট। কেউ রাজী?

সুন্দরী মহিলা (৩৭)। কোন চমৎকার ভদ্রলোকের সঙ্গে আউটিং-এ যেতে রাজী। 'কার' থাকাই চাই।

অলমতি বিস্তারেণ। লিষ্টি বাড়িয়ে কারোর মন খারাপ করিয়ে দিয়ে লাভ নেই। বিশেষ ক'রে ভদ্রতার খাতিরে যখন ঐসব বন্ধুত্ব-উন্মুখ আর উন্মুখীদের নাম ঠিকানাটা চেপে যেতে হচ্চে।

এইসব সচেষ্ট-বিজ্ঞাপন ছাড়াও যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার জন্যে আছে করেসপণ্ডেন্স-ক্লাব, আইভি গিবশনের ম্যারেজ বুরো, মার্জোরি মুরের বিবাহ-অফিস, গোল্ডেন সার্কেল ক্লাব ইত্যাদি। মাত্র কয়েক শিলিং খরচ ক'রে এদের সভ্য হ'লেই মনের মতন সঙ্গী বা সঙ্গিনী তোমার বাহুতে ঝুলিয়ে দেবে এরা। তারপর তাকে ঘরে তোলা তোমার কৃতিত্ব। আমাদের সমাজপতি-প্রজাপতি প্রতিষ্ঠানের অতি আধুনিক রূপ।

বিজ্ঞাপনগুলো পড়লেই বুকটা কেমন ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে। মনে হয়, আহা-রে, এরা দিতে চায়, নিতে নাহি কেহ!

ভারতবর্ষের কথা ছেড়েই দিলাম না হয়, বাংলা দেশে এসেও অনেক বিদেশী রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বা শ্রীনিকেতন দেখবার দরকার মনে করেন না বা কর্তৃপক্ষও দেখাবার কথা ভাবেন না। ইংলণ্ডে গিয়ে কিন্তু শেকসপীয়ারের দেশ ষ্ট্র্যাডফোর্ড-অন-এভন না দেখা মহাপাপ। ষ্ট্র্যাডফোর্ড না দেখলে ইংলণ্ড দেখাই হলো না; ইংরেজ শুনলে 'হাঁ' হয়ে যাবে, আমরা শুনলে 'হায় হায়' করবো।

ইংলণ্ডে এজন্যে কনডাকটেড টুরের ব্যবস্থা আছে।

একদিন লণ্ডন থেকে এমনি এক টুরে রওনা হলাম, ইংরেজ মহাকবির দেশ-ঘর দেখতে, লণ্ডন থেকে ৯৩ মাইল দূরে। বাসটায় বেশির ভাগই

বিদেশী ভদ্রলোকের ভীড়। যথারীতি ভদ্রমহিলারাও আছেন। শেকসপীয়ার পড়েচেন সবাই, সেই শেকসপীয়ারের দেশ-ঘর দেখতে হবে না ?

বাসে জানলার ধারেই আমার সীট। সব গিলতে-গিলতে চললাম। ডাইনে-বাঁয়ে বহুৎ রেষ্টুরেণ্ট। নামগুলো সব অদ্ভুত ঃ হোয়াইট্ লায়ন, রেড-লায়ন, কিংস হেড্, কিংস আর্ম, কিংস ক্রস ইত্যাদি। রাস্তায় চোখে পড়লো নানা মেকারের গাড়ির বডি মাথায় ক'রে লরিগুলো হুস্ হুস্ ক'রে আমাদের বাস পাস ক'রে লণ্ডনের দিকে যাচ্চে। বাসের গাইড বুঝিয়ে দিলো, ওগুলো আসচে কভেন্ট্রি থেকে, রাগবি থেকে ; ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে দেশ বিদেশ ছড়িয়ে যাবে মোটরগুলি। ইংরেজ কুড়িয়ে আনবে বিদেশী মুদ্রা নিজের দেশে।

পথে পড়লো হাই ওয়েকোম্ব ; মাঝারি সহর। তারপর আরো কয়েক মাইল পরে অক্সফোর্ড ; জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌলতেই গড়ে উঠেচে বিরাট সহর। আর সারা সহরে স্কুল আর কলেজ। কার্ডিনাল কলেজ, অরিয়েল কলেজ, ক্রাইষ্ট চার্চ কলেজ—বহুনামী কলেজ এই অক্সফোর্ড সহরে। বহু ইংরেজ ধুরন্ধর এবং মনিষীদের এই সব স্কুল কলেজেই হাতে খড়ি। স্যামুয়েল জনসন, গ্ল্যাডষ্টোন, হ্যালিফ্যাক্স, চার্চিল, এ্যাটলি, এডেন—অনেকেরই নাম জড়িত এই শিক্ষা-সহরের সঙ্গে। গাইড দেখিয়ে দিলো, অক্সফোর্ডের বড় রাস্তায় রবার-সীট পাতা।

সবাই মিলে ঘুরেফিরে স্কুল কলেজগুলি দেখলাম। দেখলাম পড়ার জায়গা, থাকার জায়গা, খাওয়ার জায়গা, খেলার জায়গা। দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, হায়রে, এই যে শিক্ষা-ব্যবস্থা, এই তো আমাদেরই গুরুগৃহে শিক্ষার পাশ্চাত্যরূপ।

এককালে আমাদের ছেলেরা সকাল থেকে গুরুর গৃহে বা আশ্রমে যেতো, সেখানেই পড়াশোনা করতো, কাজ-কর্ম করতো, খেলা ধুলো করতো —সন্ধ্যায় ফিরে আসতো বাড়ি (যাদের বাড়ি থাকতো কাছাকাছি) ; তেমনি ইংরেজ ছেলেরাও সকালে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়ে স্কুলে, পড়া করে সেখানেই, একবেলা খায় সেখানেই, পড়া দেয় সেখানেই, খেলা করে স্কুলের মাঠেই। আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে বাড়িতে, বইখাতা স্কুলেই রেখে। পড়ার জন্যেই স্কুল—বাড়ি নয়। তাই ছেলেকে বাপের কাছে তাড়া খেতে হয় না 'পড়্-পড়্'। আর সেই জন্যেই ছেলে বাপের সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে প্রাণ খুলেই

মিশতে পারে।

আর আমাদের আজকের ছেলেদের শিক্ষা? ঘরে বাপের ধমকানি, পাশে রেডিওর গজরানি, স্কুলে লাষ্ট বেঞ্চে আড্ডা, পথে দেওয়ালে চিত্র-তারকার কটাক্ষ, খবরের কাগজে আইন-আদালতের খবর, হাতের কাছে সিনেমা পত্রিকার রসালো কাহিনী এবং তার উপর ট্রাম ষ্ট্রাইক, বাস ষ্ট্রাইক, আমাদের দাবী মানতে হবে ইত্যাদি সব সহরজাত বিষগুলিকে বশ করতে পারে এমন ছেলে খুব বেশি নেই। তবু যারা নোটস্, সিয়োর সাক্‌সেস, মেড ইজি, কোশ্চেন-আন্সার, সর্ট-কাটের মই বেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চুড়োয় ওঠবার চেষ্টা করে—তারা শেষ পর্যন্ত নিজের পায়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে না, টলতে থাকে। আর যেদিকেই তাকায়, দেখে বিশ্বময় অন্ধকার।

ভাবনা মাথায় চেপে বসলে নামতে চায় না সহজে।

মনে পড়লো, ল্যাফ্‌রকেডদের টেবিলে ব্রেকফাষ্ট খাওয়ার কথা। রোজ সকালে যে গাণ্ডে-পিণ্ডে ব্রেকফাষ্ট খাই—এ খাওয়াও তো আমাদের দেশে অজানা নয়। আজ না হয় সহরে হ'য়ে সকালে এক কাপ চা খেয়ে, ন'টায় স্নান সেরে, কিছু নাকে মুখে গুঁজেই অফিসে ছুটি—কিন্তু আমরাই তো ছোট বেলায় দেশে উঠোনে বসে ভরা-পেট ঘি দিয়ে ভাতে ভাত খেয়েচি। আমাদের চাষীরা আজও সকালে গাণ্ডে পিণ্ডে পান্তা ভাত, কাঁচা লংকা আর পেঁয়াজ খেয়ে মাঠে যায় চাষ করতে। আশ্চর্য, এতোদিনে শোনা যাচ্চে, পান্তা ভাতে নাকি বহুৎ ভাইটামিন, আর কাঁচা পেঁয়াজের গন্ধে বন্ধু পালা। হয়তো, তবে রোগ পালায় আর ডাক্তার পালায়, এ খবরও পাওয়া গেছে।

আরো এলো মাথায়; অতিথি সৎকারের কথা। শুনি, আমাদের কাছে অতিথি নাকি দেব্‌তা। অন্তত, আগে ব্যাপারটা তাই ছিল। এখন ভুলে গেছি। অর্থনৈতিক চাপে ভুলতে হ'য়েচে। এই পশ্চিমী জাতটা অবশ্য কোন দিনই ফোকট-অতিথিকে আমল দেয় নি—তবে অর্থের-অতিথি বা পেয়িং-গেষ্টকে জামাই আদরে রাখতে জানে, রাখেও। আমরা ছাই তাও জানিনে।

ভাবতে ভাবতে কখন যে সবার সঙ্গে গাইডের নির্দেশে বাসে উঠেচি, চলতে সুরু করেচি, খেয়াল নেই। ভাবনা থমকে থামলো গাইডের মিষ্টি

হাঁকে :

ল্যাও লেডিজ অ্যাণ্ড জেণ্টল্‌মেন, দিস ইজ উডষ্টক্‌, দ্য বার্থ প্লেস অব আওয়ার প্রিমিয়ার স্যার উইনষ্টন চার্চিল।

ভালো ক'রে চেয়ে দেখলাম। রত্নগর্ভা স্থান।

হিয়ার হি ওয়াজ বর্ণ এইট্টি ইয়ার্স এগো।

হুঁ। আশী বছরের যুবক এখনও কঠোর হস্তে বৃটিশ তরণীর হাল ধ'রে আছেন। চার্চিল, তোমার সঙ্গে আমাদের অনেক মত বিরোধ। তবু হে দেশপ্রেমিক, তোমায় আমার প্রণাম জানাই।

শেষে এলাম মহাকবির দেশে।

মহাকবির দেশই বটে। এক ফালি আলসে এভন নদী। তারই ধারে সহরখানি। নদীর ধারে ধারে ঝাউ গাছগুলো জলের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে মুখ দেখচে নিজেদের। আঁকা-বাঁকা সরু পিচের রাস্তা, এখানে-সেখানে ফুলের শোভা। ছবির মতন বাড়িগুলি। নির্জন। মনোরম। মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে শুধু ধর্মের ধ্বজা—হোলি ট্রিনিটি চার্চের চুড়ো; মহাকবি এখানেই সমাধিস্থ। আর যে হাল ফ্যাসানের বড় বাড়িখানা এভনের ধারে দাঁড়িয়ে—তার ভিতরটা কিন্তু স্রেফ সেকেলে। শেকসপীয়ারের সেকেলে নাটকই অভিনীত হয় সেখানে : শেকসপীয়ার মেমরিয়াল থিয়েটার। একালের যাবা, সেকালের ভাবের আবেগে আজো মাতোয়ারা হ'য়ে ছুটে যায় পুরোনো দিনেব চিরন্তন কবি তীর্থে—তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্মেই যেন দাঁড়িয়ে একালের চেহারা নিয়ে সেকালের নাট্যচর্চার নাট্যশালা।

কিন্তু কবিতীর্থের যাত্রীদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য—কবির জন্মস্থান। ঠিক যেমনটি ছিল আগে মহাকবির কালে—প্রায় ঠিক তেমনটি দাঁড়িয়ে আছে আমাদেরও কালে। দেখলে আনন্দ হয়। ইংরাজ তাদের প্রিয় কবির স্মৃতিকে ধুলিসাৎ হ'তে দেয়নি, পরের হাতে যেতে দেয়নি। শেকসপীয়ার-বংশের টমাস হার্ট ১৮০৬ সালে ২০০ পাউণ্ডে টমাস কোর্টকে বাড়িটা বিক্রি ক'রে দেন। বাড়িটায় লোকটি মাংসের দোকান খোলে। তারপর হঠাৎ জনরব শোনা গেল আমেরিকা নাকি ঐ বাড়ির ভিৎশুদ্ধ তুলে আমেরিকায় নিয়ে যাবে। ইংরেজ বেঁকে বসলো, তাও কি হয়? হৈ চৈ প'ড়ে গেল। কমিটি গ'ড়ে উঠলো। টাকার জোগাড়ে লেগে গেল সবাই। প্রায় থিয়েটারে 'সাহায্য-রজনী' হ'তে লাগলো। কাগজে চললো

লেখালেখি। তারপর ১৮৪৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারে মিঃ রবিন্স নিলামী হাতুড়ি নিয়ে এলেন ষ্ট্র্যাটফোর্ডে। দর সুরু হ'লো ১৫০০ গিনী থেকে। দর উঠলো ২০০০, ২১০০ পাউণ্ড—থামো, থামো। আমাদের দর রইলো ৩০০০ পাউণ্ড। শেকসপীয়ার-ভক্ত-কমিটির দর। মিঃ রবিন্সের হাতুড়ি পড়লো।

ইংরেজদের হাতে এলো ইংরেজের প্রিয় কবির জন্মস্থান, বাসস্থান। ইংরেজ ঠিক তেমনি ক'রেই সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখলো। তাই দেখতে পেলাম, সেই সেদিনের বাতি-দান, অগ্নি-কুণ্ড, খাট-বিছানা, চেয়ার-টেবিল। সেই কাঠের মেঝে, উপরে যাবার সিঁড়ি, মানুষের চেয়ে এক হাত উঁচু ছাদ। দেখা গেল সেই পুরোন বাসন-পত্তর, পেছনের বাগান। তবে বাগানের গাছগুলোর কেউ-কেউ কবিকে দেখেচে কিনা জানিনে।

শেকসপীয়ারের এই বাড়ি দেখতে এসে তাঁর শোবার ঘরে জানালার কাঁচে সই ক'রেচেন ওয়াল্টার স্কট, টমাস কার্লাইল, অভিনেতা হেনরী আরভিং, অভিনেত্রী এলেন টেরি এবং আরো অনেকেই। ইংরেজ সইগুলি পর্যন্ত সযত্নে রেখে দিয়েচে।

বাস্তববাদী ইংরেজ। ইহ-জগতের সবটুকুই সযত্নে রেখে দিয়েচে, সাজিয়ে রেখেচে, গুছিয়ে রেখেচে—সবাইকে দেখাচ্চে, এই ছাখো, এই ছাখো।

তাই হ্যামষ্টেডে কবি জন কীটসের ছায়া ঘেরা বাড়িতে গিয়ে দেখেছিলাম কীটসের বই, তাঁর লেখবার ১৮" × ১০" সাইজের টেবিলখানা, চেয়ারখানাও, আর্শিটা—যেটায় একদিন তাঁর মুখের ছায়া পড়তো; তাছাড়া তাঁর বই, তাঁর চিঠি, দোয়াত-কলম; এমন কি ফ্যানি ব্রাউনের কেশগুচ্ছ পর্যন্ত।

তাই ৪৮নং ডাউগটি ষ্ট্রীটের বাড়িটায় আজো আছে উপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের দোয়াত-কলম, চুল, নস্যির কৌটো, বাইনাকুলার, সেণ্টের শিশি বেড়াবার ছড়ি, লেখবার ডেস্ক, কাপ-ডিস, গেলাস, আর্শি—আরো কত কি। দেখতে দেখতে মন চলে যায় সোনায় মোড়া পুরোন দিনে।

আর আমাদের? সব থেকেও কিছু নেই। নিঃস্ব। আমাদের কাছে কালিদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস স্বপ্ন। শ্রীমধুসূদনের সমাধিটুকুই সম্বল। বিদ্যাসাগরের বাড়ি হস্তান্তরিত। বংকিমচন্দ্রের বাসস্থান নিষ্প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথের বাড়ি? যাকগে ওসব কথা।

আমাদের কাছে জগৎ মিথ্যা। আমাদের সব শেষ শ্মশানের চিতায়; সেই সঙ্গে কীর্তিও।

তাই তো আজ বিদ্যাসাগরের স্মৃতি-জড়ানো সংস্কৃত কলেজ গাঁইতি-কোদালের মুখে লুপ্ত; বহু মনীষীর ভাব-গম্ভীর কণ্ঠস্বর-প্রকম্পিত এলবার্ট হল আজ কফিখানা।

কিন্তু ইংরেজের দেশে এখনো বিরাট বিরাট অট্টালিকার মাঝে মাঝে দেখা যায় সেকেলে সেই ভিক্টোরিয়া-যুগের পুরোন বাড়ি, পুরোন ধাঁচের। দৃষ্টি-কটু? হোক্। ইংরেজের মহাসম্পদ ওগুলি। যদি ড্রুরি লেনের রেষ্টুরেণ্টটার সামনে দাঁড়িয়ে বলো, এটা আবার কেন? ইংরেজ বলবে, জানো না? ডাঃ জনসন ১৭নং গগ্ স্কোয়ারে থাকতেন বটে কিন্তু পয়সার অভাবে এই রেষ্টুরেণ্টেই ছ' পেন্সে মাংস আর এক পেনিতে রুটি কিনে খেয়ে লম্বা লম্বা ঢেকুর তুলতেন।

তেমনি পিকাডিলি সার্কাসের কাছে রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে নাম করা কাফে রয়াল-এ ঢুকে সেখানে ভিক্টোরিয়া-যুগের ভেলভেট মোড়া সেকেলে বেঞ্চটা দেখে যদি বলো, এমন হাল ফ্যাশনের বাড়িতে এ ফার্ণিচার মানায় নাকি? তক্ষুনি চাপা ইংরেজ ফর্‌ফর্ ক'রে ইতিহাস বলতে শুরু করবে: শোনো তবে। প্রায় একশো বছর আগে ফরাসী দানিয়েল এসে এই কাফে খোলে এবং ফরাসী রান্না খেতে বহুলোক এখানে জড়ো হতেন। কারা আসতেন জানো? অস্কার ওয়াইল্ড, এচ, জি, ওয়েল্‌স, আরো অনেকেই। তাঁরা ঐ বেঞ্চে বসতেন। শুধু তাই নয়, ওয়াইল্ড তাঁর লেডি উইণ্ডারমেয়ার্স ফ্যান, এ্যান আইডিয়াল হাসব্যাণ্ড এইখানে ব'সেই লিখেছিলেন।

প্রত্যেকের হাতের লেখাটুকু পর্যন্ত সযত্নে সাজিয়ে রেখেচে ইংরেজ। তাই তো বৃটিশ মিউজিয়ামে শো-কেসের কাছে দাঁড়ালে দেখতে পাই লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চির আঁকা-জোকা, ব্যালজাক, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কুপার, ব্রাউনিং, টেনিসন, ষ্টুয়ার্ট মিল, শেলী, সুইনবার্ণ, রোসেটি, পঞ্চম হেনরি, পিটার দি গ্রেট, রাণী ভিক্টোরিয়া, ডিজরেলি, বার্ক, ক্যাপ্টেন কুক, কুইন অ্যান, ক্রমওয়েল এবং আরো অনেকের অদ্ভুত সব হাতের লেখা। এমন কি লর্ড ক্লাইভের লেখা ১৭৫৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের একখানা চিঠি—যাতে ক্লাইভ তাঁর বাবাকে লিখচেন, তুমি খুসী হবে জেনে যে, আমি সেক্রেটারী অব ওয়ার্স

লর্ড বার্লিটনকে লিখেচি তিনি যেন আমাকে ইণ্ডিয়ার গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা করেন।

ইস্। একি করেচি। কথায় কথায় মসী-মনীষী শেকসপীয়ার থেকে একেবারে অসি-যোদ্ধা ক্লাইভ-এ। অথচ আমি তখনো কবিতীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মহাকবির বাসস্থানের বেড়ার মধ্যেই বেড়াচ্ছি যে।

ইজন্‌ত্ ইত্ ইন্তারেস্তিং।

অ' কোর্স।

অ-ইংরেজ ভদ্রলোকটি বোধকরি কবি-কুঞ্জ দেখে ভাবের আবেগেই বললেন কথাটা। হয়তো আমার রং দেখেই বুঝেছিলেন, লোকটা ইংরেজ নয়, কাজেই মনের কথাটা একে বলা যেতে পারে। আমিও তাঁর কথায় সায় দিলাম।

ভদ্রলোক আবার বললেন, আই 'য়্যাব রেদ্ শেকসপীয়ার এন্দ নাউ আই সি হিজ্ বার্থপ্লেস। ইজন্‌ত্ ইত্ নাইস ?

আবার বললাম : অ' কোর্স।

ভদ্রলোক আলাপ জমাতে লাগলেন : ইউ কাম ফ্রম ?

ইণ্ডিয়া ?

ইন্দিয়া।—ভদ্রলোকের মুখের চেহারা দেখে মনে হ'লো, যেন চাঁদ পেয়েচেন হাতে : ইউ কাম ফ্রম ইন্দিয়া। সো নাইস। ইউ হ্যাদ্ তেগোর, গ্যান্দি। ইউ আর লাকি।

বললাম, ইয়েস। থ্যাংকিউ। মে আই নো—

হাঁ করতেই বুঝলেন ভদ্রলোক। বললেন, আই কাম ফ্রম মিলানো, ইতালী।

বললাম, ও,-আই হ্যাড বিন্ দেয়ার। ভেরি নাইস প্লেস ইনডীড।

রিয়েলি।—ব'লেই ভদ্রলোক কাছেই এক ভদ্রমহিলার দিকে গেলেন। ভদ্রমহিলা একমনে দ্রষ্টব্য বস্তু দেখছিলেন। তাঁকে ডেকে এনে পরিচয় করালেন, মাই ওয়াইফ। এ্যান্দ্ দিস জেন্তলম্যান ইজ ফ্রম ইন্দিয়া। ইজন্‌ত্ ইত নাইস তু মিৎ হিম্।

ইয়েস মাই দিয়ার।

এমন সময় গাইডের স্বর শোনা গেল : চলো, এবার যাবার সময় হ'লো।

দু'হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানিয়ে বললাম, সিনর আর সিনোরা, তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমিও খুশি।

কবিতীর্থদের দলটায় সবাই প্রায় জোড়া বাঁধা। স্ত্রী পুরুষের জোড়া। ওয়ারইকশায়ারের রেষ্টুরেণ্টে সবাই লাঞ্চে বসে খেয়াল হ'লো, দুটি মহিলার একটি জোড়াও আছে আর আছেন এই একানি শ্রীমান আমি।

এক-এক টেবিলে দু' জোড়া ক'রে বসলেন; আর দেখা গেল ঐ মহিলা জোড়ার টেবিলে এই একানি-টির বসবার জায়গা নির্দিষ্ট। ব্যবস্থাটা দেখে অদৃষ্টকে গোপনে 'বাক্-আপ' ক'রে নিলাম।

কিন্তু মনে পড়লো দু' তিন মাস আগেকার কথা। গ্রীসে। সেও এক কনডাক্টেড টুরে এথেন্স থেকে কয়েকজন মিলে গেছি করিন্থ হ'য়ে সমুদ্রতীরে সিলাকাসট্রনে। মেয়ে-পুরুষে খুব তো লাফ-ঝাঁপ করলাম সমুদ্রে। একটি ভীতু ফরাসী মেয়ে এক হাঁটু জলে বালি মেখেই স্নানানন্দ উপভোগ করলে। আমরাও তার কাণ্ড কম উপভোগ করলাম না। কিন্তু করিন্থে এক রেষ্টুরেণ্টে লাঞ্চের সময়ে আমার অদৃষ্টে যে দুর্ভোগ লেখা ছিল তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

মানে, আমার টেবিলে বসলো এসে আমাদের গার্ল গাইড ইভা পাপাইওয়ানা আর সমুদ্রতটের সেই সফরী ফরাসী মেয়েটি। মেয়ে দু'টীর সান্নিধ্যে আমার যেন অগ্নিমান্দ্য দেখা দিল। এদের সামনে কাঁটা চামচে ধ'রে খাবো কি ক'রে? শুভ বিদেশ যাত্রার দিনেও দিব্যি পাঁচ আঙুলে ডাল ঝোল মাখিয়ে খেয়েচি। হাওয়াই যানের দৌলতে পরদিনই লেবাননে ছিটকে প'ড়ে এই আঙুলেই রুটি ছিঁড়েছিলাম, পরে দামাস্কাসে, তুর্কীতে আঙুল-চামচ যেমন ইচ্ছে চালিয়েচি—কিন্তু ইয়োরোপের দরজায় গ্রীসে এসে দুই তরুণীর সামনে কায়দা মাফিক কাঁটা চামচ ধরা শক্ত বলেই যেন মনে হ'লো।

কাজেই সোজাসুজি সারেণ্ডার করলাম। ইভা পাপাইওয়ানার বয়েস অল্প হ'লে কি হবে—ইংরেজি আর ফরাসী ভাষায় দিব্যি ফর ফর ক'রে বলতে পারে, তাই গার্ল গাইডের কাজ পেয়েচে; আর ফরাসী সফরীটাও যখন 'ইংরেজ-প্রণালী'র এ পারের ঘাটের বাসিন্দা, তখন কি আর তার কণ্ঠনালি দিয়ে একটু আধটু ইংরেজী বেরোয় না,—না, বুঝতে পারে না? এই ভরসায়

আমার ইংরেজিতে যা বললাম, তা ছন্দে ফেললে এই দাঁড়ায় :

হে নিরুপমা !
কাঁটা চামচেয় ভুল করি যদি
করিয়ো ক্ষমা !

শুনে খুশি হ'য়েই বললে ইভা : তোমার যেমন ইচ্ছে করে খাও। নো ফর্মালিটি !

অতএব আর কাঁটা চামচের দিকে নজর না রেখে যেমন খুশি দু'টি যন্ত্র চালিয়ে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে পেটের ফাঁক ভরিয়েছিলাম।

তারপর দু' তিন সপ্তাহ পরে নেপল্‌সে ভিসুভিয়াস ও পম্পাই দেখবার কনডাকটেড টুরের ফাঁকে এক রেষ্টুরেণ্টে ইংরেজ মিঃ এবং মিসেস ওটওয়েব সঙ্গে খেতে বসে যখন দেখলাম, রুটি কাটতে গিয়ে মিসেসের হাত থেকে কাঁটা ছিটকে পড়লো মাটিতে, অমনি আমার মনের সাহস যেন শতগুণ বেড়ে গেল : ইংরেজের হাত থেকেও কাঁটা-চামচ খসে তা হলে !

পরে নানা দেশের পথে যেতে যেতে আর খেতে খেতে কাঁটা-চামচের আইন-কানুন সব এমন রপ্ত ক'রে ফেললাম যে, এক-এক সময় মনে হ'তো দেশে গিয়ে স্বদেশী ডাঁটা কাঁটায় বিঁধিয়ে চিবুবো কিনা ? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সে দুর্বুদ্ধি হয় নি।

যাই হোক ওয়ারইকশায়ারের রেষ্টুরেণ্টে এ হেন কাঁটা-চামচাভিজ্ঞ শ্রীমানের টেবিলে দুটি শ্রীমতি তরুণীকে দেখেও কাঁটা চালনার বিষয়ে আর ভয়ে কাঁটা হবার কারণ রইল না। আর এই সব কনডাকটেড টুরে গায়ে প'ড়ে ভাব করতেও যখন বারণ নেই, তখন স্বভাবতই খাদ্যের তালে-তালে গল্পের জাল বোনা চললো ; অল্পের মধ্যে যতটুকু বলা যায়, বললাম আমি, আর ওরা কিছু বললো।

জানা গেল, তরুণীদ্বয় মার্কিনী। দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ঘুরে এসেছেন ইংরেজের দেশ দেখতে। তবে শুনছি মুখোদের তেমন ভাল লাগছে না ; আর দেশটার নাকি আবহাওয়া মোটেই সুবিধের নয় ; তাছাড়া নোংরা ! (এঁ্যা, নোংরা ! অবশ্য আমার বিস্ময়ভাব চেপে তাঁদের কথায় সায় দিলাম।) কাজেই ঠিক করেছেন, আর দু'চারটি দ্রষ্টব্য দেখেই—হাওয়া হবেন দু'চার দিনের মধ্যেই। দেবী দু'জনের কথায়-বার্তায় মনে রীতিমত ভক্তি জেগে উঠলো এবং তাঁদের সোনার

দেশটার প্রতিও শ্রদ্ধায় দেহমন কেমন যেন রোমাঞ্চিত হলো। হবারই কথা। ইংলণ্ড যাদের কাছে নোংরা, আমরা তাঁদের কাছে কি? কি জানি।

আসল ব্যাপারটা বলি: এই মার্কিন জাতটা সর্বত্র টাকা ধার দিয়ে দিয়ে কাউকে আর তেমন ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে চায় না। সব সময়েই কেমন একটা নাক সিঁটকানো ভাব। আর ওদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেবার পর থেকেই সারা ইউরোপটাও অনর্থক ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স-এ ভুগচে, আর মার্কিন দেশটা সুপিরিয়রিটি-কমপ্লেক্সের বিকারে দেখচে হাতির পাঁচ পা। স্যামু-খুড়োর গার্জেনি-পনায় সবাই যেন চাপা গর্জন করচে। বহু দেশেরই রাজনৈতিক নেতারা খুড়োর দরজায় গিয়ে হাত পাতচে বটে, তা ব'লে উক্ত নেতাদের দেশোয়ালী ভায়েরা কিন্তু খুড়োর গোষ্ঠির কারোর জন্যে পাত পাততে রাজি নয়। ইঙ্গ-মার্কিন বন্ধুত্বের গল্প খবরের কাগজে ফলাও ক'রে বেরুতে পারে, কিন্তু ইংরেজ পরিবারে ঐ বন্ধুত্ব প্রায় নাকচ। অনেক ইংরেজ ব'লেই ফেলে, ঐ আমেরিকানরা আমাদের ভাষার শ্রাদ্ধ তো করেইচে, এবার দেশটাকে গোল্লায় দেবার ফিকিরে আছে।

কথাটা মনে পড়ায় মার্কিন তরুণীদ্বয়কে নিবেদন করলাম: দ্যাখো বাপু, তোমরা ইংরেজের ভাষা-বানান সব উল্টে-পাল্টে দেওয়ায় তোমাদের উপর ওদের ভারি গোঁসা হয়েচে তোমরা 'অল-রাইট'কে 'ও-কে' করেচো, 'ইয়েস'কে 'ইয়া' করেচো, 'ক্যাটালগ'-এর বানান বদলেচো, এ কিন্তু ভারি অন্যায়।

উত্তর দিলো: আমরা নতুন জাত, আমাদের নতুন আশা, নতুন প্রাণ, নতুন ভাব; কাজেই কোন ভাষাকে নতুন করে নেবো, তাতে আর আশ্চর্যের কি? ইংরেজ জাতটা যেমন সেকেলে, তেমনি সংস্কারপ্রিয়। ওরা অদল-বদল করতে বড় ভয় পায়।

আমি হেসে বললাম: যা বলেচো। এই দ্যাখো না, আই ডু উই ডু, কিন্তু হি বা শি-র বেলায় আর 'ডু' করতে পারলে না আজ পর্যন্ত—সেই 'ডাজ'ই রয়ে গেল। অথচ এই বিশ্বে কম পরিবর্তন ঘটলো। আর 'ডাজ'-এর এই অনিয়মের ডোজটুকু গলধঃকরণ করবার জন্যে মাষ্টারমশায় আমার কম কান মলেচেন। আর আমিও বোধকরি ততোধিক কান মলেচি ছোটদের ঐ ইংরেজি বেয়াদপি-টি মেনে নেওয়াবার জন্যে।

এভাবে মতের মিল হ'য়ে যেতেই মনের মিল হতে দেরী হ'লো না। লাঞ্চের পর ওয়ারইকশায়োরের ক্যাসল দেখলাম সবাই। তবে আমরা তিনজনেই যেন ঘন হ'য়ে রইলাম। এভন নদীর তীরে মনোরম স্থানে ওয়ারইক দুর্গটি। দুর্গের ভিতরে কাঠের কারুকার্য দেখবার মত। দেখলাম, মারি আঁতোয়ানেৎ-এর ঘড়ি, ক্রমওয়েলের হেলমেট, অর বহু বিখ্যাত ছবি সংগ্রহ। তিনজনে ঘুরে ফিরে দেখলাম, প্রশংসা করলাম, এবং কয়েকটা জিনিষ দেখে 'কী এমন' বলতেও দ্বিধা করলাম না আমরা।

বেরিয়েছিলাম বেলা ৮টায়, ফিরলাম লণ্ডনে রাত ৮টায়। আক্সব্রিজ, বেকনসফীল্ড, ষ্টোকেন চার্চ, উডষ্টক, ষ্ট্রাটফোর্ড, অ্যান হ্যাথওয়ে'জ কটেজ, বানবেরী, বার্কহ্যামষ্টেড এলিসব্যারি সবই দেখলাম—কিন্তু ইংলিশ ভিলেজ দেখলাম না তো? ইংলণ্ড তার গ্রাম হারিয়ে ফেলেচে। লণ্ডন থেকে বেরিয়ে লণ্ডন কখন শেষ হলো, কখন এলাম গ্রেটার লণ্ডনে—কখন গেলাম পাশের সহরে—বোঝা মুস্কিল; বুঝতে হয় দোকানের বা পথের সাইন বোর্ড দেখে। মাঝে ঘাসের ফাঁক ব'লে আর কিছু নেই—লোকের ঘাম দিয়ে গড়া সার-সার সহরের পর সহর। ব্যাঙ্ক, রেষ্টুরেণ্ট, সিনেমা, বার, দোকান-পাট—কাঁধে কাঁধ মিশিয়ে দাঁড়িয়ে। ছবিতে দেখা, সেই উঁচু-নীচু সবুজ মাঠ, নীল জলের খাল, কাঁকরের লাল রাস্তা, সাদা ঘোড়ার গাড়ি—সে সব ভিক্টোরিয়ান যুগে ছিল, এখন খৃষ্টমাস কার্ডের প্রথম পৃষ্ঠায়।

ফেরবার পথে বসবার জায়গা নিয়ে তেমন আর কাড়াকাড়ি ছিল না। কয়েকজন মাঝপথেই নেমে গেছলেন। কাজেই সন্ধ্যায় বানবারিতে চা খেয়ে দুই মার্কিনী তরুণী আর আমি পেছনের সীটটায় জাঁকিয়ে বসলাম। আর আশ্চর্য যে লোক দেশে বাসে-ট্রামে লম্বা লেডিজ সীটে, একটি লেডি থাক'লেও ভয়ে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বসবার সাহস পেত না, সে কিনা দিব্যি তরুণীদ্বয়ের মাঝখানে বসলো। যেন ডাইনে বামে নৈবেদ্য। উপায় কি? দু'জনেই আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, আর আমাকেও গল্প করতে হবে তো এদিকে ওদিকে ঘাড় ফিরিয়ে। আমরা গল্পে মসগুল হ'য়ে গেলাম।

দুঃসময় যেমন কাটতে চায় না, সুসময় তেমনি হাওয়ায় উড়ে যায়! তিনজনেরই চমক ভাঙলো, বাস থামাবার হঠাৎ-ব্রেকে। আচমকা গল্পলোক থেকে পড়লাম এসে লণ্ডনের নীচের রাস্তায়। অগত্যা নামতে হলো। শেষ হলো আমাদের ৪২ শিলিংয়ের সারাদিনের ভ্রমণ।

গুডবাই। ভাবি হাতখানা এগিয়ে দিলাম।

গুডবাই।

বড় আনন্দে দিনটা কাটালাম। তাই না?

সত্যিই।

আমার মনে থাকবে তোমাদের দু'বোনের কথা।

দুই বোন?—চমকে উঠলো দু জনেই : আমরা বোন নই!

তবে?

আমি মেয়ে, অ্যাণ্ড শী'জ ম্যায় ম্যামি।

বোকার মতই বললাম : তোমার নিজের—?

দু'জনেই হেসে উঠলো : ইয়া।

আমার মুখের চেহারা কেমন হয়েছিল জানিনে, তবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো : মাই ঘ্যাড্!

পরীক্ষা পাশের জন্যে যেমন দরকার 'নোটস' গেলা, সংসার-পরীক্ষায় যেমন দরকার দেওয়ালে টাঙানো মা-কালির ছবি, ধর্মে যেমন দরকার গুরু একজন, তীর্থে যেমন দরকার পাণ্ডার, রাজনৈতিক সভায় যেমন দরকার গুণ্ডার—ঠিক, ঠিক তেমনিই বিদেশ ভ্রমণে দরকার—একজন গাইড-এর!

আমার একজন গাইড জুটে গেল মিঃ হিন্দি।

হিন্দী জাতিতে লেবানীজ। বেরুটের কাছেই বাড়ি। পূর্বপুরুষরা নাকি ইণ্ডিয়ানই ছিলেন; ঠাকুর্দা চলে আসেন লেবাননে; ইণ্ডিয়া থেকে আগত, তাই পদবী হয়েচে হিন্দি। বয়েস পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। লাল টকটকে চেহারা। এক মাথা কালো কোঁকড়া চুল। বাদামী চোখের তারা। মুখে মিষ্টি হাসি। দেহখানি পেশী-পোক্ত। অমন ময়ূর ছাড়া কার্তিকও নিখুঁত নয়; দু' গালে ব্রণের বিশ্রী দাগ।

হিন্দির সঙ্গে আলাপ হ'লো ইণ্ডিয়া হাউসের নীচের তলার লাউঞ্জে। সোফায় গা এলিয়ে ক'দিনের বাসি যুগান্তরখানায় চোখ বুলোচ্ছিলাম, আমার পাশে এসে বসলো হিন্দী। কাগজের ফাঁকে একবার দেখে নিলাম। ভদ্রলোকের ইংরেজ-ঘেঁষা চেহারা। অথচ মুখখানায় এশীয়-লাবণ্য—কেমন যেন সন্দেহ হ'লো। ইণ্ডিয়া হাউসে যখন ব'সে—তখন তো ইংরেজের দেশে একটুকরো ভারত ভূমিতেই আছি! কাজেই

ভারতীয় নিয়মে যেচে আলাপে দোষটা কি ? অতএব পর পর প্রশ্ন করে গেলাম, কোথায় দেশ, কেন আসা, কতদিন আছ, কী নাম, কতদিন থাকবে — এবং আরো আরো। আর আমার প্রশ্নের সব উত্তর অতি প্রসন্ন বদনেই দিলো হিন্দি।

জানা গেল, হিন্দীর এদেশে আগমন ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে। পাঁচবছর আছে, আরো একবছর থাকবে। দেশে মা-বোন-কাকা-কাকী আছেন। এখানে থাকে হ্যামষ্টেডের কাছেই গোল্ডার্স গ্রীণে ; অতএব আমার ডেরার কাছেই। হিন্দির পূর্বপুরুষ যখন আমাদেরই দেশোয়ালী, তার বর্ত্তমান দেশও প্রায় নাগালে, আর এদেশেও যখন আমরা তিনটি টিউব ষ্টেসনের তফাতে—শুধু তাই নয়, তার দেশটা আমি কিছুদিন আগেই পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এসেছি ; পথ-ঘাট, বাজার-হাট সবই চেনা—তখন আচমকা ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠা বিচিত্র নয়। আমরা আধঘণ্টার মধ্যেই বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললাম।

হিন্দী আমার কথা জেনে নিয়ে পরে জিগ্যেস করলো : এখানে এসে কি কি দেখলে বলো।

বললাম সব।

শুনে হাসলো হিন্দি। বললো : এখানে আরো অনেক কিছু দেখবার আছে মিঃ ঘোষ।

তাই নাকি ? ঠিক আছে, এক সঙ্গে বেড়ানো যাবে।

সেই থেকে ক'দিন শুরু হলো হিন্দির সঙ্গে বেড়ানো। গোল্ডার্স গ্রীন থেকে বেলসাইজ পার্ক টিউবে নেমে হ্যামষ্টেডে আসতো আমার ডেরায় এবং সেখান থেকে দু'জনে বেরিয়ে পড়তাম এক-একদিন এক-একদিকে।

মিসেস লেফরকেড আর আমি একসঙ্গে কয়েকদিন গেছলাম মার্কেটে, লণ্ডন জু-তে, হ্যামষ্টেডের উঁচু ঢিপিটায়, পার্কে, বাগানে, সিনেমায়। ইষ্ট-এণ্ডে বোমায় ভাঙা বাড়িগুলোও আমাকে তিনি দেখিয়ে এনেছিলেন। সেখানে পরিষ্কার ক'রে মোটর পার্কিং-এর ব্যবস্থা।

এবার হিন্দিকে দেখে এবং তার পরিচয় পেয়ে ল্যাণ্ডলেডি বললেন, অ্যাণ্ড ইউ হ্যাভ এ গুড গাইড।

হেসে বললাম, নট লাইক ইউ। আইয়্যাব টু মিস ইওর সুইট কোম্পানী। ইজণ্ট্ ইট্ মিঃ হিন্দি ?

রাইট ! ডিটো দিলো হিন্দি ।

ইজ ইট ? খুশি হলেন মিসেস ।

বাইরে এসে হিন্দি বললো : চলো হেঁটে খানিকটা এগুনো যাক ।

তাই চলো ।

হ্যামষ্টেড রোড ধ'রে এগুতে লাগলাম ইউষ্টন ষ্টেসনের দিকে । খানিকটা এগিয়েই পড়লো চক্‌ফার্ম, তারপরেই ক্যামডেন টাউন—একটু দুরেই মর্নিংটন ক্রিসেণ্ট ।

হিন্দি বললো ঃ উত্তর লণ্ডনের এই পাড়াগুলোই হচ্ছে গরিবী আস্তানা । লণ্ডন যখন গৌরব করে, তখন এসব পাড়ার কথা চেপে যায় । বাড়িগুলো দেখ কেমন মন মরা, লোকগুলোর পোষাকে তেমন জৌলুষ নেই. মেয়েরা এক জামাতেই বছর চালায় । বস্তার মতো ওভার কোটটা মা-মেয়ে-ঠাক্‌মা সবাই পরে পালা করে । এ সব পাড়ায় ডেলি-ওয়ার্কার কাগজখানার ভারি কাটতি ।

রাস্তায় দোকানগুলোও কেমন যেন মলিন, শো-কেসগুলো অপরিষ্কার । রাস্তায় ছেঁড়া কাগজ, সিগ্রেটের টুকরো, চকোলেটের মোড়ক ।

এই যে দোকানগুলো দেখচো— হিন্দি বললো : দেখে যাও, ওটি হচ্ছে পন-ব্রোকার শপ, জিনিষ বাঁধা রেখে টাকা ধার দেয় । বিয়ের গাউন, কোন সখের প্রেজেণ্ট, ক্যামেরা, ফুলদানী, ক্রকারি যে যা পায় বাঁধা রেখে চড়া সুদে পাউণ্ড-শিলিং ধার করে । তার পাশেই ঐ পুরোন জামা কাপড়ের দোকান । পুরোন কোট-প্যাণ্ট সার্ট, এ্যাপ্রন, ওভারকোট, জুতো কেনা বেচা হয় এইসব দোকানে ।

তার পাশেই দেখলাম পুরোন বইয়ের দোকান, নানা রকমের পুরোন বই -ম্যাগাজিন সাজানো । কমদামী হেয়ার কাটিং সেলুন রয়েচে একটা । তাতে বিজ্ঞাপন আড়াই শিলিংএ চুল ছাঁটা হয় । অথচ লণ্ডনে চুল ছাঁটাই রেট কমসেকম—সাড়ে তিন শিলিং । পিকাডিলির কাছাকাছি সেলুনগুলোয় পাঁচ শিলিংয়ের কম চুলে ক্লিপই ছোঁয় না নাপিত । ক'দিন আগেই এমনি এক বুর্জোয়া সেলুনে পাঁচ শিলিংয়ে চুল ছেঁটে এবং আরো আড়াই শিলিংয়ে দাড়ি চাঁচিয়ে ও মাথা টিপিয়ে এসেচি । অবশ্য এজন্যে পাক্কা দেড়টি ঘণ্টা

আমার মাথা নিয়ে মাতামাতি করেছিল পরামানিক সাহেব। একটু বর্ণনা দিই :

সেলুনটি পিকাডিলির কাছেই হে-মার্কেটে। মাঝারি সাইজের ঘর। পর পর ছ'খানি ষ্ট্রীম-লাইনড সাদা রংয়ের চেয়ার পাতা। সামনে দেওয়ালে বিরাট ছ'খানি আর্শি। আর তার ঠিক নীচেই ছ'টি ঝকঝকে বেশিন। আর একদিকের কোনে খান কয়েক বাড়তি চেয়ার আর টেবিল এবং তাতে কয়েকখানা ম্যাগাজিন। অপেক্ষা করবার ব্যবস্থা। আর এক কোণে প্রোপ্রাইটর পরামানিক সাহেবের দপ্তর। ছ'টি এসিষ্ট্যাণ্ট-পরামানিক সাদা পোষাকে এ্যাপ্রন প'রে ক্লিপ হাতে খদ্দেরের চুল ছাঁটতে ব্যস্ত। ধব ধবে সাদা পোষাক পরা, মাথায় বনেট লাগানো ছ'টি মেড যন্ত্রের মত পাউডার সাবান, ব্লোয়ার, তোয়ালে, চিরুণী, কাঁচি সাপ্লাই ক'রে যাচ্ছে। মুখগুলি সবার যথারীতি গুরু গম্ভীর, কারোর মুখে কোন কথা নেই। যেন গুরুতর কোন অপরেশন হচ্চে : মাথায় টিউমার বা ব্রেণ সার্জারি।

অসীম ধৈর্য ধ'রে বেশ খানিকক্ষণ ব'সে ছ' তিনখানি ম্যাগাজিন শেষ করবার পর এলো আমার পালা। প্রথমেই আমার পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত একখানা বিরাট তোয়ালে দিয়ে আমাকে চেয়ারের সঙ্গে মুড়ে জড়িয়ে ফেলে চুলে পাউডার স্প্রে করা হ'লো। পরে অপূর্ব কায়দায় শুরু হ'লো ক্লিপ চালনা। মিঃ সহকারী পরামানিকের সে কী দাঁড়াবার ভঙ্গী, মুখের এক্সপ্রেসন (আর্শি দিয়ে দেখা গেল), হাতের কৌশল, ক্লিপের কল্পনাতীত মধুর শব্দ। ভাবছিলাম, চুল না ছেঁটে, এই চুল ছাঁটার কৌশল দেখলেই পাঁচ শিলিং উঠে আসে। চুল ছাঁটান্তে (এমন একটি গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপারে একটু সাধু ভাষাই ব্যবহার করা যাক) মেড কর্তৃক আনীত এয়ার ব্লোয়ারে আমার ছাঁটা চুল উড়িয়ে দেওয়া হ'লো; পরে আমার ঘাড় ধরে মাথাটা সামনের বেসিনে চেপে রেখে হট্ ওয়াটার ট্যাপ দিলো খুলে। গরম জলের ধোঁয়া পড়লো ছড়িয়ে। ভাগ্য ভালো, একটু পরেই মাথাটাকে তুলে ধরে আর একটা টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে আমার মাথা মুছিয়ে দিতেই মেড এনে হাজির করলো একটা পোর্টেবল্ ফ্লেক্সেবল্ রবার-রোটেটর। সুইচ চালিয়ে দিতেই রবারের স্পঞ্জের মত চাকতিখানা আমার মাথায় ছর্‌র্ ছর্‌র্ ঘুরতে লাগলো। নেহাৎ বাঙ্গালী, মাথা গোবর নয়, ঘি পোরা; তাছাড়া স্ক্রুগুলো নিশ্চয়ই টাইটই ছিল—তাই চেয়ারে

টাইট হ'য়ে ব'সে সেই মেসিনের ঘুরুনি শিরোধার্য করলাম এবং মাথা ঘুরে চেয়ার থেকে প'ড়ে না গিয়ে বাঙ্গালীর তথা সারা ভারতের মুখ রক্ষা করলাম এবং আমার মান রক্ষা। তারপর আবার বেসিনের গহ্বরে মাথা নোয়াতে হ'লো। মাথায় ছাড়া হ'লো আবার গরম জল এবং ঘসা হ'লো সুগন্ধী সাবান। অতঃপর মাথা ধোয়া, মাথা টেনে এনে মাথা মোছানো, হেয়ার ক্রীম লাগানো, চুল আঁচড়ানো—এবম্বিধ বহু রকম কৌশলাদির পর পরামানিক সাহেব আমার দাড়ি নিয়ে পড়লেন। আমার দুই গাল ও গলায় শেভিং ক্রীম লাগিয়ে কামানো; আবার ক্রীম লাগানো এবং কামানো; তারপর সুগন্ধী সাবান ঘসা, ধোয়া, ফিটকিরী লাগানো, গাল-গলা মোছানো, পাউডার মাখানো, পাফ্ দিয়ে মোছা ইত্যাদি ক'রে যখন ছেড়ে দিলো আমায়—মুখ থেকে বেরিয়ে গেছলো হয়তো: বাপস্।

ইরেজ আমাকে ঘসে মেজে ইংরেজ বানিয়ে ছাড়বার তালে ছিল বোধকরি। নেহাৎ পাকা রং করা ট্যানড চামড়া, আর কালো চুলের রংও পাকা, তাই পারলো না বোধহয়। যাক্, মোট সাড়ে সাত শিলিং গাঁটগচ্চা দিয়ে, বিলখানা পকেটে নিয়ে বেরুবার সময় দরজার সামনের বড় আর্শিটায় নিজের চেহারাটা দেখে এইটুকুই বুঝলাম—কলকাতায় আমাদের পাড়ার রূপশ্রী সেলুনে আট আনায় এমন কিছু খারাপ চুল কাটে না। বরং সেখানে ভড়ং নেই।

পিকাডিলি অঞ্চলে এই ভড়ংদার রাজকীয় সেলুনের কাছে ক্যামডেন টাউনের ঐ আড়াই শিলিং সেলুন, আমাদের ফুটপাথের 'ব্রিক-সেলুন'-এর সামিল। আমাদের ইঁট পেতে ব'সে চার আনায় চুল ছাঁটা আর এদের লগবগে চেয়ারে ব'সে আড়াই শিলিং চুল ছাঁটার ব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অল্প পয়সার মানুষেরা সর্বথা ও সর্বদাই সস্তা-ব্যবস্থায় বাধ্য হ'য়েই খুশি।

ডিন্ডি বললো, এই গতর খাটা ইংরেজদের জীবন যাত্রার মান তোমার দেশের বা আমার দেশের চাইতে উঁচু নিশ্চয়ই কিন্তু এদের কোন মানই নেই অভিজাত ইংরেজের কাছে। এদের সমাজ আলাদা, চলন-বলন-ধরণ আলাদা। এদের ইংরেজি উচ্চারণ ভয়াবহ, আচরণে ভীতি বিহ্বলতা। সকালে কারখানায় যায়, সন্ধ্যায় 'বার'-এ, রাত্রে বারবণিতার ঘরে, অবশ্য সবাই নয়। এরা রাজনীতি নিয়ে যত না মাথা ঘামায়, তার বেশি

মাথা ঘামায়, বাজার দর নিয়ে। এরা মজাদার খবরের জন্যে খবরের কাগজ কেনে, বিশ্বের খবর জানবার কোন আগ্রহ নেই।

কথায়-কথায় আমরা এসে পড়লাম ইউষ্টন ষ্টেসনে।

হিন্দি বললো : নীচেয় নামি। টিউবে যাওয়া যাক মার্বেল আর্চে।

চলো।

ইউষ্টন থেকে রওনা হয়ে ওয়ারেণ ষ্ট্রীট, গুজ ষ্ট্রীট, টটেনহ্যাম কোর্ট রোড-এ এসে সেণ্ট্রাল লাইনে অক্সফোর্ড সার্কাস, বণ্ড ষ্ট্রীট পার হ'য়ে নেমে পড়লাম মার্বেল আর্চে।

মার্বেল আর্চটিতে পাথরের চমৎকার কাজ। চতুর্থ জর্জ ওটি তৈরী করেছিলেন বাকিংহাম প্যালেসের গেট হিসেবে। কিন্তু ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারেরও ভুল হয়। গেট যখন শেষ হ'লো, দেখা গেলো, রাজকীয় ঘোড়ার গাড়ি বা ষ্টেটকোচ তার ভিতর দিয়ে পাস করচে না। কাজেই ওটিকে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট, পার্ক লেন, বেজওয়াটার ষ্ট্রীট আর এজওয়ার ষ্ট্রীটের চৌমাথায় দাঁড় করিয়ে রাখা হ'লো। আর স্মৃতি-প্রিয় ইংরেজ গেটটাকে রাজকীয় অনুষ্ঠানের সময়, যেমন করোনেশন বা রাজার মৃত্যুতে শোকযাত্রার সময় আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ গেট খোলার ব্যবস্থা করলো।

হিন্দি বেশ মজার কথা বললো : ত্যাখো, এই ইংরেজের সংস্কারপ্রিয়তা দেখবার মত। এই যে দরজার গোড়ায় দুধের বোতল রেখে যায় গোয়ালা প্রত্যেক বাড়িতে, এমন কি সপ্তাহান্তে পয়সাও রেখে দেয় বাড়ির গিন্নী দরজার কাছে—কারণ মাসের পর মাস কারোর দেখা হয় না—কিন্তু ঐ দুধের পয়সা, বা দুধের বোতল কখনো চুরি যেতে শোনে নি কেউ। কারণ কি জানো?

কি?

ঐ সংস্কার। দুধের বোতল নিতে নেই বা তার পয়সা নিতে নেই। তার বাপ-ঠাকুর্দার আমলে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি, অতএব তার আমলেই বা হবে কেন? কিন্তু ঐ দরজার গোড়ায় মদের বোতল যদি থাকতো? কি হ'তো বলো তো?

দুজনেই হেসে উঠলাম।

তেমনি ঐ খবরের কাগজের বেলাতেও, হিন্দি বললো, পয়সা দিয়ে কাগজ নিয়ে যাচ্চে—কারণ এই রকমই হ'য়ে আসচে বহুদিন। অতএব

ঐ রকমই চলবে। নইলে ভেবো না, সব সাধু ব'নে গেছে; ; তা হ'লে আব ব্যাংক লুঠ হ'তো না, বা বলাৎকার হতো না, বা রাহাজানি হ'তো না।

এই মার্বেল আর্চের কাছেই একদা প্রকাশ্যে বিরাজ করতো ফাঁসীর মঞ্চ—টিবার্ণ গ্যালোজ; অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাই আমদানী করেছিল ইংরেজ আমাদের দেশেও। হয়তো পরে সভ্যতার আলোকে ঐ ফাঁসীর মঞ্চটী দাঁত বার ক'রে ইংরেজকে ভেংচি কাটছিল, তাই তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলেচে সেটাকে। তবু সংস্কার-প্রিয় ইংরেজ স্মৃতিটুকু মুছতে পারেনি একেবারে। তাই ঐ ফাঁসীর মঞ্চ অংকিত এক টুকরো তেকোনা পেতলের প্লেট পুঁতে রেখেচে সেখানে—স্থান-মাহাত্ম্য ঘোষণা করবার জন্যে। তাতে লেখা: হিয়ার স্টুড টিবার্ণ-ট্রি; রিনিউড ১৭৫৯।

হিন্দি বললো: চলো একটু কফি খেয়ে নেওয়া যাক। শীতের সন্ধ্যায় লাগবে ভালো।

চলো।

কাজেই এ-বি-সি কাফেটোরিয়ায় দু' কাপ কফি আর খানিকটা বিশ্রাম উপভোগ ক'রে বেরিয়ে দেখি লণ্ডনের শীতের আকাশে শুরু হয়েচে কালো-আঁধারের আধিপত্য। লণ্ডনের মেঘলা-ভেজা-ধোঁয়াটে আকাশ কখন যে চুপিসাড়ে সন্ধ্যায় অন্ধকারের আলকাতরা মেখে বসে—তা ঠাহর করা মুস্কিল। হাতের ঘড়ি আর বিগবেন দেখে বুঝতে হয়।

চলো একটু বক্তৃতা শোনা যাক। হিন্দি বললো।

আমি যথারীতি বললাম: চলো।

একটু এগিয়ে হাইডপার্কের মুখে এসে দেখি—ইতিমধ্যেই শুরু হ'য়ে গেছে বিশ্ববিশ্রুত হাইড পার্কের বক্তৃতা। চার পাঁচ হাত উঁচু কাঠের পোর্টেবল প্ল্যাটফর্ম (ঘরাঞ্চি জাতীয়) বক্তা নিজেই কাঁধে ক'রে এনে, তাতে চ'ড়ে হাত পা নেড়ে শুরু করেচে বক্তৃতা। ঘরাঞ্চিতে ঝুলচে একটা বোর্ড —কোন সমিতির লোক সে। একটু তফাৎ-তফাৎ পাশাপাশি ঘরাঞ্চিগুলি বসানো; আর তার উপর দাঁড়িয়ে বক্তা। কোনো বক্তা ঘরাঞ্চির অভাবে একটা কাঠের বাক্স এনে তার উপরেই দাঁড়িয়েচে। মাইক নিষিদ্ধ। অ-মাইক বক্তৃতা। তোমার মনের কথা, আদর্শের কথা বলতে চাও? মাইক ছাড়া শুধু গলায় চীৎকার করতে হবে। তবে ভয় নেই, শ্রোতা তোমার

জুটবেই। প্রশ্নও করবে তোমাকে, ঠিক-ঠিক উত্তর দিতে পারলে ভক্ত জোটাও বিচিত্র নয়।

বাইবেল সমিতির সেই পরম ঈশ্বরের পুত্র মাচায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করচে : খ্রীষ্ট ধর্মই একমাত্র ধর্ম। যীশু পরম দয়ালু।

ডগ-কেয়ার সোসাইটির একজন বক্তৃতা মাধ্যমে কুকুরের জন্যে কেঁদে আকুল : কুকুর প্রভুভক্ত, আর আমরা তাদের প্রতি যথার্থ কর্তব্য করতে পারিনে। কী লজ্জা!

কিন্তু আমাদের কাছে সব চাইতে চমকপ্রদ লাগলো অ্যান্টি-কলোনিয়াল সোসাইটির নিগ্রো-নেতার বক্তৃতা। খাস লণ্ডনের বুকের উপর দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের শাসন নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা। আহা, আমাদের যেন মনের কথা বলচেন ভদ্রলোক।

হিন্দি আর আমি সেই নিগ্রো বক্তার সামনেই দাঁড়ালাম। আমাদের মত আরো অনেক ইংরেজ মেয়ে-পুরুষের ভীড়। ভীড়টা যেন ঐ বক্তার সামনেই বেশি।

তুমি ইংরেজ ভুলো না, তোমাদের ঐ সাদা চামড়ার তলায় যেমন লাল রক্ত, ঠিক তেমনিই আমাদের এই কালো চামড়ার নীচের রক্তও লাল। তোমরা চক্ষু লাল ক'রে আর আমাদের কতদিন পায়ের তলায় রাখবে ভেবেচো? তোমাদের দিন ফুরিয়ে এসেচে। আফ্রিকা জেগেচে। আফ্রিকার বন, জঙ্গল, পথ ঘাট, সহর গ্রাম, আকাশ বাতাস সব জেগেচে। বিদ্যায় বুদ্ধিতে সাহসে, শৌর্যে, শক্তি-সামর্থে আমাদের অগ্রগতি হয়েচে শুরু। অতএব, হে ইংরেজ, তোমরা সসম্মানে আমাদের দেশ থেকে বিদায় নাও। আমাদের দেশ আমাদের ফিরিয়ে দাও। নইলে বিপদ তোমাদের সামনে, অবস্থা তোমাদের সঙ্গীন! হে ব্রিটিশ জনতা, হে স্বাধীনতা-প্রিয় ইংরেজ, তোমরা দলবদ্ধ হও। মানবতার দোহাই—তোমরা ব্রিটিশ কুশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াও, আমাদের পাশে দাঁড়াও, আমাদের বন্ধু হও—বলো, আমরা যেমন নিজেদের স্বাধীনতা চাই, তেমনি অন্যের স্বাধীনতাও আমরা চাই।

অপূর্ব জ্বালাময়ী বক্তৃতা।

দেখতে লাগলাম শ্রোতা ইংরেজদের মুখ। দিব্যি পরম নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুনচে বক্তার বক্তৃতা। ভদ্রলোকের কালো মুখের বক্তৃতায় লাল মুখগুলোর কোন ভাবান্তরই দেখা গেল না। ধৈর্যের প্রতিমূর্তি ইংরেজ বক্তৃতাতে

কোন বাধাও দিলো না। বক্তৃতা শেষ হ'লে শুরু হ'লো প্রশ্ন-উত্তর।

তোমরা পারবে নিজেরা দেশ শাসন করতে ?

নিশ্চয় পারবো।

আমরা তোমাদের দেশকে সভ্য করিনি ?

না, তোমরা সভ্যতার অভিশাপ এনে দিয়েচো। আমাদের রক্ত শোষণ করেচো।

তোমাদের দেশে পথ ঘাট করেচি, রেল পথ করেচি।

সে সব তোমাদের শাসন-সুবিধার জন্যে।

আমরা তোমাদের দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করচি।

শত্রু তো তোমরাই।

আমরা চলে এলেও, অন্য কেউ তোমাদের দেশ দখল করবে।

সে তখন দেখা যাবে। তোমাদের তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।

একা নিগ্রো ভদ্রলোক এমনিতর নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্চেন সঙ্গে সঙ্গে। একা অভিমন্যু যেন সপ্তরথী বেষ্টিত। মনে মনে প্রণাম জানালাম নিগ্রো-নেতাকে। তাঁর অবহেলিত দেশের জন্যে, তাঁর মূক-ম্লান জাত-ভাইয়ের জন্যে তাঁর এই প্রচেষ্টা। ইংরেজের সঙ্গে বোঝা-পড়ার পালা আমাদের হয়েচে সাঙ্গ, ওদের হয়েচে শুরু। হে আমার কৃষ্ণকায় ভাইটি, আমার এশিয়ার ভাইটি—সার্থক হোক তোমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম।

হিন্দি বললো, অদ্ভুত জাত এই ইংরেজ। ফরাসী, জার্মান হ'লে এতক্ষণ ওকে এক গুলিতেই সাবাড় ক'রে দিত। আমরাও ছিলাম ফরাসীর অধীনে। প্যারির বুকে দাঁড়িয়ে এমনি ক'রে বক্তৃতা দেবার কথা ভাবাও যায় না।

বললাম, তা ঠিক।

কিন্তু, এই ইংরেজ জাতটা সত্যিই অদ্ভুত। এদের গালাগালি করো, এরা চুপ ক'রে শুনবে; এদের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করো, এরা মুখ টিপে হাসবে; এদের দোষ দেখিয়ে দাও, এরা 'থ্যাংকু' বলবে; কিন্তু এদের স্বার্থে ঘা দাও, এরা তোমার টুঁটি চেপে ধরবে।

ঠিক তাই। ইংরেজের প্রাক্তন-প্রজা আমি সায় দিলাম সঙ্গে সঙ্গে।

বক্তৃতা তখনও চলছিলো। আরো খানিকক্ষণ চলবে। এই হাইড-পার্কের বক্তৃতা একদিনের নয়, দু'দিনের নয়, বহুদিনের। আর বহুদিনের

প্রচলিত ব'লেই ইংরেজ আজও এই ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেচে। এই হাইড পার্কে গড়ে উঠেচে জনমত, ভেঙে পড়েচে জনমত। এখানে বিশ্বের মানুষ তার বক্তব্য বলবার সুযোগ পেয়েচে, ইংরেজ পেয়েচে সে বক্তব্য শোনবার সুযোগ। কাছেই ছ'ফুটী পুলিশ ঘোরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে নানারকম বক্তৃতা : ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধ-বক্তৃতা, এমন কি মন্ত্রীদের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ। কিচ্ছু বলে না। মন দিয়ে শোনে আর উপভোগ করে। কিন্তু ইংরেজের সখ আর সংস্কার দিয়ে গড়া সিংহাসনে যে রাজা বা রাণী থাকেন, তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলো, সঙ্গে সঙ্গে চলো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। ক্রাউনের দিকে ইংরেজের কড়া নজর। রাজাকে তাই এরা পুতুল ক'রে রাখলেও 'পুতু-পুতু' করে জিইয়ে রাখতে ছাড়েনি। সংস্কার। আরে বাপ-ঠাকুর্দা-চোদ্দপুরুষের সময় থেকে রাজামশায় আছেন, আর আমাদের, সময় রাজা ছাড়া চলে কখনো ? ইম্পসিব্‌ল।

হিন্দি বললো : চলো এই হাইড পার্কের ভিতর দিয়ে সর্টকাট করি। যেয়ে পড়বো পিকাডিলির কাছে হাইডপার্ক কর্ণারে।

চলো। যথারীতি সম্মতি দিলাম।

ঢুকলাম হাইডপার্কের ভেতর। বাইরের বিজলী আলো ক্রমে আবছা হয়ে শেষে মিশে গেল কালো অন্ধকারে। গাঢ় অন্ধকার। দু'হাত দূরের জিনিষ দেখা যায় না। দূরে পার্কে লেনের পথের আলো, পার্কের অন্ধকারকে যেন ভেংচি কাটচে ঝকঝকে দাঁত বার ক'রে। লণ্ডনের আলো-বাহারি পথের পাশেই যে এমন আলকাতরি-অন্ধকার থাকতে পারে ভাবাও যায় না। অবশ্য পার্কের এই পথটা যে একেবারেই আলো-বঞ্চিত, তা নয়; তবে জায়গায় জায়গায় সেটুকু আলো থেকে বাকী জায়গায় অন্ধকারকে বাড়িয়ে তুলেচে মাত্র। যেন কৃষ্ণাঙ্গে ধবল-চিহ্ন।

মনে হ'লো আমাদের আগে আগে একটা লোক টপ হ্যাট মাথায় লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেচে। পায়ের শব্দ স্পষ্ট।

হিন্দি বললো : এই অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্চো ?

বললাম : উঁহু। তবে একটা লোক যেন আমাদের আগে যাচ্চে।

বললো : একটু দূরে ডান দিকে কিছু দেখতে পাচ্চো কি ?

না তো ?

দেখচো না, একটা সিগ্রেটের আগুন জ্বলচে আর নিভচে ?

এবার অন্ধকারে চোখ দুটো ভাল ক'রে মেলতেই চোখে পড়লো সিগ্রেটের আলো। বললাম : কি ওটা ?

হিন্দি বললো, ওটা সিগ্রেটেরই আগুন, দেহে আগুন ধরাবার জন্যেই অমন ধকধক ক'রে জ্বলচে।

তার মানে ?

চলো এগিয়ে, বুঝতে পারবে।

কিন্তু একটু এগোতেই দেখি, টপ হ্যাট পরা লোকটি সিগ্রেট-আলেয়ার কাছে দাঁড়িয়ে প'ড়েচে এবং মনে হ'লো কথা বলচে। আর একটু কাছে যেতেই নজরে পড়লো লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট হাতে এক আবছা নারীমূর্তি।

আমরা তাদের পাশ কাটিয়ে চলতে লাগলাম। হিন্দি বললো : বুঝলে কিছু ?

হেসে বললাম : তা বোঝবার বয়েস হয়েচে।

হিন্দি বললো : লণ্ডনের এই হাইড পার্ক দিনে স্বর্গ, রাত্রে নরক।

বুঝলাম, দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী, পলক পলক লহু চোষে।

বললাম, পুলিশ এসব জানে না ?

খুব জানে।

কিছু বলে না ?

কী বলবে ? কত বলবে ? পুলিশ ধ'রে নিয়ে যায় যতগুলোকে হাতের নাগালে পায়। কোর্টে বিচার হয়, ফাইন হয় চল্লিশ শিলিং মানে দু' পাউণ্ড। আইনে এর বেশি ফাইন নেবার নিয়ম নেই। মেয়েগুলো ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ফাইন গুনে দিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে, বলে, ইনকামট্যাক্স দিয়ে এলাম।

আশ্চর্য তো!

আরো আশ্চর্য হতে হ'লো কিছু দূর এগিয়ে। অন্ধকার পথের 'পরে আর একটি লাইট পোষ্ট। এক মুঠো আলো। পার হ'য়ে গেলাম আবার অন্ধকারে। আর একটু এগোতেই আবার সেই সিগ্রেটের আলেয়া।

হিন্দি বললো : কাম্, লেট্স্ গো দেয়ার।

চমকে উঠলাম : বলো কি!

চলোই না ? হাত ধ'রে টানলো হিন্দি : দেশ দেখতে বেরিয়েচো

না? ভয় কি?

পৌরুষে আঘাত লাগলো হয়তো। বললাম: বেশ চলো।

চললাম, তবে এবার হিন্দির পেছনে। হিন্দি সাহস দিলো: ভয় নেই, কিছু খরচ হবে না এসো! বরং সঞ্চয় হবে অভিজ্ঞতা, এসো।

শুকনো গলায় বললাম: চলো।

পথের ধারে গাছের তলায় ছায়া-সুন্দরীর কাছে যেতেই সিগ্রেট হাতে দেহপসারিনী আমন্ত্রণ জানালো প্রথম পুরুষ হিন্দিকে: ইয়েস মাই ডার্লিং!

মধুমাখা সম্বোধনও যে এমন বীভৎস হ'তে পারে, তা জানতাম না। এই উত্তম পুরুষের বুকটা হঠাৎ থম থম করতে লাগলো। হিন্দির কাছ থেকে প্রায় হাত তিনেক পেছিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। পেছনে তাকিয়ে নিলাম একবার। ফাঁকা আর পাকা পথ, চারিদিক কালি-কালো; অতএব হাওয়া হওয়া খুব সোজা। মিশ কালোয় মিশে যাওয়া শক্ত নয়। অতএব মনরে আমার, দেখে যাও ভবের খেলা!—মনকে থাবড়া দিলাম, ঘাবড়াও মৎ!

ইতিমধ্যেই হিন্দি মেয়েটির দেহের দর জিগ্যেস করতে শুরু করেছে। হাউ মাচ্?

সিগ্রেটে একটা টান দিয়ে বললো মেয়েটি: টেন শিলিং।

হিন্দি দুষ্টুমি ক'রে দর কষলো: টু মাচ!

ও, নো মাই ডার্লিং!

আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ। কানটা খাড়া!

হিন্দি বললো, অ' রাইট! লেট'স গো। অর্থাৎ চলো সখি, যাই তব লীলা নিকেতনে।

কিন্তু হাইড পার্কের সখী যা বললো, তাতে রীতিমত 'শক' খাবার কথা। মাটি দেখিয়ে বললো: এই যে ঘাসের বিছানা পাতা।

শুনেই কানটা ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে উঠলো। মাথা গুলিয়ে গেলো। আমরা কোথায়? ইংল্যাণ্ডে? লণ্ডনে? হাইড পার্কে? আফ্রিকায়? বনে? জঙ্গলে?

হিন্দি! হিন্দি! কাম অন। তার কোট ধ'রে টানলাম। চললাম এগিয়ে।

সরি, ম্যাডাম! হিন্দি আমার সঙ্গ নিলো।

বললাম: হিন্দি, আমি অকপটে স্বীকার করছি, তোমার কৃপায় এক

নতুন অভিজ্ঞতাই লাভ করলাম। ধন্যবাদ।

তোমাকে সেই জন্যেই তো এই পথে আনলাম—হিন্দি হাসলো: এদের আলোতে আমাদের ধাঁধাঁ লাগে, অথচ আলোর আড়ালে তাকানো দায়,লজ্জা এসে বাধা দেয়।

সত্যিই, আলোর তলায় অন্ধকার।

ভারি মনেই এসে পৌঁছুলাম হাইড পার্ক কর্ণারে। সেখানে আলোর ছড়াছড়ি, বাস আর ট্যাক্সি, গাড়ি। সভ্য ইংরেজের তাড়াতাড়ি, কর্মব্যস্ততা।

ভারি পায়ে ফিরে এলাম বাড়ি।

মিষ্টি হাসিতে যথারীতি অভ্যর্থনা করলেন মিসেস ল্যাফরকেড। বেশ মনে আছে, সেরাত্রের ডিনারে গল্প জমাতে পারিনি।

কি? আজ চুপচাপ কেন? অসুস্থ?

শুধু বললাম: হুঁ।

কয়েকদিন পরেই হিন্দি আমার হাতে একখানা কাগজ এনে দিলো: হিয়ার ইজ্ এ নিউজ ফর ইউ।

ইংলণ্ডের নাম করা কাগজ নিউজ অব দি ওয়ার্ল্ড' (৭ই নভেম্বর '৫৪) খুলে দেখি বড় বড় হেডিং। উইমেন হু ওয়াক ইন দ্য শ্যাডো। অন্ধকারের মেয়েরা।

পত্রিকাটির নিজস্ব সংবাদ-দাতা মি: নরম্যান রে তাঁর প্রত্যক্ষ বিবরণীতে লিখেছেন:

কিছুদিন আগেও আমি সারা ইয়োরোপ ঘুরেছি। প্যারি, মার্সাই, রটারডাম, বার্সিলোনা, রাইনল্যাণ্ড সর্বত্র গিয়েছি, কিন্তু লণ্ডনের পথে চোখে যে নির্লজ্জতার বেসাতি দেখা যায়—সত্যি বলতে কি তেমনটি আর কোথাও চোখে পড়েনি। লণ্ডনের পিকাডিলি, মে-ফেয়ার কি নরক? এই কি আমাদের সাধের লণ্ডন।

হোম সেক্রেটারী জানিয়েছেন, গত বছর ১০,৩২২ জন দেহ পসারিণীকে পথে দাঁড়িয়ে পুরুষ-আমন্ত্রণের অপরাধে ধরা হ'য়েছে এবং অধিকাংশকেই সর্বোচ্চ জরিমানা করা হ'য়েছে দু'পাউণ্ড হিসাবে। কিন্তু এই জরিমানাতেই কি প্রতিকারের পথ পাওয়া গেছে? না। সরকারের ১০,০০০ পাউণ্ড জমা

হয়েচে বটে, কিন্তু লণ্ডনের পথে-জমা পাপকে পরিস্কার করা যায় নি। কতৃ পক্ষরা বলচেন, ওদের ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। ওদের রাখবার মত অত বড় জেল কোথায়?

তাই দেহপসারিণীরা আজ লণ্ডনের পথে-পার্কে নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্চে। পিকাডিলি সার্কাস, লিঞ্চেষ্টার স্কোয়ার, মে ফেয়ার, শেফার্ড্স্ মার্কেট, কার্জন ষ্ট্রিট, পার্ক লেন, হাইড পার্ক, বেজ ওয়াটার, গ্রীন পার্ক ইত্যাদি জায়গাগুলি পুরুষ-শীকারের লক্ষ্যস্থল। এদের নির্লজ্জ আবেদন এড়াবার জন্যে সস্ত্রীক ভদ্রলোকেদের চটপট পথ ছেড়ে রাস্তায় নামতে হয়, কখনো বা সোজা পথ ছেড়ে ঘোরা পথে যেতে হয়।

একটি ব্লণ্ড মেয়েকে জিগ্যেস ক'রে জানা গেল, সে আর তার বোন এই ব্যবসায় দিব্যি উপায় করচে। তার বয়েস ২১, তার বোনের বয়েস ১৯। তার বোনের উপায় বেশি। দু'মাসে প্রায় ৯০০ পাউণ্ড জমিয়ে ফেলেচে।

আর একটি রূপবতী তো বুক ফুলিয়েই বললো, সপ্তাহে আমার উপায় ৫০ পাউণ্ড।

একটি মেয়ে—১৬ বছর পার হ'য়েচে কিনা সন্দেহ, বিনা ভূমিকায় আমাকে আমন্ত্রণ জানালো: এসো আমাদের ক্লাবে, প্রবেশ মূল্য নেই। অথচ তোমার অমূল্য সময় কাটাবে আনন্দে। আমাদের সেরা সুন্দরীরা অপেক্ষা করচে তোমার মত পুরুষের জন্যেই। শুনে আমি তো হাঁ।

এই ভাবে ঘণ্টাখানেক চলার পথে প্রায় চল্লিশটি পুরুষ-ভোলানীর সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে হ'লো। এ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা বড় শক্ত, বিপজ্জনক, অপমানিত হবার আশংকাও থাকে। অথচ এইভাবে প্রতি রাত্রে ৯টা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত লণ্ডনের পথে পথে এরা জ্বালিয়ে রাখে কামনার আগুন। পতঙ্গের অভাব নেই।

শুধু লণ্ডনে নাকি। এই নিলজ্জতার প্রদর্শনী ইংলণ্ডের প্রায় সর্বত্র; ম্যান্চেষ্টারে, নিউক্যাসলে, লীডস্এ, ক্যাড্রিফে, কোথায় নেই?

হে ঈশ্বর রক্ষা করো।

ইংরেজের এই আর্তনাদ বড় করুণ। প্রায় সারা জগতে সভ্যতার আলো জ্বালানো নিয়ে গর্ব করে যারা, তাদের ঘরেই অন্ধকারে অসভ্যতার চরম বিকাশ। একী জ্বালা? বাইরে যাদের এত দর্প ভিতরে হায় এত অসহায়। এ যেন, এমনি মরদ যার ঘর সামলাবার মুরোদ নেই, পর সামলাবার সখ।

হিন্দি ফায়ার প্লেসের সামনে একটি সোফায় ব'সে 'এভরিবডিজ' এর পাতা ওল্টাচ্ছিল। বললাম, ছাখো হিন্দি, বেশ্যাবৃত্তি আমাদের দেশে পুরাকাল থেকে চলে আসচে। এই ব্যবস্থা অস্বীকার করা মানে মানুষের একটি ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করা। ইংরেজ যদি এই কামনার কামিনীগুলিকে এক এক জায়গায় জড়ো করে রাখতো, তবে হয়তো এমনি ক'রে ছড়িয়ে পড়তে পারতো না। বাড়ির উঠোনের নোংরা জল—ঝেঁটিয়ে পেছনের নর্দমায় চালিয়ে দেওয়াই দরকার ; নর্দমা বন্ধ ক'রে উঠোনে জমতে দেওয়া অস্বাস্থ্যকর।

জানো? আমাদের টেগোরের একটা কবিতা আছে, পঞ্চশরে ভস্ম ক'রে করেচো একী সন্ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েচো তারে ছড়ায়ে। তেমনি যেন বলতে ইচ্ছে করে: কুলত্যাগীদের নাই দিয়ে হায় করেচো একী ইংরেজ, পুরুষগুলোর খাচ্চে মাথা মুড়িয়ে।

রাতের লণ্ডনের আনাচে-কানাচে যেমন বিশ্বেশ্বরীর ছড়াছড়ি, বিশ্বেও তেমনি ছড়িয়ে থাকে পথের ধারে ধারেই। বিশ্বাস্থান হিসাবে চ্যারিং ক্রসের নাম জগৎজোড়া। এই রাস্তাতেই বই বেসাতির বিরাট ব্যবস্থা—'ফয়েল্‌স্'-এর। ফয়েলস্-এর নাম বিদগ্ধজনের অজানা নয়। দু'তিনখানা বাড়ি নিয়ে বিরাট অট্টালিকা। নীচের তলা থেকে উপরতলা তক বইতে ঠাসা। বই আর বই। বই-বই-বাই যাঁদের, তাঁদের একটি পীঠস্থান। ইংরেজী ভাষায় যেখানে যে বই বেরুচ্চে—তার বেশ কয়েক কপি ফয়েলস্-এর তাকে সাজানো। দেখলে তাক লেগে যায়।

বই কেনো আর না কেনো, ঢুকে পড়ো দোকানে—তাকের বইগুলোয় চোখ বুলোতে বুলোতে নীচের তলার সব হলগুলো ঘুরে, লিফটে উপর তলায় যাও; সেখান থেকে তার পরের তলায়—কোন সংকোচ নেই। কারণ অসংকোচে অনেকেই তোমার মত ঘুরে ফিরে দেখচে; কাজেই তোমার চলাফেরা কেউই হাঁ করে দেখবে না।

জ্ঞান। জ্ঞান। জ্ঞান। দু'মলাটে বন্দী হ'য়ে সারি-সারি জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প কাঁধে-কাঁধ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তোমার অপেক্ষায়।

যেখানা ইচ্ছে টেনে নিয়ে দেখতে পারো, দু'চার লাইন পড়তে পারো, দু'চার পাতা শেষ করতে পারো। তারপর তোমার কি আর ইচ্ছে করবে না মনের মত একখানি বই কিনতে? করবে। এবং সেখানা বগলদাবায় ক'রে ক্যাশে গিয়ে দাঁড়াবে, নিজের অজ্ঞাতেই হয়তো বার করবে একখানা পাঁচ শিলিং নোট। বইখানি কিনে বিজয়গর্বে বেরিয়ে এসে দাঁড়াবে চ্যারিং ক্রসের রাস্তার ভীড়ে। আঃ!

এখানে কলেজ ষ্ট্রীটের বই-পাড়ার মত বই থেকে অনেক দূরে কাউণ্টারের বেড়ার এপারে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে হয় না—ওমুক বইটা আছে? কিংবা দিন তো ঐ-ঐ-ঐ-যে বইটা এখানে দিব্যি বইয়ের কাছে মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়িয়ে, তাকে নেড়ে চেড়ে দেখে, তার সঙ্গে ভাবের বিনিময় ক'রে পরে তাকে বগলদাবায় করার ব্যবস্থা। কলেজ ষ্ট্রীটে বইওয়ালারা বলে, বই চাই? এখানে বইবা বলে, আমায় চাই? এখানে, বই আর পড়ুয়ার ভারি ঘনিষ্ঠতা।

ফয়েলস্-এ গেলে যে নতুন বই-ই কিনতে হবে, তার কি মানে আছে? বাইরে ফুটপাথের ধারে তাকে সাজানো, ছড়ানো পুরোনো বই—দাম হিসেবে বিভক্ত, বইয়ের বিষয় হিসেবে নয়। সেটাও ফয়েলসেরই দোকান। তার আশে পাশে পাহারা দেবারও কেউ নেই। কাজেই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে নিঃসংকোচে বই ঘাঁটো, ভালো না লাগলে চলে যাও; আর পছন্দমত বই পেলে দোকানের মধ্যে ক্যাশে গিয়ে দিয়ে এসো দামটা।

আসল কথা, ট্যাঁক ভারি থাকলে ফয়েলস-এর ভেতরে যাও, হাল্কা থাকলে, বাইরে; কিন্তু বই একখানা কেনা চাই-ই। এমনিই ঢালাও ব্যবস্থা ফয়েলস-এর।

আরো যে ব্যবস্থা আছে ফয়েলস্-এর, তা আমাদের বই-ব্যবসায়ীদের কাছে কল্পনাতীত। আমি তো একবার রীতিমত লজ্জা-ই পেলাম।

বেলা তখন দশটা হবে। ক'দিন লণ্ডনের মেঘলা আকাশে, আশ্চর্য, অরুণ-আলোক! সূর্যক্লান্ত ভারতীয় আমি, তবু বিলেতী ঠাণ্ডার ঠেলায় মনটা আমার রীতিমত সূর্যমুখীন! তাই ঘরে ঠাণ্ডা ঘার ক্ষণেক সূর্যের দিকে দিব্যি মুখ ক'রে বসে মন দিয়ে অফিস সংক্রান্ত চিঠিপত্র টাইপ করছিলাম, এমন সময় দরজায় শব্দ হলো—ঠক্ ঠক্ ঠক্।

কাম ইন্!

মিসেস ল্যাফরকেড ঘরে ঢুকলেন। তাঁর দু'হাতে বিরাট একটি প্যাকেট ব্রাউন কাগজে মোড়া।

প্যাকেটটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, হিয়ারস এ প্যাকেট অ'বুকস ফ্রম ফয়েলস ফর্ ইউ, মাই লার্ণেড ফ্রেণ্ড।

ফর্ মি? ফ্রম ফয়েলস্? রীতিমত অবাক হ'লাম: হু, ডেলিভার্ড ইউ?

হোয়াই? পোষ্টম্যান্।

হ্যাঁ, পোষ্টম্যান্ই তো। প্যাকেটের আষ্টে-পৃষ্ঠে ডাকটিকিট মারা। আর তাতে স্পষ্টাক্ষরে আমার নাম-ঠিকানা লেখা।

যাক্, থ্যাংক্স দিয়ে বিদায় করলাম মহিলাকে। অবাক হ'লেও পরম আগ্রহে খুলে ফেললাম প্যাকেটটা। দেখি খান পনের বই। মম, ক্রনিন, হাক্সলি, সিন্‌ক্লেয়ার ও রেমার্ক রচিত একগাদা বই। সব যেন আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো। এই, এলাম আমরা তোমার কাছে।

আচ্ছা, এ কি লজ্জা দেওয়া নয়? আমাদের ব'লে বই মেরে পড়াই অভ্যাস; বড়জোর লাইব্রেরীতে চার-আনা-চাঁদার পড়ুয়া আমরা। চাঁদি খসিয়ে বই পড়া আমাদের ধাতে সয়।

তবে শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা খোলোসা হ'লো। কলকাতার এক প্রকাশক বন্ধু লিখেছিলেন, ইংলণ্ডে গেছেনই যখন, তখন কতকগুলো ইংরাজি বইয়ের অনুবাদ-স্বত্ব আনা কিন্তু চাই-ই; এবং ঐ সব লেখকদের নাম আর বইএর নামও লিখে দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু প্রকাশকদের নাম, ঠিকানাও তো দরকার। কাজেই আমি বই-ব্যবসায়ী ফয়েলস্‌কে একটা পত্র প্রেরণ করেছিলাম, ঐ বইগুলির প্রকাশক-দের নামের আশায়। এই আমার অপরাধ। ফয়েলস্ হয়তো ভাবলে, লোকটা প্রকাশকদের ঠিকানা চেয়েচে যখন, তখন নিশ্চয়ই বই কিনবে। কাজেই কেনই বা ঐ জ্ঞানবান বিদেশী লোকটি বইগুলির জন্যে লণ্ডনের পথে পথে ঘুরে বেড়াবে? বরং বইগুলো সব তাকে পাঠিয়ে দেওয়াই যাক।

আর পাঠিয়ে যদি দেবেই, তো দাও, ভি-পি ক'রে দাও। তা' নয় শুধু রেজেষ্ট্রি ক'রে? আর সঙ্গে শুধু বিলখানা পাঁচ পাউণ্ড পনেরো শিলিংয়ের।

আরে, টাকা যে দেবোই, তার কি কোন মানে আছে? বইগুলো যে মেরেই দেবো না—তারই বা স্থিরতা কি? আমি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির? না, ধর্মপ্রাণ সেণ্টপলস্? না, ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমি—যাঁর ঠিকানা পাওয়া শক্ত নয়?

ফয়েলস্‌রা হয়তো ফুল্‌স্‌।

না। আমাকে ওরা বিশ্বাস করলো, আমাকে ওরা সম্মান দেখালো, ভেবে নিলো, আমি একজন জ্ঞানপিপাসু। সেক্ষেত্রে কোন লজ্জায় সব বইগুলোই ফেরৎ দিই? কাজেই রাখতে হলো খানচারেক বই। বাকিগুলো পরদিন বয়ে দিয়ে এলাম ফয়েলস-এ। প্রতিদিন হাজার হাজার টাকার বই বিক্রী করে যারা—আমি চারখানা বই কিনলাম ব'লে তারা যেন গলে গেল! পঞ্চমুখে ধন্যবাদ জানালো। আর বেরুবার সময় আমার কানে কানে ফয়েলস্ যেন বললো, দেখলে তো, তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, তাই তুমি এলে, কিনে নিয়ে গেলে তোমার মনের মত বই। চিয়ারোও।

জানি, এতটা বিশ্বাস করবার মত স্থান আমাদের সদ্যমুক্ত ভারতে পাওয়া ভার, কাল এখনো বুঝি আসেনি, আর পাত্র পাওয়া বড়ই দুষ্কর। বেশ তো, অমন আচমকা, খামাকা অজ্ঞানকুলশীলকে বই পাঠাবার মত যদি দরাজ দিল্ না থাকে বা ক্ষতি সহ্যের ক্ষমতা না থাকে, তবে আমাদের প্রকাশকরা লোক দিয়ে বাড়ি বাড়ি বই পাঠান না কেন? আলু-পটল, আম-জাম, মাছ-মাংস, বসন-বাসন, কাবলি-মটর, লক্ষ্মীর পাঁচালী—ব্রতকথা সবই যখন বাড়ি-বাড়ি বিক্রী হতে পারে এবং এদেশে কয়েকটি বিলেতী কোম্পানীও যখন বাড়ি বয়ে বই নিয়ে, বই দেখিয়ে কিস্তিতে কিস্তিতে বিক্রী করতে দ্বিধা করেন না, তখন আমাদের দেশী প্রকাশকদেরই বা এত লজ্জা বা মান কেন? এ প্রশ্ন শুধু আমার নয়, প্রমথ চৌধুরীও করে গেছেন।

চ্যারিং ক্রশ রোডে ফয়েলস্-এর বইয়ের দোকানগুলো বুক ফুলিয়ে আছে বটে, কিন্তু তা ব'লে ছোট-মাঝারি বইয়ের দোকানও অনেক আছে নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে। তারাও আপন গরবে কম গরবিণী নয়। তাদের দোকানের বাইরেও বহুৎ পুরোন বইয়ের সারি। সত্যি, চ্যারিং-ক্রশ যেন আমাদের কলকাতার কলেজ ষ্ট্রীট।

তবে কলেজ ষ্ট্রীটের মত চ্যারিং ক্রশেই যে সব প্রকাশকরা গুঁতোগুঁতি করে আছেন, তা নয়। বরং চ্যারিং-ক্রশে খুচরো পুস্তক বিক্রেতাদের দোকানই বেশি। প্রকাশকরা ছড়িয়ে থাকেন যত্রতত্র—এখানে-সেখানে, অলিতে-গলিতে। কী দরকার সদরে থাকা? অসংখ্য লিটারারি-এজেণ্ট বা সাহিত্য-সংস্থা আছেন—সাহিত্যবন্ধু তাঁরা। খবরের কাগজে, রাইটাস ও আর্টিষ্ট ইয়ার বুকে বিজ্ঞাপন দেন। এইসব সাহিত্য সংস্থা। তাই দেখে নতুন লেখকরা তাঁদের কাছে কবিতা, গল্পের বা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাঠান। অভিজ্ঞ তাঁরা, সেগুলি পড়েন, দরকার হ'লে সংশোধন ক'রে দেন, এমন কি লেখার টেকনিকও বাৎলে দেন—অবশ্য পৃষ্ঠা হিসাবে অর্থের বিনিময়ে। শেষে প্রকাশযোগ্য হ'লে সেইগুলি তাঁরা যথাযোগ্য পত্রিকায় বা প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং মনোনীত হ'লে যে মূল্য ধার্য হয়, তা থেকে নিজেদের পারিশ্রমিক কেটে নিয়ে বাকিটা লেখককে পাঠিয়ে দেন। খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিকদেরও এমনতর সাহিত্য-সংস্থা ঠিক করাই থাকে; তাঁদের কোন লেখা ছাপাতে হ'লে, সেই সংস্থার সঙ্গেই ঠিক করতে হয়, লেখকের সঙ্গে নয়।

এই সাহিত্য-সংস্থা থাকায় নতুন লেখকেরা অন্তত দুরবস্থার হাত থেকে রেহাই পান। সম্পাদকরাও, প্রকাশকরাও। লেখক কিছু পয়সা খরচ করলেই শিখতে পারেন লেখার টেকনিক, বুঝতে পারেন তাঁর লেখার দোষ কোথায়; আর সব চাইতে বড় কথা, লেখাটি পকেটে ভরে নতুন ক'নের শ্বশুরবাড়ি যাবার মত দুরু দুরু বুকে লেখককে সম্পাদকের দরজায় দরজায় যেতে হয় না। তাছাড়া ফেরৎ লেখার সঙ্গে 'আপনার লেখার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু প্রকাশ করিতে না পারায় দুঃখিত' ইত্যাদি লেখা সম্পাদকের এক টুকরো ছাপানো ভদ্রতার শেল খাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়াও কি কম কথা?

আর সম্পাদকও বাজে লেখার হাত থেকে বাঁচেন; না প'ড়েই উক্ত স্লিপ আঁটার অপরাধ থেকে রক্ষা পান। প্রকাশককেও অনর্থক মনের মত বইয়ের পাণ্ডুলিপির শীকারে বার হতে হয় না; কাজেই সময় এবং অর্থ দুইই বাঁচে।

বই প্রকাশ করেই প্রকাশক দোকান খুলে বেচতে বসেন না। ক্যাটালগ পাঠান খুচরো 'পুস্তক বিক্রেতা'দের কাছে। তাঁরাই বইয়ের

অর্ডার দেন, কমিশনে বিক্রী করেন। অর্থাৎ পুস্তক প্রকাশকেরা, প্রকাশকই ; বিক্রেতারা বিশুদ্ধ বিক্রেতা।

আসলে দেশটায় লোকেরা কাজকর্ম ভাগাভাগি ক'রে করতে জানে, সব জড়িয়ে নিয়ে জড়ভরত হ'তে চায় না। আর আমরা? হাতে-হাতে কাজ করতে পারিনে, হাতাহাতি করি। তাই যা কিছু করতে হয়, একাই করতে হয়। তাই সব ব্যাপারেই হতে হয় একাই একশো। দশদিক সামলাতে যাই একাই। ভরসা, মা আমাদের দশভূজা।

আজকাল আমাদের দেশে অনুবাদিত বইয়ের চাহিদা বেড়েচে বেশ। ভালোই। প্রকাশকেরাও পরম উৎসাহে অনুবাদের বই প্রকাশ করচেন। তবে অনেক সময় বিদেশী লেখকের অনুমতি না নিয়েই তাঁরা বই ছেপে বার করেন। অথচ বিদেশী প্রকাশককে বা প্রকাশকের মারফৎ লেখককে লিখলে বই হিসেবে ১৫০৲।২০০৲ টাকা দিলেই অনুবাদের স্বত্ব পাওয়া শক্ত নয়। এই সূত্রে 'অয়েল' 'জাঙ্গল' প্রণেতা প্রখ্যাত সাহিত্যিক আপটন সিনক্লেয়ার আমাকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেটি পড়ে আমি কম লজ্জা পাইনি। আর আমার মত সবাই যাতে লজ্জা পান, সেই আশায় চিঠিখানির সারমর্ম তুলে দিলাম এখানে :

প্রিয় মিঃ ঘোষ,

আপনার চিঠি পেয়ে খুবই আনন্দিত হ'লাম। আমার 'অয়েল' পুস্তকের অনুবাদ করবার স্বত্ব মনে হচ্চে, আমি আপনাদের দেশের কোন প্রকাশককে দিয়েচি। যদিও সেই অনুবাদিত বই একখানাও চোখে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। শুনলাম, আমার 'জাঙ্গল' বইও আপনাদের দেশে অনুবাদিত হয়েচে বা হবে। অথচ এখনো আমার কাছে কোন খবরই আসেনি। মিঃ ঘোষ, আপনাদের দেশে আমার কি-কি বই অনুবাদিত হয়েচে যদি জানান তবে বিশেষ উপকৃত হই।

আপনার
আপটন সিনক্লেয়ার

আমাদের বইয়ের বাজারে অনুবাদ বইয়ের যেমন ছড়াছড়ি, ইংলণ্ডেও তাই। কোনো দেশে কোনো ভালো বই প্রকাশিত হলেই

ইংরেজ সেটি নিজের ভাষায় ভাষান্তরিত ক'রে নেয়; অবশ্য অনুমতি না নিয়ে অনুবাদের কথা তারা ভাবতেও পারে না। তবে ইংরেজের সাহিত্যিক শ্বেত-দৃষ্টি ইয়োরোপের শ্বেত-সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এশিয়ার সাহিত্যও যে শ্বেতবরণীর কৃপাধন্য—সে কথা ইংরেজ হয়তো জানে না, কিংবা জেনেও না জানার ভান করে। বিশেষ ক'রে এশিয়ার সাহিত্য নিয়ে যে সব এশীয় লেখকদের লেখা বই আকারে ইংরেজের দেশে প্রকাশিত হ'য়েচে, সেগুলি খোদ ইংরেজী ভাষাতেই লেখা। কাজেই সেগুলিকে মাতৃভাষান্তরিত করবার দায় থেকে ইংরেজের নেই। হয়তো এ ধারণাও হ'য়েচে, এশিয়ার বিদগ্ধজন জ্ঞানগর্ভ কিছু লেখেন যখন, তখন তাদের ভাষার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই বুঝি।

অথচ এশিয়ার মধ্যেই একবিন্দু দেশ—বাংলা দেশ অন্য বিষয়ে না হোক সাহিত্যে যে কতদূর এগিয়ে গেচে, সে ধারণা ইংরেজ কেন, অনেকেরই নেই। এজন্যে আংশিক দায়ী আমরাও। আমাদের সাহিত্যের রত্ন-ভাণ্ডার, আমাদের সিন্দুকে ভ'রে রেখেই খুশী। আমাদের রসের ভাঁড় আমরাই আগলে ব'সে আছি—গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি। কিন্তু রসিক যাঁরা তাঁরা রসের খবর পেয়েও কখনো চুপ ক'রে থাকে? তাই ভারতেরই অন্য প্রদেশী-রসিকরা চুপি সারে হাত বাড়িয়ে হাতিয়ে নিচ্চে বাংলার সাহিত্য-রস।

ইয়োরোপ কিন্তু সেই যে বিশ্বকবির বঙ্গামৃত বিদেশী পেয়ালায় পান ক'রেছিল—তাতেই হয়তো আজো তৃপ্ত। কিংবা এ-যুগের বঙ্গামৃত-ভাণ্ডের খবর তারা পায়নি। আমাদের উচিত, আমাদের রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-সাহিত্য ইংরেজী ভাষান্তরিত ক'রে—ইংরেজের সামনে এগিয়ে ধরা। সে সব অনুবাদ কোন বাংলা জানা ইংরেজের হাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে অনুবাদটা ইংরেজের ইংরেজীতেই হবে—ইংরেজের পক্ষে রসাস্বাদনে হবে সুবিধে। আমাদের ভাব আর ওদের ভাষা দিয়ে যে অনবদ্য অনুবাদিত সাহিত্যের সৃষ্টি হবে—তা বিদেশীরা অন্তত উপেক্ষা করতে পারবে না। নোবেল প্রাইজের যোগ্য সাহিত্যের অভাব নেই আমাদের সাহিত্যের ভাণ্ডারে—অভাব উৎসাহের। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের লিটারারি এজেণ্টদের বা সাহিত্য-সংস্থাদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে আর সাহায্য করতে পারেন ইংলণ্ডের ভারতীয় হাই কমিশনারের দপ্তর।

রাশিয়া যদি এই পথে অগ্রসর হ'তে পারে, তবে আমাদের সুপরিচিত ইঙ্গ-আমেরিকার গোষ্ঠিরা কেন চোখ-কান বুজে আছে? তাদের বারুদে-হৃদয়কে সূক্ষ্ম-সুন্দর রসধারায় ধুইয়ে দেওয়ার ভার কিন্তু আমাদেরই।

এই সূত্রে এক ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে যে সব আলোচনা হয়েছিল, তা এখানে বলা মন্দ হবে না। ভদ্রলোকের নাম মিঃ হেপওয়ার্থ। গেছলাম ৭০৪ নং রুটে গ্রীন লাইন কোচে চেপে উইণ্ডসর ক্যাসল দেখতে। উইলিয়ম দি কংকারার এই দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইংরেজের মতে এটি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বৃহৎ এবং রাজকীয় দুর্গ। রাণীও মাঝে মাঝে এসে থাকেন এখানে। দেখলাম ঘুরে ঘুরে সব: দ্বিতীয় চার্লস যে ঘরে মারা গেছলেন, রাজাদের শোবার ঘর, ড্রইং রুম, ড্রাইনিং রুম, ক্লোজেট—আরো কত কি। কিন্তু আগ্রা-দিল্লীর বাদসাহী-দুর্গ-দেখা-চোখে, সত্যি বলতে কি, চোখে ধরলো না কিছুই। তবে হ্যাঁ, এই ইংরেজের দুর্গে খাট পালংক, আসবাব পত্র, ছবি, আর্শি ইত্যাদি চমৎকার করে সাজানো। আগ্রা-দিল্লী-দুর্গের দুর্ভাগ্য,—আমাদেরও—বাদশাহী আমলের আসবাবপত্রের বেশীর ভাগই আজো ইংরেজের যাদুঘরে রাজার হালে বন্দী। বাদশাহী দুর্গের দুর্গতি ঢাকা পড়ে শুধু অপূর্ব কারুকার্যের জৌলুসে। একদা সুন্দরী বৃদ্ধা যেন বলে, ওরে, আমারো যৈবন ছিল, দেহে রূপ ছিল, প্রাণে গান ছিল।...তা' ছিল।

অনেক কিছুই ছিল, এখনো অনেক কিছুই আছে। তবে যা আছে, তা আমরা গুছিয়ে রাখতে জানিনে, দেখাতে জানিনে। নইলে কি নেই আমাদের? আছে বাঘ, অজন্তা, ইলোরা, এলিফাণ্টা বা খাজুরাহো, কোনার্কের রূপময়ী ভাস্কর্য। আছে বাস্তব ও কল্পনার তাজমহল, দাক্ষিণাত্যের ছন্দময় মন্দির। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেও ভারত অফুরন্ত। আছে ভূস্বর্গ কাশ্মীর, তুষারমৌলী হিমালয়, সুন্দরী পাহাড়ী সহর সিমলা, নৈনিতাল, শিলং, দার্জিলিং। বম্বে-মাদ্রাজের বিস্তৃত সমুদ্রতীর, মধ্যপ্রদেশের মার্বেল রক; তাছাড়া, পূর্বকীর্তি মহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা, নালন্দা, সারনাথ আছে দেখবার। রাজপুতানায় মরুভূমি, আসামের ঘন জঙ্গল, বাংলার প্রমত্তা নদী পদ্মা, উত্তর ভারতে পবিত্র গঙ্গা নদী ··কি নেই, কি নেই?

কিন্তু সব থেকেও যেন কিছু নেই। দেখাবার ব্যবস্থা নেই, দেখবার প্রাণ নেই। সব নোংরা হ'য়ে আছে, যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই, দেখাবার

লোক নেই। ভারত অনেক কিছু দেখিয়ে, বেশ কিছু দক্ষিণা আদায় করতে পারে বিদেশীদের কাছ থেকে—কিন্তু এখনো ভালো ক'রে মন দেয়নি সেদিকে। আর এরা? নিজের দেশে একটু কিছু ঐতিহাসিক গন্ধ পেলে হয়। তাকে ঝেড়ে-ঝুড়ে, সাজিয়ে-গুছিয়ে বই-ছবি ছাপিয়ে, গাইড-কণ্ডাক্‌টেড টুরের ব্যবস্থা ক'রে বুক ফুলিয়ে নিজের জিনিষ দেখায় বিদেশীকে আর পকেটে ভরে বিদেশী মুদ্রা। আমাদের ভারত যেন শতচ্ছিন্ন ঘাঘরা পরা কাশ্মীরী রূপবতী আর এই ইংরেজের দেশটা সাধারণ রূপের অতি চটকদার মেয়ে।

ইয়োর্ বুক প্লীজ।

সরি। থ্যাংকু।

একমনে ক্যাসল্ দেখতে দেখতে কখন যেন সদ্য কেনা উইণ্ডসর ক্যাসলের গাইড বইখানা বগলদাবা থেকে খ'সে পড়ে গেছে মাটিতে, আমার হাতে তুলে দিলে এক ইংরেজ। ইনিই মিঃ হেপওয়ার্থ। গাইড বই-খানার পতনের সুযোগ নিয়ে আমাদের আলাপের পত্তন হলো। ভদ্রলোক বার্মিংহামের কাছে একটি সহরে গ্রামার স্কুলের শিক্ষক। ঝোঁক তাঁর ইতিহাস আর সাহিত্যে। আমার গায়ের রং তাঁকে আকর্ষণ করেছে এবং আমি ইণ্ডিয়ান জেনে, বেশ বোঝা গেল, ভাবে বিগলিত হ'লেন তিনি।

একসঙ্গেই ক্যাসল দেখা শেষ হ'তেই মিঃ হেপওয়ার্থ বললেন, কাছেই টেমস, যাবে? বেশ চমৎকার জায়গা।

বললাম, চলো!

উইণ্ডসর সহরটি ছোট্ট, চমৎকার-ছিমছাম, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। ক্যাসলের গা ঘেঁসে একটা রাস্তা নেমে গেছে টেমসের ধারে। শান্ত-নির্জন পরিবেশ। তরতর ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে সরু টেমস নদী। ধারে ধারে সবুজ ঘাসের আস্তরণ। একটি ঢালাই পুল টেমসের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে, যেন রাণীর মাথায় মুকুট। একদল রাজহাঁস গায়ে গা ঘেঁসে ভেসে বেড়াচ্ছে আপন খেয়ালে।

মিঃ হেপওয়ার্থ বললেন, এসো বসি, ঐ বেঞ্চে।

টেমসের ধারে ধারে বেঞ্চ পাতা, মাঝে মাঝে ল্যাম্প পোষ্ট, ফাঁকে ফাঁকে ফুলের গাছ। বসলাম দু'জনে।

ব্যবসায়ী ইংরেজ খদ্দের পেলে মুখ খোলে, সাধারণ ইংরেজ নিজের

ড্রইংরুমে মুখ খোলে আর ছাত্র পড়ানো ইংরেজ বোধহয় বিদেশী দেখলে মুখ খোলে। হেপওয়ার্থ মুখ খুললেন প্রাণ খুলে। আমি ঠেক্‌নো দিতে লাগলাম।

জায়গাটা কেমন দেখচো? —বেশ।

তোমাদের দেশটাও তো চমৎকার। —হ্যাঁ।

তোমাদের দেশে যাবার আমার ইচ্ছে ছিল। —গেলে খুশী হবো।

আচ্ছা, আমাদের উপর তোমাদের রাগ নেই? —না। ছিল তোমাদের শাসকের উপর। তোমরা মানে-মানে ভারত ছেড়েচো, তাই মনে মনে প্রশংসাই করি তোমাদের।

জেনে ভারি খুশী হ'লাম। ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে চ'লে আসায়, এখানে বহু ইংরেজ বিক্ষোভ জানিয়েছিল। —জানাবারই কথা। বাড়া ভাতে ছাই যে!

তবে অনেকেই ভারতের স্বাধীনতাকে সমর্থন করেছিল। —তুমি নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে।

যদি বলি হ্যাঁ, মিথ্যে বলা হবে না। তবে এবারকার যুদ্ধে আমাদের সত্যিই শক্তিক্ষয় হ'য়েচে, শক্তি গেছে কমে। —তা ঠিক।

ফ্যাক্‌ট ইজ ফ্যাক্‌ট। উপায় কি? —সত্যিই তো।

দোষ আমাদের গভর্মেণ্টের। —কেন?

যদি জার্মানীকে বাড়তে না দিতো, তবে অতটা বাড়তো কি হিটলার? —তা তোমরা আগে থাকতেই হিটলারকে সায়েস্তা করলে না যে?

আমাদের পার্লামেণ্টের কর্তারা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চেয়েছিলেন। —কী রকম?

ভেবেছিলেন হিটলার তার বন্দুক রাশিয়ার দিকে বাগিয়ে ধরবে। সেই ধরলোও, তবে আগে বাগিয়ে ধরলো আমাদের দিকে। —তবে আর কিছুদিন বাগিয়ে ধরলে মুস্কিলই হ'ত তোমাদের।

তা যা বলেচো। ঈশ্বর ইংলণ্ডকে বাঁচিয়েছেন। —ঈশ্বর ইংলণ্ডকে ভালবাসেন।

কী রকম?—তোমাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ইতিহাসে দেখেচি, এই 'গেল-গেল' করতে-করতেও বেঁচে গেছ তোমরা।

তোমার দেখছি আমাদের বিষয়ে জানা আছে। —আমি কেন? আমার মত অনেক ভারতীয়ই তোমাদের ইতিহাসে ওয়াকিবহাল।

কারণ? —তোমাদের ইতিহাস আজো আমাদের স্কুল-কলেজে পাঠ্য।

তাই নাকি? —হ্যাঁ। আমাদের তো জানা দরকার, কারা আমাদের দেশটাকে দুশো বছর ধরে শাসন করলো।

অথচ আমাদের দেশের লোকেরা দুশো বছরেও তোমাদের চিনলো না। —চেনবার চেষ্টা করলো না; তোমাদের শাসকরা কিন্তু হাড়ে-হাড়ে চিনতো আমাদের।

যাক্, যুদ্ধ আমাদের একটা উপকার করেছে। তোমাদের আমরা বন্ধু হিসেবে পেয়েছি। —ভালো ব্যবহার পেলে আমরা তোমাদের বন্ধু হ'য়েই থাকবো।

তবে একটা বড় অপকার হয়েছে, আমাদের। —কি?

আমেরিকার তাঁবেদারী করতে করতে প্রাণটা গেল। —কি করবে বলো? যে প্রাণ বাঁচায়, তাকে প্রাণপণে সেবা করাই ধর্ম।

কিন্তু এভাবে পুতুল-নাচা অপমানকর। —বলো কি? তোমাদের দু'টি ভাইয়ে খুবই ভাব—আমরা তো তাই জানি।

ঐ বাইরে থেকেই। বড চাকরে ভাইয়ের সঙ্গে বেকার ভাইয়ের যেমন ভাব, তেমনি। —হুঁ!

যাই বলো, তোমরাই কিন্তু এখন পৃথিবীর আশা, ভরসা। —বলো কি? একটু বেশি প্রশংসা করা হচ্ছে নাকি?

না, না। তোমরা আমেরিকার ফাঁদে পা দাওনি, রাশিয়ার কাঁধে কাঁধ মেলাওনি। তোমাদের নিজস্ব একটা মত আছে, শান্তির পথ বেছে নিতে পেরেছো তোমরা। —অন্তত চেষ্টা করচি।

আমি তোমাদের মিঃ গ্যাণ্ডিকে দেখিনি, তবে মিঃ নেহেরুকে দেখেছি! ওয়াণ্ডারফু! —অথচ তাঁর নিন্দা তো তোমাদের প্রায় কাগজেই।

ও, ছাটস্ পলিটিক্স্! ওদের কথা বাদ দাও। —তোমার মত যদি সব ইংরেজ এই রকম বোঝে, তবেই তো!

যারা বোঝবার তারা ঠিকই বোঝে। —তবে ক'জনই বা চেষ্টা করে। তাই তো আমাদের দেশের বিষয়ে আজও তোমরা অজ্ঞ।

আমার কিন্তু তোমাদের বিষয়ে খুবই জানতে ইচ্ছে করে। —তা হ'লে

আমাদের ভাষা শিখতে হবে, আমাদের সাহিত্য পড়তে হবে। আমরা মায়ের পেট থেকে প'ড়েই এ-বি-সি-ডি শিখি, তোমাদের সাহিত্য পড়ি, তাই তোমাদের হাঁড়ির খবর জানতে পারি।

রাইট। জানো, আমি তোমাদের টেগোরের গীতাঞ্জলি ইংরেজীতে পড়েছি। চমৎকার। —তাতে তুমি আমাদের আধ্যাত্মিক দিকটা পেয়েচো। কিন্তু আমাদের সুখ, দুঃখ, আশা-আকাংখার বিষয়ে জানতে হ'লে পড়তে হবে আমাদের গল্প, নাটক, উপন্যাস।

আমি 'কিম' পড়েচি, 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' 'ভওয়ানী জাংশন' পড়েচি, তোমাদের দেশের গল্প। —ও সব তোমাদের লেখা গল্পে আমাদের আসল রূপ পাবে না। তোমরা আমাদের রান্নাঘরে ঢুকতে পারলে, তবেই তো আমাদের হাঁড়ির খবর পাবে।

তা হ'লে উপায়? —আমাদের সাহিত্য ইংরেজীতে অনুবাদ হওয়া দরকার। এ বিষয়ে দু'পক্ষেরই চেষ্টা করা উচিত। আমরা তোমাদের সাহিত্য এবং অন্য দেশের সাহিত্যও তোমাদের ভাষার সাহায্যে অনুবাদ করেচি। সেকস্‌পীয়ার, ডিকেন্স, ওয়েলস্‌, লরেন্স, মম, ক্রনিন, টি,এস, ইলিয়ট—

—টি, এস, ইলিয়ট করেচো? আশ্চর্য তো। আমাদের এ যুগের নামী কবি। তবে আমার কিন্তু অস্পষ্ট মনে হয়। কেমন দুর্বোধ্য। আজকাল আমাদের কবিতায় এই এক হাওয়া বইচে। সোজা কথা, ঘুরিয়ে বলা। আমাদের ফগি-ওয়েদারের মতই ধোঁয়াটে, জলো, ঠাণ্ডা। মানে বুঝিনে, মন তাই সাড়া দেয় না। অবশ্য এই ধোঁয়া কাটিয়ে মনকে ছোঁয়া দেবার মত কবিতার জন্যে আন্দোলন চলচে। শেলী, কীটস্‌, বাইরন, টেনিসন পড়লে মন ভ'রে ওঠে, ভারি হয়ে ওঠে না।

আমি চুপ। ঘুরিয়ে দিলাম কথা: এ যুগের কথা-শিল্পীদের মধ্যে কে তোমার প্রিয়?

—লরেন্স। অপূর্ব তার ভাব, ভাষা, ভঙ্গী। মম্‌ তার কাছে কিছু নয়।

ইংরেজের অসির খবর জানি, মসীর খবরও রাখি। কিন্তু তাদের যে মানদণ্ড দিল দেখা রাজদণ্ডরূপে পোহালে সর্বরী—সেই মানদণ্ডের ব্যাপারটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। এই ব্যবসাবুদ্ধির তাগিদেই ইংরেজ

ভারতে পা দিয়েছিল, কিন্তু পাকেচক্রে প'ড়ে বেনে ব'নে গেল রাজা। কিন্তু আজো ইংরেজ পৃথিবীতে বাজার খুঁজতে ব্যস্ত, রাজার সিংহাসন নয়। বেনে ইংরেজ বেশ জানে, সাম্রাজ্যে নয়, বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী।

ব্যবসায় যে সততা আর ভদ্রতা থাকা দরকার—ইংরেজের তা আছে মজ্জায়-মজ্জায়; আর আছে বলেই আজো তারা মানদণ্ড ধ'রে রেখেছে সসম্মানে; অথচ রাজদণ্ড খ'সে পড়চে একে-একে হাত থেকে।

বিলিতী পত্রিকায় পুরো পৃষ্ঠার সব বিজ্ঞাপন দেখে আর ভারতের মাটিতে বিলিতী অফিসের বিরাট-বিরাট বাড়ী দেখে সত্যিই মনে হয়, ইংরেজের দেশে সর্বত্র বৃহৎ শিল্পের ছড়াছড়ি আর ইংরেজ ব্যবসাদার মানেই বুঝি বিরাট কিছু। কারণ, বড় বড় বিলেতী অফিসের চোখ-ধাঁধাঁনো বড় বড় সাহেব দেখে-দেখেই মন আমাদের কুঁকড়ে থাকে। অবশ্য বৃহৎ শিল্প ইংলণ্ডে আছে বহুৎ এবং তারাই শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দেয় পৃথিবীময়; তা ব'লে অল্প-পুঁজির কারবারও কম নেই।

বহু পত্রিকায় পুরো পাতা ক'রে বিজ্ঞাপন দেখেচি যাদের, তাদের খোঁজে গিয়ে দেখেচি, বিরাট একটি বাড়িতে ছোট্ট দু'টি ঘরে তাদের অফিস। এমনও বহুৎ অফিস আছে যার ষ্টাফে মাত্র দু'তিনটি প্রাণী: প্রোপাইটর নিজে, লেডী-টাইপিষ্ট আর একটি বা দুটি সেলসম্যান; এবং একটি টেলিফোন। অনেকের বয়-বেয়ারার পর্যন্ত বালাই নেই। অথচ এই নিয়ে চলে তাদের পৃথিবীময় কেনা-বেচার পালা: এক্সপোর্ট ইমপোর্টের কাজ, অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ, শিপিংয়ের কাজ। চিঠি-চাপাটি বা বিজ্ঞাপনের সাহায্যে ইংরেজ খদ্দের যোগাড় করে আর খদ্দেরকে খুশী করবার ভার নেয় সেলসম্যানরা।

ইংরেজ ব্যবসাদার মাত্রেই যে রুই-কাতলা জাতীয় নয়, চুনো-পুঁটি ব্যবসাদারও আছে অনেক এবং তারা ভদ্রতা ও সততাকে মূলধন ক'রে জাঁকিয়ে বসে ব্যবসা করচে—এই খবরটুকু আমাদের দেশের 'হায়-কি-করি' লোকেদের মনে যদি আশা ও উৎসাহ জাগায়, তবেই আমার এই খবরটুকু দেওয়া সার্থক হবে।

অনেক অফিসে, বিশেষ ক'রে নাম করা অফিসগুলিতে আবার অন্য রকম ব্যবস্থা। অফিসে টেলিফোনের এক্সচেঞ্জ-বোর্ডের সুন্দরীকে স্লিপের সাহায্যে নিজের নাম-ধাম-উদ্দেশ্য জানালে সে সেই খবর টেলিফোন মারফৎ যথাযোগ্য

লোককে জানিয়ে দেয়। আর সে সময়টুকু ওয়েটিং রুমে ব'সে টেবিলে সাজিয়ে রাখা ম্যাগাজিনগুলো পড়া ছাড়া উপায় নেই। তারপর আপনার বাঞ্ছিত ভদ্রলোক এলে তাঁর সঙ্গে কাজ সেরে চলে যাওয়া। অর্থাৎ ওয়েটিং রুমের পার্টিসনের ওপারে কারা আছেন, কতজন আছেন, কেমন আছেন তার কিছুটি জানবার উপায় নেই।

হুট্‌হুট করে অফিসে ঢুকে পড়া, কিংবা বাড়ীতে দেখা-সাক্ষাতের অসুবিধে ব'লে অফিসে গিয়ে একটু গাল-গল্প করা ইংরেজ ভাবতেও পারে না। ইংরেজ তাই অফিসে সোম-শুক্র যে পাঁচটা দিন ঘড়ি-ধরে কাজ করে—সলিড কাজই করে। অথচ সাড়ে পাঁচদিন কাজ (?) ক'রে এবং নিয়মিত ওভারটাইম করেও কাজ আমাদের এগোয় না।

টেবিল-চেয়ারে ব'সে কলমে ফোনে যে সব অফিস কাজ করে, তাদের ওখানে গিয়ে যেমন দিব্যচক্ষু খুলে গেল আমার, তেমনি অনেক ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ণে গিয়েও দিব্যজ্ঞান লাভ করা গেল। ইংলণ্ডে বড়-বড় ফ্যাক্টরীর অভাব নেই, দেখেছিও। কিন্তু ফ্যাক্টরী দেখবার স্বপ্ন নিয়ে গিয়ে যে বাস্তবের সম্মুখীন হ'তে হয়েচে আমাকে, তা আমাদের দেশের কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠানরা জানলে তাদের মনে বল ভরসা বাড়বেই।

কোন এক রিবিল্ট-মেসিনারী কোম্পানীতে গিয়ে দেখি, প্রোপ্রাইটর সার্টের আস্তিন গুটিয়ে কালি-ঝুলি মেখে একটি বয়কে নিয়ে মেসিন মেরামতে ব্যস্ত। ঘরে ছোট একটি লেদ, ড্রিলিং মেসিন, শান মেসিন—ব্যস্। কলকাতার ধর্মতলা ষ্ট্রীটের দু'ধারে অমন কারখানা কতই না চোখে পড়ে। হেনলী-অন-টেমসের একটি এয়ার-কণ্ডিশনিং প্ল্যাণ্টের কারখানায় গেছলাম তাঁদের আমন্ত্রণে। ট্রেণ থেকে নেমে, ঠাঁট বজায় রেখে ট্যাক্সি চেপে গিয়ে দেখি পাড়ার মধ্যে গলিতে খোলা জায়গায় একটি কটেজে সেই সুবিখ্যাত কারখানাটি। কারিকর রয়েচে তিনজন আর ইঞ্জিনিয়ার খোদ কর্তা নিজেই। অবশ্য, টাইপিষ্ট-সুন্দরী আছেন একজন চিঠি-চাপাটির জন্যে। ব্যবসার কথা-বার্তার ফাঁকে-ফাঁকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করতে লাগলাম এই অল্প-পুঁজির কারবারীর ব্যবসা করার পদ্ধতিটা।

কর্তা বললেন, এই যে দেখচো ক্রিং ক্রিং ফোন যন্ত্রটি—এটি একাই একশো। আমার ষ্টক-লিষ্ট ছাপাতে হ'লে ঐ রিসিভার তুলে ডুপ্লিকেটিং

কোম্পানীকে ডাকি, ক্যাটালগ ছাপাবার জন্যে প্রেসম্যানকে ডাকি, বিজ্ঞাপনের ভাষা-লেআউট তৈরী ক'রে কোন কোন কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার সে ভার দিই আমার এডভারটাজিং এজেণ্টকে। আমার মাল প্যাক ক'রে দেয় প্যাকিং কোম্পানী, মাল দেশ বিদেশে পাঠায় আমার শিপিং এজেণ্ট। আর, কর্তাটি নেহাৎই সরল, তাই বললেন, টাকার দরকার হ'লে টাকা পাই ফাইন্যান্স কর্পোরেশন থেকে। এই সব কাজের আমার প্রধান সেক্রেটারী হচ্ছেন এই টেলিফোন যন্ত্রটি। আসল কথা, আমি মাথা ঘামাই আমার এয়ার কণ্ডিশনিং প্ল্যাণ্টের উন্নতির জন্যে আর আমার ব্যবসার উন্নতির জন্যে মাথা ঘামাবার ভার দিয়েচি—যারা যে বিষয়ে মাথা ঘামাতে অভ্যস্ত তাদের উপর! নইলে তুমিই বলো, সব দিকে মাথা ঘামানো যায়?

বুঝলাম, সেই হাতে হাতে কাজ করার ব্যবস্থা।

মিঃ গস্, আমি আজ একটা অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেচি।

কী? কী?

ডিনার টেবিলে মিসেস ল্যাফরকেড যে অন্যায় কাজটির উল্লেখ করলেন, তাতে বিরক্ত না হ'য়ে বরং সত্যি কথা বলতে কি, মনে মনে খুশীই হ'লাম।

মিসেস ল্যাফরকেড বললেন, বিকেলে তোমার ঘর গুছিয়ে টেবিল পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি, তোমার হাতে লেখা ইংরেজি কবিতা। প্রথম কবিতাটি পড়তে গিয়ে, শেষ পর্যন্ত সব কবিতাগুলোই প'ড়ে ফেললাম। রাগ করলে তো?

মিঃ ল্যাফরকেড বললেন, তা রাগ করবারই তো কথা।

হেসে বললাম, ছাখো তোমাদেরই একটা প্রবাদ আছে, প্রেমিক, ভ্রমণকারী আর কবিরা নিজেদের কথা শোনাবার জন্যে টাকা দিতেও রাজী।

ব্যাঙ্কের অফিসার ফরাসী ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন, বটে! তবে তো তুমি মিঃ গসের কাছ থেকে টাকা দাবী করতে পারো।

মিসেস ল্যাফরকেড থামিয়ে দিলেন স্বামীকে : ডোন্ বি সিলি মাই ডার্লিং।—আমাকে বললেন, যদি মনে না করো, তবে একটা অনুরোধ—

বলো।

আসচে শনিবার সন্ধ্যায় আমার এই হ্যাণ্ডসাম হাজব্যাণ্ডের বার্থডে সেলিব্রেসন হবে। আমাদের বন্ধু-বান্ধবীরা ঐদিন আসবে। তুমি যদি ঐদিন তোমার ঐ কবিতাগুলি—

মি: ল্যাফরকেড যেন লুফে নিলেন তাঁর পতিব্রতা স্ত্রীর কথা : আ, ইট'ল বি এ নাইস এনটারটেনমেণ্ট। উইল'উ মি: গস্—

আর মি: গস। এ কী গেরো। ঐ অতগুলো ইংরেজের সামনে তাদের ভাষায় কবিতা পড়বো! কী কুক্ষণেই খেয়াল হ'য়েছিল, আমার 'নতুন মিছিল'এর কবিতাগুলিকে ইংরেজিতে তর্জমা করবার; তাই ইয়োরোপে ঘোরবার সময় রাত্রে বিছানায় শুয়ে নিজের খেয়ালেই কলম চালিয়েচি। অবশ্য, মনে মনে আশা ছিল, ইংল্যাণ্ডে যাচ্চি, হয়তো কোথাও আমার কাব্য-বাণী শোনাবার সুযোগ পেয়ে যেতেও পারি। আজ অতর্কিতে সুযোগ পেতেই, মনে যেন ভরসা পেলাম না।

হ্যাঁ গা, মিসেস ল্যাফরকেড, বলি, কবিতাগুলি যে পড়লে, কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে কি?

পারলাম বৈকি। আর পারলাম ব'লেই তো সবগুলোই প'ড়ে ফেললাম।—এবং আরো যা-যা তিনি বললেন, তা আর ব'লে কাজ নেই, লজ্জা ব'লে তো একটা কথা আছে।

মি: ল্যাফরকেড বললেন : কবিতাগুলো অরিজিন্যালি ইংরেজিতে লেখা, না, তোমার ভাষায় লেখা?

বললাম : বাংলা ভাষায়, পোয়েট টেগোরের ভাষায়—

ইজ ইট্। তুমি তোমার টাংয়ে আগে কবিতাগুলো প'ড়ো, পরে ইংরেজীতে। হ্যাঁ?

বললাম : আমারও তাই ইচ্ছে।

আমার ইচ্ছে পূর্ণ হলো, পরিপূর্ণ হলো। ডাইনিং রুমের বড় হলটায় ডিনার টেবিলে মিসেস ল্যাফরকেড অতিথিদের সামনে পরিবেশন

করলেন নানারকমের খাদ্য-সামগ্রী আর আমি সেই সঙ্গে বিতরণ করলাম আমার কাব্য-রসধারা। বাংলার খেজুরের রস বিলিতী ডিকেণ্টারে সার্ভ করা গেল, আর আশ্চর্য, তাঁরা তাই পান ক'রে সোচ্ছ্বাসে বললেন, বা: ! চমৎকার !—আর কবিতা-পাঠের শেষে আমার প্রতি তাঁদের আন্তরিকতা আর ঘনিষ্ঠতা দেখে অন্তত এইটুকু বোঝা গেল, এঁদের এই মন্তব্যগুলি নেহাৎ মৌখিক নয়। একটি তরুণী তো তখনই দু'টি কবিতা কপি ক'রে নিলেন এবং জনৈকা ভদ্রমহিলা বায়না ধরলেন, আসচে উইকে শনিবারে যদি তাঁর সঙ্গে চা পান করি এবং কবিতা চর্চা করি, তবে অত্যন্ত সুখী হবেন। সুখী হয়তো আমিও হ'তাম, কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই জানাতে হ'লো, হে মহিয়সী মা'ম ! পরশু বিকেলে আমার স্কটল্যাণ্ড যাওয়া ঠিক। কাজেই তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করা গেল না ব'লে সত্যিই আমি দুঃখিত। তবে আমার দু চারটি কবিতা পাঠিয়ে দেবো কাল, সেই সঙ্গে আমার একটি ছবি। সেই তো হবে ভালো ! রাজী ?

রাজী ! ঘাড় হেলিয়ে জানান দিলেন তিনি।

এই সুযোগে আমার কবিতাগুলো কপচে আরো দু'দশ পাতা লেখা যেতো। কিন্তু মাটির ভাঁড়ে নল ঢুকিয়ে রস-খাওয়া বাঙালীকে ডিকেণ্টারে রস খাওয়ানো বিড়ম্বনা ! তাছাড়া আপনা-গানা শুরু হ'লে ছাড়া বড়ই শক্ত। অতএব কলমের রাশ্ টানা যাক।

সারা ইংল্যাণ্ড ঘোরাবার জন্যে ইংরেজদের অনেক রকম ব্যবস্থা। ট্রেনে যাও, মোটরে যাও, প্লেনে যাও, জেগে যাও, ঘুমিয়ে যাও, ক্লাবে হোটেলে থেমে যাও—তোমার যেমন খুশি তেমনি যাও এবং সেই হিসেবে টাকা দাও—ব্যস। এমন কি, সামান্য কিছু এখন দিয়ে বাকীটা বেড়িয়ে এসে কিস্তিতে দিলেও চলবে। অবশ্য, কোথাও তোমার ইচ্ছামত থাকা বা না-থাকা চলবে না। তোমার ইচ্ছাগুলি কোম্পানীর পকেটে ভ'রে দিয়ে তাদের গাইডের পেছনে-পেছনে, ঘুরে-ঘুরে দেখতে হবে দ্রষ্টব্য-স্থান।

বেড়াবার জন্যে লাগেজ বাঁধার মত নিজেকেও নিয়মের দড়িতে বেঁধে বেড়াবার মন ছিল না, তাই আপন মনেই ঘোরবার ব্যবস্থা করলাম।

যেখানে যতদিন ইচ্ছে থাকবো, যা ইচ্ছে দেখবো, যার সঙ্গে ইচ্ছে ভাব জমাবো।

মিসেস ল্যাফরকেডকে বললাম: দেবি, তোমার এই লণ্ডনই তো ইংল্যাণ্ড নয়। আমার ইংল্যাণ্ড দেখবার ইচ্ছে, স্কটল্যাণ্ডও। সোজা যাবো এডিনবার্গ, সেখান থেকে গ্লাসগো হ'য়ে লেক ডিষ্ট্রিক্ট ঘুরে ম্যাঞ্চেষ্টার, শেফিল্ড, বার্মিংহাম দেখে আবার ফিরবো তোমার ডেরায়।...রাইট?

মিসেস আহ্লাদে গদগদ হ'লেন: রিয়েলি এ নাইস প্রোগ্রাম। আই উইশ ইয়োর হ্যাপি জার্নি মিঃ গস্।

ছোট স্যুটকেসে হাল্কা কিছু জিনিষ ভ'রে নিয়ে গেলাম সোজা ভিক্টোরিয়া কোচ ষ্টেসনে। সীট রিজার্ভ করাই ছিল। ট্রেণে এডিনবার্গ যাওয়া মানে ৫৭ শিলিং ৪ পেনি খরচ করা। তাছাড়া ঘুমোবার জন্যে বাড়তি ১২ শিলিং ৬ পেনি গচ্ছা। সে জায়গায় স্কটিশ অমনিবাস সার্ভিসের লাক্সারি এক্সপ্রেসের বাসে ৩০ শিলিংয়ে আরামে ঘুমিয়ে এডিনবার্গ যাওয়া মানে বেশ কিছুটা পয়সা বাঁচানো, অথচ নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা।

লাক্সারি এক্সপ্রেসই বটে। গদিগুলি হাওয়াই-জাহাজের গদীর মতই আরামপ্রদ, হেলিয়ে শোবার ব্যবস্থা। পেছনে ছোট্ট একটি বাথরুম। প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারের গদীতে একটি ক'রে ব্ল্যাংকেট—রাত্রে ঠাণ্ডায় গলা পর্যন্ত ঢেকে শোবার ব্যবস্থা।

বাসখানা সাড়ে সাতটায় ছাড়ে। ছাড়বার একটু আগে আমার পাশে জানলার দিকের সীটটায় কনডাকটার সাহেব বসিয়ে দিলেন একটি তরুণীকে। শ্যামলী, সুবেশা। কোঁকড়ানো চুলগুলি গোছ ক'রে লাল ফিতেয় বাঁধা; স্কার্ট পরা, গা-ভরা যৌবন, মুখে লাবণ্যের কারুকার্য। এক নজর দেখে, দেখিনি-দেখিনি ক'রেই অন্যদিকে চেয়ে রইলাম। তিনিও আমারই মত ভাঁজকরা কম্বলটি কোলে রেখে জানালার বাইরে চেয়ে রইলেন। কিন্তু একসঙ্গে সারা রাত যখন কাটাতে হবে, তখন নিজের-নিজের ঠাট এবং ডাঁট বেশিক্ষণ বজায় রাখা দায়। যদিও এদেশে মেয়ে দেখলেই মনে রং ধরবার কারণ নেই, তবু আমাদের গায়ের রংটা প্রায় কাছাকাছি হওয়ায় আলাপ করবার জন্যে মনটা (তাঁরও হয়তো) উন্মুখ হ'য়ে রইলো।

সুযোগও জুটে গেল। প্যাসেঞ্জারে প্রায়-ভর্তি বাস ছাড়বার ঝাঁকুনিতে তাঁর কোল থেকে প'ড়ে গেল ব্ল্যাংকেটখানা তাড়াতাড়ি তুলে দিলাম সেখানা।

থ্যাংকু।

নিডিণ্ট মেনসন। জের টানলাম: এক্সকিউজ মী। আর ইউ ফ্রম ইণ্ডিয়া?

নো, ইজিপ্ট।

ইজিপ্ট! মিশরকুমারী! ক্লিয়োপেট্রার বংশধরী। বেশ উৎসাহিত হ'য়েই আলাপ শুরু করলাম।

বাসখানা লণ্ডনের ভীড়ের রাস্তা পার হ'য়ে হ'য়ে সহরতলীর ফাঁকা রাস্তা ধরলো। কিছুক্ষণ পরেই বাসখানা সহরের আলো ছেড়ে হেড লাইটের আলো জ্বেলে অন্ধকার ঠেলে চলতে লাগলো প্রায় নিঃশব্দে। আঁকাবাঁকা পথ, মাঝখানটায় সারি-সারি মাটির খুরির মত দেখতে কী যেন উপুড় করা—চকচকে। হেড লাইটের আলো প'ড়ে জলজ্বল করচে। যেন চোখ পাকিয়ে বলচে, রাস্তার বাঁদিক দিয়ে চলো।

নিজের পরিচয়ের ঘুস দিয়ে মিশরকুমারীর পরিচয়টুকু পাওয়া গেল। কায়রো থেকে পঁচিশ মাইল দূরে নাইল নদীর ধারে একটি গ্রামে তাঁর বাড়ি। কায়রোর মেডিকেল কলেজে পাশ ক'রে স্কলারশিপ নিয়ে মিড-ওয়াইফ্রিতে ডিগ্রী নেবার আশায় পড়চেন এডিনবার্গের মেডিকেল কলেজে। গেছ্লেন লণ্ডনে একটু বিশেষ কাজে, এখন ফিরতির পথে। এ তপস্যা শেষ হ'তে এখনো একটা বছর বাকি। দেশে মা আছেন, ভাই বোনেরা আছেন। তাঁরই মুখ চেয়ে ব'সে আছেন তাঁরা। বাবা গত হ'য়েছেন বছর পাঁচেক আগে।

কথায়-কথায় আত্ম-পরিচয়ের বেড়া ডিঙিয়ে আমরা এলাম বৃহত্তর আলোচনায়। দু'জনেই আমরা পৃথিবীর পুরোন সভ্যদেশের বাসিন্দা। প্রায় তিন হাজার বছরের পুরোন খবরাখবর নিতে সময় লাগবারই কথা। রামেশিস, ক্লিয়োপেট্রা, এণ্টনী, পিরামিড, অশোক, বুদ্ধ, বাদশা, তাজমহল থেকে এ যুগের ফারুক, নাজিব, গান্ধী, নেতাজী নেহেরুকে ছুঁয়ে দু'দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির অলি-গলি দিয়ে চললো আমাদের গল্পের গতি। বাসের অন্যান্য সাদা চামড়ার প্যাসেঞ্জাররা হয়তো ভাবলেন, ঐ

দুই ডাকি তো খুব গল্প জমিয়েছে। অবশ্য, এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম, দু'চারজন ইতিমধ্যেই ঢুলতে শুরু করেছেন।

ঢুলবারই কথা। হাত ঘড়িতে দেখলাম রাত প্রায় এগা'রোটা। একটু পরেই বাস এসে থামলো ষ্ট্যামফোর্ডে। এখানে বিশ মিনিটের বিরাম।

বললাম: নাববে নাকি? চা?

মিশরকুমারী বললেন: না ব্ল্যাংকেটের তলায় বেশ আছি।

তবে তুমি বসো, আমি যাই।

নামলাম আমি। আরো অনেকেই নামলেন। কাছেই একটি ছোট রেষ্টুরেণ্ট। এই সময়ের বাসের প্যাসেঞ্জারের লোভে তখনো খোলা। ঢুকলাম সবাই।

টেবিলে এক ক্যানেডিয়ান দম্পতির সঙ্গে আলাপ হ'লো—মিঃ এবং মিসেস লেভি। তাঁরা বয়েল্ড ডিম আর চায়ের অর্ডার দিলেন। আমি বিলেতী মতে ডিমকে এতদিনেও নিরামিশ ব'লে মেনে নিতে না পারায় শুধু চায়ের অর্ডার দিলাম। কিন্তু হোটেলের ওয়েটিং মেডটি ভাবলো হয়তো এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন—কাজেই আমাকেও ডিসে ক'রে দু'টি ডিম গছিয়ে গেল।

হাঁ-হাঁ একি! বলবার আগেই মেডটি অন্য টেবিলে চলে গেছে।

কী, তুমি ডিম খাও না বুঝি? মিসেস লেভি বললেন।

না। একটু থেমে বললাম: ডু ইউ লাইক—

আপত্তি নেই। মিঃ লেভি বললেন।

ডিসখানা এগিয়ে দিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলাম। সেই সঙ্গে তিনজনের ভদ্রতা মাখানো গল্প হ'লো শুরু। চা-ডিমের সদ্ব্যবহার করবার পর মিসেস লেভি বললেন: তুমি তো মিডিল ইষ্ট, কণ্টিনেণ্ট ঘুরেচো— সেখানকার সব কয়েন জোগাড় করেচো?

হ্যাঁ।

সঙ্গে-সঙ্গে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বার করলেন একটি নিজের দেশের পাঁচ-সেণ্ট মুদ্রা: এটাও রাখো না তোমার কাছে?

বুঝলাম ভদ্রমহিলার মনোভাব। এই লেন-দেনের যুগে ডিমের দাম দিতে চান। হেসে বললাম, তোমাদের দেশে যদি যাই কোনদিন, সেদিন ঐ কয়েন সংগ্রহ ক'রে রাখবো। এখন রাখো ওটা তোমার ব্যাগেই।

আমার এই সামান্যতম ত্যাগেই অহেতুক মুগ্ধ হ'লেন তাঁরা। দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে মিসেস সেণ্টটা ব্যাগে ভ'রে অন্য কথা পাড়লেন। আমার ঠিকানা নিলেন, তাঁদের ঠিকানা দিলেন; বললেন, যেন ভুলে না যাই, দেশে গিয়ে চিঠিপত্র লিখি। ভারতের ত্যাগের খবর ও'রা রাখেন না, তাই আমার এই সামান্য ডিম-ত্যাগেই ও'দের মানসচক্ষু বিস্ময়ে ডিমের মতোই গোলাকার হ'য়ে গেল।

বাসে ফিরে এলাম।

চা খাওয়া হ'লো?

হ'লো। মিশরকুমারীকে ডিমের গল্প করলাম।

মিশরকুমারী হাসলেন: ও'রা বাস্তববাদী কিনা?

বাস চলতে শুরু হ'লো। সারা রাত্রি চলবে। কাজেই পেছনের একটি আলো জ্বেলে রেখে কণ্ডাক্টার সব আলো নিভিয়ে দিয়ে ড্রাইভারের পেছনের পর্দা ঝুলিয়ে দিলো। বসলো গিয়ে বাইবে ড্রাইভারের পাশে। বাসের রেডিও কিংবা গ্রামোফোন (কারণ অত রাত্রে রেডিও কোথায়?) চালিয়ে দিলো। সারা বাসখানা মৃদু সুরে গুঞ্জন ক'রতে লাগলো।

মিশরকুমারীর অনুরোধে তার সীটের চাবি টিপে হেলিয়ে দিলাম সেখানা। আমারটাও হেলিয়ে নিয়ে ব্ল্যাংকেটটা গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে শুলাম।

অন্যান্য যাত্রীরাও সীট হেলিয়ে নিয়ে ঘাড় হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন ঘুমের আশায়।

চলন্ত বাসখানায় ইঞ্জিনের একঘেয়ে যান্ত্রিক শব্দ আর ভিতরে রেডিয়ো বা গ্রামোফোনের যান্ত্রিক সুর-মূর্চ্ছনা। পেছনে মাত্র একটি নিষ্প্রভ ঘোলাটে আলো। যেন এক-চোখ-কানা বুড়োর ছানি-পড়া চোখটা। ভয় করবার কিছু নেই—

ফিসফিসে গলায় ডাকলাম: মিশরকুমারি?

কি?

ঘুম আসচে না যে? আমার হাতখানা তার নরম হাতের উপর রেখে বললাম: এসো গল্প করি।

হাতখানা না সরিয়ে মিশরকুমারী বললেন: এই রাত্রে গল্প? সবাই জেগে উঠবে যে?

উঠুক। ব্রহ্মপুত্র আর নাইলের উচ্ছ্বাসের গর্জনে মরা টেমস্‌রা জেগে ওঠে যদি উঠুক—

কী? গল্প বেশ জমাটি হচ্চে তো? পাশে-শোয়া মিশরকুমারীকে নিয়ে এই ধরণের দিব্যি একটা ঝাল-ঝাল রোমান্সের গল্প দিব্যি ফাঁদা যেতো। কিন্তু হায়, এটি নিছকই একটি ভ্রমণ-কাহিনী। তাই কলমকে ঠিক পথে-পথেই চালাতে হবে, বিপথে বা ঝোপে-কুঞ্জে ঢুকতে দেওয়া নিষেধ।

কাজেই যা সত্যিই ঘটলো তাই বলি—

কোন নারীর পাশে শুয়েও পুরুষের পক্ষে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোন হয়তো আশ্চর্যের নয়, কিন্তু কোন পরপুরুষের পাশে শুয়ে কোন নারীর পক্ষে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোন অনেক সময় বিপজ্জনক।

কাজেই আমি বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়েই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আর কখন যে গায়ের ব্ল্যাংকেটখানি গা থেকে স'রে স'রে পায়ের গোড়ায় এসে প'ড়েচে, সে খেয়ালও নেই। ঘুমের ঘোরেই হঠাৎ যেন মনে হ'লো ব্ল্যাংকেটখানা আপনা থেকেই উঠে এসে আমার বুকে নেতিয়ে পড়চে। স্বপ্ন? না, সত্যি? চোখটা একটু ফাঁক ক'রে দেখি, মিশরকুমারী অতি সন্তর্পণে ব্ল্যাংকেটখানা টেনে দিচ্চেন আমার বুকের 'পরে।

লাফিয়ে উঠে তাঁকে চমকে না দিয়ে চোখ বুজেই অনুভব করলাম এক করুণাময়ী নারীর নরম হাতের সেবা। হয়তো জেগেই বসেছিলেন মিশরকুমারী। আমার ব্ল্যাংকেটখানা প'ড়ে যেতে সযত্নে তাঁর সেবা-সুন্দর হাতে টেনে তুলে দিলেন সেখানা; কিংবা নেহাৎই সন্ধ্যা-রাত্রে তাঁর ব্ল্যাংকেটখানা তুলে দেওয়ায় ঋণ-শোধ করলেন মাত্র।

আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েচি, খেয়াল নেই। লণ্ডনডেরিতে নাকি বাস থেমেছিল ভোর পাঁচটা নাগাদ আর্লি টি-এর জন্যে—কিন্তু তা' জানতেই পারিনি। ঘুম ভাঙলো সাড়ে ছ'টায় নিউক্যাসেলে—বাস থামবার ব্রেকের ঝাঁকুনিতে।

দেখি, মিশরকুমারী জেগে ব'সে আছেন; দৃষ্টি জানলার বাইরে। আমাকে উঠে বসতে দেখে বললেন: ঘুম ভাঙলো?

বললাম: তা' ভাঙলো।

মশায়ের তো খুব নাক ডাকছিল।

তাই নাকি? বললাম: তা' সে জন্যে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি তো?

হাসলেন মিশরকুমারী: ঘুমুলে তো হবে। আমার বাসে-ট্রেনে বা অজানা জায়গায় ঘুম আসে না।

বললাম: মেয়েদের পক্ষে না আসাই উচিত।

মিশরকুমারী হেসে বললেন: তা ঠিকই বলেচো।

বাস চললো আবার। আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে, সবুজ মাঠের গা দিয়ে চেনা পথে গড়িয়ে চললো বাস। উঁচু-নিচু মাঠ, মাঝে-মাঝে চাষী-সাহেবদের বাড়ি। কোথাও বেড়া দিয়ে ঘেরা বাগান, কোথাও বা এলো-মেলো ঝোপ।

মরপেথ পার হতেই দেখি সবুজ মাঠে পাতলা সাদা চাদর পাতা। ঠাণ্ডা কুয়াশা জমে গেছে ঘসা কাঁচের মতই। গ্রীনল'-তে ব্রেকফাষ্টে নেমে আমরা জমা-কুয়াশা নিলাম হাতে, মচমচিয়ে ভেঙে দিলাম যেন অভ্র-পাত।

মিশরকুমারী বললেন: বেশ লাগে কিন্তু ভাঙতে। না?

হেসে বললাম, তাই তো যুদ্ধের সৃষ্টি।

বটে। বটে। অমনি অন্য মানে করলে? বলেই বললেন: চলো, চলো ঠাণ্ডা বড়ো, রেষ্টুরেণ্টে ঢোকা যাক।

অবশেষে এডিনবার্গে। বেলা তখন এগারোটা।

বেলা এগারোটা, ঘড়ি দেখে বুঝতে হ'লো। সহরটা এডিনবার্গ, মিশরকুমারী জানিয়ে দিলেন। কারণ, কুয়াশা। একহাত দূরের মানুষ দেখা যায় না।

কুইন ষ্ট্রীটে বাস এসে থামলো। যাত্রীরা সব নেমে ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে ঘন কুয়াশায় চট্‌ ক'রে গা-ঢাকা দিলো যেন।

কিন্তু মিশরকুমারী বললেন: তুমি কোথায় যাবে এখন?

কোন হোটেলে। বললাম: কিন্তু যা কুয়াশা। হোটেল খুঁজে বার করাই তো মুস্কিল।

তাই তো ভাবচি।...আচ্ছা, তোমার তাড়াতাড়ি আছে?

বললাম, আপাতত কর্মহীন, বেকার। তাড়াতাড়ির কিছু নেই।

মিশরকুমারী বললেন: মানে, কাছেই একটা দোকানে একটু কাজ আছে—সেটা সেরেই তোমায় হোটেল দেখিয়ে দেবো, আমার হোস্টেলে যাবার পথেই পড়বে সেটা।

হেসে বললাম: বেশ তো। তুমি সারাদিন ধ'রে কাজ সারো, কিন্তু আমায় ছেড়ো না। তাহ'লে এই ঘনঘোর কুয়াশায় দিশেহারা হ'তে হবে। আশাকরি, এ আমার কু-আশা নয়!

মিশরকুমারী বললেন: নিশ্চয় নয়। আমার উচিত তোমাকে সাহায্য করা। এসো, আমার সঙ্গে, আমার কাজটা সেরে নি।

ঘনঘোর কুয়াশা ভেদ করতে-করতে, অতি মন্থর গতিতে আমরা এলাম একটি দোকানে।

মিশরকুমারী শপ-গার্লের কাছে গিয়ে চুলে বাঁধবার রঙীন ফিতে চাইলেন। দেখলাম, কাল সন্ধ্যায় দেখা তাঁর চুলের রিবনটা সত্যিই নেই তো!

কোথায় গেল তোমার ফিতে?

কী জানি কোথায় প'ড়ে গেছে। মিশরকুমারী ঘাড় থেকে চুলের গোছা পিঠে সরিয়ে বললো: দেখছো না চুলের অবস্থাটা? ঘাড়ে-মুখে এসে পড়চে!

দেখলাম, তা ঠিক। মেঘবরণ চুলে মুখচন্দ্র ঢাকা পড়েচে বটে।

শপ-গার্ল ততক্ষণে লাল-গোলাপী-নীল-সবুজ চার রঙের রিবনের কয়েল নিয়ে এসে রেখেচে কাউণ্টারের উপর: হিয়ার মা'ম, সাম্ শেডস ফ'য়ু।

কিন্তু মা'ম অতগুলি শেডের রিবন দেখে বাঁশ বনে ডোম কানা হ'য়ে গেলেন। এটা একবার ওটা একবার নাড়তে লাগলেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে মিশরকুমারীর 'কোনটা কিনি'র অবস্থা উপভোগ করতে লাগলাম।

কিন্তু হঠাৎ তরুণী জিগ্যেস করে বসলেন: কোন রংটা কিনি বলো তো?

ওরে মেয়ে! ফাঁকতালে পুরুষের পছন্দটা জেনে নিতে চাও? উকিলের পরামর্শ, ডাক্তারের পরামর্শ পেতে হলে ফি দিতে হয়। তবে এই তরুণী আমা হেন পুরুষের পরামর্শ বিনা-বিনিময়ে চান নি। একটু পরেই তাঁর পরামর্শ আমার দরকার হবে। কাজেই, 'জানিনে' বলার কোন মানে হয় না। বরং মূর্খতাই প্রকাশ পায়। তাই ধরি মাছ না ছুঁই পানি-ধরণের উত্তর দিলাম, মিস, তোমার এই ঘন কালো কেশে সব রংই চমৎকার

মানাবে। যেটা ইচ্ছে নাও।

মিশরকুমারী বললেন : ইচ্ছেটাই তো বাধা দিচ্ছে।

তবে এই নীল রংটা নাও। বুক ঠুকে বলে দিলাম : এই রংটাই মানাবে ভাল।

ঠিক তো?

নিশ্চয়ই।

তবে দাও এক গজ। নীল ফিতেই কিনলেন।

অভ্যস্ত হাতে ফিতে দিয়ে চুল বেঁধে নিয়ে বললেন : চলো এবার যাই।

এক গজ ফিতে কিনতে যে সময় লাগলো, অতটা সময় বোধ করি একটা গজহস্তি কিনতেও লাগে না। তবু ধৈর্য ধরেই ছিলাম। গরজ বড় বালাই।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি কুয়াশা ততক্ষণে অনেকটা পাতলা হয়ে গেচে। বাস-ট্রামগুলো আবছা দেখা যাচ্ছে। সারি-সারি বিরাট বাড়িগুলো কাঁধে-কাঁধ লাগিয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার অপর দিকে উঁচু একটা পাহাড়, তার মাথায় দুর্গ। অপূর্ব শোভা। একটু দূরে, রাস্তার ধারে একটা স্মৃতিস্তম্ভ। রাস্তাটাও বেশ চওড়া।

মিশরকুমারী বললেন : এইটাই এডিনবার্গের সদর রাস্তা—প্রিন্সেস ষ্ট্রীট। ঐ যে দুর্গ, ওটা ঐতিহাসিক এডিনবার্গ-ক্যাসল। আর ঐ যে স্তম্ভ, ওটি স্যার ওয়াল্টার স্কটের। চমৎকার কারুকার্য। এখন কিছু বোঝা যাচ্ছে না, পরে সব ঘুরে-ফিরে দেখো।

বললাম : হ্যাঁ দেখতেই তো আসা।

এমন সময় একটা বাস এসে দাঁড়ালো বাস ষ্ট্যাণ্ডে।

চলো, ঐ বাসে উঠতে হবে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। টিকিটের দাম দিতে গেলাম, আশ্চর্য, কিছুতেই দিতে দিলেন না। বললাম : সে কি, তুমি এত কষ্ট করচো, আবার পয়সাও খরচ করবে?

তাতে মিশরকুমারী যা বললেন, তা' আরো আশ্চর্যের : দেখো, পুরুষরা পয়সা উপায় করতে ভালবাসে, আর মেয়েরা খরচ করতে। আমাকে একটু খরচ করবার আনন্দটা ভোগ করতে দাওই না। এই প'ড়ে পাওয়া আনন্দটুকুতে আর বাদ সেধো না।

যথা আজ্ঞা দেবী। মনিব্যাগটা পকেটে থাবড়ে রেখে দিলাম।

এঁকে-বেঁকে কয়েকটা রাস্তা পার হ'য়ে বাস থামতেই মিশরকুমারী বললেন : এবার নামো।

নামলাম। কাছেই একটা হোটেলে গেলাম দু'জনে।

হোটেলের একজন তরুণী আমাদের বক্তব্য শুনে বললো : সরি, সব ফুল।

শুনে মিশরকুমারীও যেন 'ফুল' ব'নে গেলেন। এমন জবাব পাবার কথা ভাবেননি হয় তো। খানিকটা ভেবে বললেন : চলো তো আর একটা হোটেলে, একটু দূরে।

আবার বাস। এবং আমার টিকিট কেনার উদ্যোগ এবং মিশরকুমারীর প্রত্যাখ্যান—পূর্বের মতই ঘটলো।

খানিক পরে আবার নামলাম।

এ হোটেলের মহিলাটি বললেন, হ্যাঁ, আছে বটে ঘর খালি।

যাক, বাঁচা গেল। মহিলাটি আমাদের দু'জনকে উপরে নিয়ে গিয়ে চমৎকার একটি আসবাব-পত্র সাজানো ডবল-বেড-রুম দেখিয়ে বললেন : আশাকরি তোমাদের দু'জনের—

না, না, আমরা দু'জন নই, একজন। মিশরকুমারী লজ্জা পেয়ে তো-তো করতে লাগলেন।

আমি হাতে বুক ঠুকে বললাম : আমি, আমি থাকবো, একলা। সিঙ্গল বেড চাই।

ও, সরি। ভদ্রমহিলা কাঁধ ঝাঁকালেন নিজের : সিঙ্গল বেড-রুম আপাতত সব অকুপাইড।

মিশরকুমারী আর দাঁড়ালেন না সেখানে : চলো যাই। যত সব।

রাস্তায় এসে বললাম : দেবী, এখন কুয়াশা পাতলা হ'য়েছে; আশাকরি হোটেল নিজেই এবার খুঁজে নিতে পারবো। অনেক কষ্ট করলে, অশেষ ধন্যবাদ।

না, না।—মিশরকুমারী কেশগুচ্ছ ঝাঁকিয়ে বললেন : হোটেল একটা আমাকে দেখে দিতেই হবে।

দেখে দিতেই হবে? তবে দাও। মনে মনেই বললাম : কিন্তু, আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে মিশর-বালা; বেলা বেড়ে গেল, বাড়ছে এখন পেটের জ্বালা।

এসো, ঐ ট্রামটা ধরি। ছুটে গেলেন ট্রাম ষ্ট্যাণ্ডে তরুণী।

অগত্যা স্যুটকেস হাতে আমাকেও ছুটতে হ'লো: হে ঈশ্বর, এই মহিলার কথা মত আর কত ছুটবো? ছুটি দাও প্রভু। এত দেশ ঘুরেচি, কত হোটেল খুঁজেচি নিজেই। আজ আমাকে একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ ক'রে দিলে গা?

ট্রামেও যথারীতি আমি মানিব্যাগ দেখালাম, এবং উত্তরে মিশরকুমারী ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা শিলিং বার করলেন।

আবার নামলাম। গেলাম আর একটা হোটেলে।

মিশরকুমারী এবার গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন: ভিতরে গিয়ে দরজায় বেল টেপো গে।

টিপলাম। বেরিয়ে এলো একটি তরুণী।

হ্যাঁগা, সিঙ্গল বেড-রুম একটা খালি আছে?

আছে।

আছে?

হ্যাঁ। নিয়ে গেল ভিতরে। ঘরটা পছন্দও হ'লো, দরটাও। বেড-ব্রেকফাষ্ট এগারো শিলিং। ঠিক হোটেল নয়, বোর্ডিং হাউস। নাম, হ্যামিলটন হাউস, লরিষ্টন প্লেস-এ ৪৭ নং বাড়ি।

তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম মিশরকুমারীকে খবরটা দিতে। দেখি, বাইরে সেইখানে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করচেন।

পেয়েচি ঘর।

যাক, খুশী হ'লাম। আচ্ছা, আসি তাহ'লে। গুডবাই।

বললাম: থ্যাংকু।

কিন্তু তার আগেই হাঁটা দিয়েচেন মিশরকুমারী। দূরে একটা বাস আসতে দেখেই ছুটে গেলেন বাস ষ্ট্যাণ্ডে। এমন সময় খেয়াল হ'লো, তাইতো, মিশরকুমারীর নামটা জানা হয়নি তো। তাড়াতাড়ি আমিও ছুটলাম বাসষ্ট্যাণ্ডে। কিন্তু তার আগেই বাসটা ষ্ট্যাণ্ডে আসতেই, তরুণী তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠলেন বাসে। আমাকে দেখতে পেয়ে বাসের ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়লেন দু'বার। আমি বোকার মত হাত নাড়লাম আমার। নাম জানা আর হ'লো না।

কী স্যার, ওটিকে কোত্থেকে জোগাড় ক'রেছিলেন?

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি তিনচারজন ব'ঙালী যুবক। বোধহয় ষ্টুডেণ্টস। আমাকেই উদ্দেশ্য ক'রে তারা প্রশ্ন করচে।

দাঁড়ালাম। বললাম: পথে আলাপ।

ঘনিষ্ঠতা হয়নি তো?

কেন বলুন তো?

মানে, আগুন, একেবারে আগুন।—'ওদের মধ্যে ঢেঙা ছেলেটি বললো: আমাদের কলেজের একটি স্কচ্ ছেলে তো ওর জন্যে পাগল। পিপে-পিপে হুইস্কি গিলেও ওকে ভুলতে পাচ্চে না।

ওঁকে চেনেন নাকি? জিগ্যেস করলাম।

আরে, আমাদের কলেজের মেয়ে যে? একজন বললো: ভারি খেলোয়াড়। মিশ্‌রী ছুঁড়ি না, মিছরীর ছুরি। হার্ট কেটে কচাকচ ফালা ক'রে দেয়!

বুঝলাম, ছোকরারা ডাক্তারি পড়ে। বিরক্ত হ'য়েই বললাম: সহপাঠিনীর সম্বন্ধে আপনার মন্তব্যটি চমৎকার শ্রুতিমধুর তো?

আর দাঁড়ালাম না সেখানে। বঙ্গ-কুলাঙ্গার। হয়তো গিলেচে কিছু।

হ্যামিল্টন হাউসের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবলাম, মিশরকুমারী ভাগ্যিস্ সময়মত হাতের কাছে বাসখানা পেয়েছিলেন।

ইংল্যাণ্ড যদি অমাবস্যা, তবে স্কটল্যাণ্ড পূর্ণিমা।

ইংরেজের মুখ হাঁড়ি, স্কচের মুখে হাসি; ইংরেজ ফসিল, স্কচ ফাজিল। ইংরেজ মুক, স্কচ মুখর।

অথচ দুটো দেশের মধ্যে এমন কোন ব্যবধান নেই, আসা-যাওয়ায় বাধা নেই, ভাষার কোন বিরোধ নেই।

ইংল্যাণ্ডের মত রাস্তাঘাটগুলোও নীরব নয়, সরব। বাড়িগুলির গড়ন দেখবার মত, কারুকার্য অপূর্ব। ট্রামগুলো দোতলা। মেয়েরাও ট্রাম চালায়।

দোকানীরাও রসিক। ওষুধের দোকানের সামনে বিরাট হামান-দিস্তার মডেল, মাছের দোকানের সামনে বিরাট একটা পেতলের মাছ। বোধ হয়, হুইস্কি গিলে চোখ দুটো ঘোলাটে হলে সাইন বোর্ড চোখে পড়ার

কিংবা প'ড়ে দেখবার কথা নয়। তখন ঐ মডেলগুলিই ভরসা।

লোকগুলিও ভারি মিশুক। হোটেলের পথ হারিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজচি, এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে দেখিয়ে দিলেন ঠিক পথটা।

ফুটপাথে প্র্যামে বাচ্চাকে বসিয়ে মা গেছেন দোকানের ভিতরে। বাচ্চাটা আপন মনেই খেলা করচে; এক ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যাবার সময় তার গালটা টিপে দিয়ে গেলেন।

পোষ্ট অফিসে গিয়ে ডান হাতের গ্লাভটা খুলে বাঁ বগলে চেপে চিঠি লিখে, ডাকে দিয়ে দিব্যি বেরিয়ে আসচি, পেছন থেকে একটি তরুণী এলো ছুটতে ছুটতে, ও মশায়, আপনার গ্লাভটা যে মাটিতে প'ড়ে গেছলো।

তাই নাকি? থ্যাংকস। থ্যাংকস।

এমন কাছাটিলে, ওভারকোটের পকেট থেকে লম্বা ভাঁজ করা খবরের কাগজটা কখন যে ফুটপাথে প'ড়ে গেছে তা খেয়ালও নেই। এবারেও আর একটি তরুণী। দৌড়ে এসে ধরলো আমাকে, হেসে বললো: কাগজখানা কি ফুটপাথকে দান করছিলেন?

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হেসে বললাম: ইচ্ছে তো ছিল, কিন্তু সে পুণ্যটুকু করতে আমায় দিলে কৈ? না, না, সত্যিই অশেষ ধন্যবাদ।

এক তরুণীর সঙ্গে একটা বাহারি কুকুর যাচ্ছিল, আমাকে নতুন লোক দেখে সেও একবার আমার দিকে চেয়ে কেঁ-উ-উ-উ ক'রে গেল। মেয়েটিও ফিক ক'রে হাসলো আমার দিকে চেয়ে। ভাবটা: দেখলে, কুকুরটা আমার কেমন মিশুক!

ট্রামে উঠে বসলাম দোতলায়। কনডাকট্রেস এসে জিগ্যেস করলো, কোথাকার টিকিট?

হেসে বললাম: এই ট্রাম যেখানে যাবে, সেখানকার।

তার মানে?

মানে, তোমাদের সহর দেখতে বেরিয়েচি, চিনিনে কিছুই।

তাই নাকি। একখানা টিকেট দিয়ে বললো: আসচি আমি।

আমি জানালা দিয়ে বাড়ি দেখতে লাগলাম। কনডাটার-মেয়েটি দেখি একটু পরেই আমার পাশে এসে বসলো। কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো, বুকে টিকিটের বাণ্ডিল লটকানো। বললো: তোমাকে সহর চেনাতে এলাম।

তাই নাকি? আশ্চর্য হলাম।

ঐ দেখো, আমাদের ইউনিভার্সিটি।...আর ঐটা ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি ...হ্যাঁ, ঐটা মিউজিয়াম,...ওটা টেকনিকাল স্কুল...বসুন, আসচি আমি। বুঝলাম আবার টিকেট নিতে গেল।

খানিকবাদে আবার এলো মেয়েটি। ততক্ষণে একজন স্কচ ভদ্রলোক আমার পাশে এসে বসেচেন। কাজেই কণ্ডাকটর-মেয়েটি কাছে দাঁড়িয়েই সহরের দ্রষ্টব্য দেখাতে লাগলো। তার দেখাদেখি ভদ্রলোকও উৎসাহিত হলেন এবং মেয়েটীর ফস্কে যাওয়া দ্রষ্টব্যগুলি তিনি লুফে নিয়ে আমার কানে গুঁজে দিতে লাগলেন। ভদ্রলোক নিজের পরিচয়ও দিলেন যেচে। এডিনবার্গের এক স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক। নাম, মাইরি ব্রাউন। একে শিক্ষক, তায় নাম মাইরি—কাজেই তাঁর তথ্যগুলি সবিশ্বাসেই গিলতে লাগলাম।

ফেরবার পথে আর একখানি দোতলা ট্রামে উঠে বসলাম। ঠাণ্ডার জন্যে চারদিকের কাঁচের জানালা তোলা। উপরে কেউ নেই, আমি একাই। একটু পরে একটা ষ্টপেজে একজন স্কচ ভদ্রলোক উঠে উপরে এসে বসলেন। তারও দু'তিন ষ্টপেজ পরেই উঠলো একটী স্কচ ছেলে; দোতলায় এসেই সামনের জানলার একটা কাচ খুলে কাছেই একটা সীটে বসলো। ঠাণ্ডা হাওয়া হু-হু ক'রে ঢুকতে লাগলো, হি-হি ক'রে উঠলো সারা শরীর। ছেলেটার মাথা গরম, না, মেজাজ গরম বোঝা গেল না। চুপ ক'রেই থাকলাম। দরকার কি ঘাঁটিয়ে? জানি তো, কিছু বললেই হয় তো ব'লে বসবে, আপনার কি দাদু, অসুবিধে হয়, ট্যাক্সি আছে রাস্তায়, চেপে স্রেফ চ'লে যান মজাসে।

আমাকে কিন্তু আশ্চর্য ক'রে স্কচ ভদ্রলোকটী বললেন, (হয় তো তাঁরও শীত করছিল): সানি, জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলেই ভাল হয়। বড় ঠাণ্ডা হাওয়া আসচে। আমাকে দেখিয়ে বললেন: ওঁরও হয়তো অসুবিধে হচ্ছে।

আশ্চর্য, সেই তরুণ লজ্জা পেলো, বললো, 'সরি' এবং বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে জানলায় কাচ দিলো তুলে।

আমি বললাম: থ্যাংকস।

এডিনবার্গ সহরের বাড়িগুলোর মাথা স্লেট বাঁধানো ছুঁচলো—যেন টোপর

পরা। আর ঐতিহাসিক এডিনবার্গ ক্যাসলটি যেন সহরের মুকুট। চারশো ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর সগৌরবে দাঁড়িয়ে। ভিতরে রাজপ্রাসাদ, ব্যারাক, চ্যাপেল, হাসপাতাল, প্যারেড-গ্রাউণ্ড, বাগান সব সাজানো। বহু রাজার বহুৎ রক্তে দুর্গটি লজ্জা-রাঙা। তাই আজও সূর্যাস্তের সময় লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে, পরে সন্ধ্যার কালো পর্দায় নিজেকে লুকিয়ে ফেলে। বেলার শেষে দুর্গের ঐ অনুতপ্ত রূপটা বড় চমৎকার।

ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের শ্বেতপ্রস্তর মূর্তিটা পাশে তার প্রিয় কুকুরটি নিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন দুর্গটার দিকে। ভাবছিলাম, আজ বিশ্ব-সভায় কে সম্মানী? মানুষের হৃদয়ে কে আজ স্থায়ী আসন পেতে বসেছে? ঐ দুর্গাশ্রয়ী রাজাদের দম্ভ, না, ঐ স্তম্ভের সহজ মানুষটার কীর্তি।

স্কটল্যাণ্ডের হুইস্কি আর গলফগ্রাউণ্ড জগদ্বিখ্যাত; আর ব্যাগ পাইপ বগলে স্কার্ট পরা পুরুষ। স্কচ হাইলাণ্ডারদের সঙ্গে চাক্ষুষ মোলাকাত কলকাতার গড়ের মাঠে আগেই ছিল। এখন এডিনবার্গে এসে দোকানে-দোকানে দেখলাম হুইস্কি বোতলের ছড়াছড়ি। চোখেই দেখলাম, চেখে দেখিনি। পরে এডিনবার্গ থেকে গ্লাসগো যাবার পথে বাসে ব'সে চোখ মেলেই দেখলাম সবুজ মসৃণ গলফগ্রাউণ্ড। পা ফেলে বেড়ানো হ'লো না। পথে বাথগেট সহরও পড়লো। ছোট্ট সুন্দর। লিনলিথগো সহরও পার হ'য়ে গেলাম। এলাম গ্লাসগো-তে।

হোটেল পেতে কষ্ট হ'লো না। রেনফিউ স্ট্রীটের ১৯১ নং বাড়িতে ডাফস গেষ্ট হাউসে আস্তানা পাতা গেল। বেড ব্রেকফাষ্ট সাড়ে এগারো শিলিং। ক্লাইড নদীর ধারে গ্লাসগো সহরটি ব্যবসায়ীদের তীর্থক্ষেত্র। শিক্ষার্থীদের আশ্রম। বাইরে ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু দেখলাম, কিন্তু গেষ্ট হাউসের লাউঞ্জে বসে যে অভিজ্ঞতা লাভ করলাম তা রীতিমত উল্লেখ যোগ্য।

গেষ্ট-হাউসের মালিকাটি সদা হাস্যময়ী। ওঁদের লর্ড বোধ হয় ভদ্রমহিলার পেটে লাফিংগ্যাস ভ'রে দিয়েছিলেন গ্লাসগোতে পাঠাবার আগে। আর বোর্ডারগুলিও হরেক জাতীয়। তবে সবগুলিই গৌরাঙ্গ, আমিই কৃষ্ণশ্রী। লাউঞ্জে ল্যাণ্ডলেডি আমার পরিচয় দিতেই সবাই প্রায় লুফে নিলেন আমাকে, এগিয়ে দিলেন সিগ্রেট, জ্বেলে দিলেন দেশলাই।

বুঝলাম, এটা ইংল্যাণ্ড নয়; তাই এখানে কালোর জন্তেও কোল পাতা। আরো কারণটা পরে জানলাম: আমি ইণ্ডিয়ান। গ্রেট লীডার নেহেরুর দেশের লোক।

বাইরে ফগ দেখা দিয়েচে। বিকেলেই অন্ধকার। তার উপর ঠাণ্ডা হাওয়া। কাজেই সবাই ঘরে এসে জমেচে। কয়লার আগুনে ঘরটা বেশ গরমাগরম।

সবাই সোফায় গোল হ'য়ে ব'সেচি। প্রৌঢ়া মিসেস ডাফ, একটি আইরিশ ভদ্রলোক, সেলসম্যান; একটি স্কচ তরুণ, এগ্রিকালচারাল কলেজের ছাত্র; একটি ইংরেজ যুবক কোন এক ইংলিশ ব্যাঙ্কের গ্লাসগো শাখার কর্মচারী; একজন আমেরিকান ভদ্রমহিলা, বিগতযৌবনা, সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ব্যাপারে আপাতত গ্লাসগোবাসিনী আর একটি স্কচ-তরুণী, সুবেশা, সুন্দরী এবং সুনয়নী—এক বৃটিশ স্কুলের ইংলিশ টিচার। এবং বলা বাহুল্য, ভারতীয় শ্রীআমি।

মিসেস ডাফ বললেন, আজকের দিনটা কিন্তু বিশ্রী। ফগি, ড্যাম্প, আনইউজুয়াল।

মিসেস আমেরিকা লুফে নিলেন কথাটা: আমাদের আমেরিকা কিন্তু সানি, ব্রাইট। তোমাদের ইণ্ডিয়াও। না?

বললাম: হুঁ।

বললেন: তোমাকে সেলাম আলেকম জানাচ্চি।

বললাম: আমরা হিন্দু। আমরা নমস্কার জানাই। দু'হাত জোড় ক'রে দেখালাম।

এবং সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হ'লো ভারতবর্ষের বিষয়ে তাঁর জ্ঞান-প্রকাশ: দেখেচি, তোমাদের মেয়েরা শাড়ি পরে; চমৎকার দেখায়। অনেকে পেটকাটা ব্লাউজ পরে। বিবাহিতা মেয়েরা সিঁথিতে লাল গুড়ো দেয়। মাথায় লম্বা চুল রাখে। তোমরা পান খাও, ঠোঁট লাল হয়ে যায় রক্তের মত। বেশি খেলে মাথা ঘোরে।

হেসে বললাম, মা'ম দেখচি, ইণ্ডিয়ার বিষয়ে একজন অথরিটি।

কথাটায় বোধহয় উৎসাহ পেলেন আরো। এবং ভালো-ভালো স্পষ্ট কথা বলতে লাগলেন: দেখ তোমাদের ইণ্ডিয়ার দিকেই আজ সারা পৃথিবী চেয়ে আছে। যদি বিশ্বে শান্তি আনতে পারে কেউ—সে

তোমরাই। মিলিটারি ব্যাপারে ঘেন্না ধ'রে গেছে। আমাদের প্রেসিডেন্ট এক্স-মিলিটারি। সেজন্যে পছন্দ হয় না। জানো, ম্যাকআর্থার জাপানে বহু ব্যবসা শুরু ক'রেছিলেন। এখন খুব বড়লোক। সপ্তাহে দু'শো ডলার ভাড়ায় একটা বিরাট ফ্ল্যাটে বাস করেন।

কথায়-কথায় আরো বললেন: আমার সব চাইতে দুঃখ, আধুনিক জগতে সব চাইতে সুসভ্যদেশ আমাদেব আমেরিকা, কিন্তু সেখানেও আমরা বর্ণ-বিদ্বেষ ঘোচাতে পারলাম না। নিগ্রোদের আমরা কোন উন্নতি করতে দিই না। তবু তারা আজ অনেক উন্নত হয়েচে, সব নিজেদের চেষ্টায়। মিউজিকে তো ওরাই ইউনিক। পল রবসনের নাম শুনেচো নিশ্চয়ই।

বললাম: হ্যাঁ।

স্কচ তরুণী সোফায় হেলান দিয়ে সিগ্রেটে টান দিয়ে বললেন: আমার তো কালো লোকদের ভালোই লাগে।

শুনে সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। আমিও।

তরুণী বললেন: আমার যা মনে হয় তাই বললাম।

মিসেস আমেরিকা ভিটো দিলেন: নিশ্চয়ই কালো লোকদেব মধ্যে অনেক শ্রেণী লোক আছেন। টেগোর, গ্যান্ডি। অথচ ইংবেজরা ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করলো।

থাক ওসব কথা; বললাম: আমার ঐ ইংরেজ বন্ধুটি লজ্জা পাবে।

শুনেই ফুঁসে উঠলেন আইরিশ সেলসম্যান: আমরা তো ওকে কিছু বলচিনে। ব্রিটীশ গভের্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমারো নালিশ আছে। আইবিশ স্বাধীনতার আন্দোলনের সময়, আমার কাকাকে ওরা জেলে আটকে বেখে জুতো দিয়ে লাথিয়েছিল। তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠে কয়েকদিন বাদেই মরে গেল। তবু আন্দোলনকে দমাতে পারলো না। শেষে আইরল্যাণ্ডকে দু'ভাগ করে কাটলো, তবে ছাড়লো।

হেসে বললাম: জানি, আমাদের ইণ্ডিয়ার অবস্থাও তাই করেচে।

ইংরেজ কেরানিটী কী যেন বলবার জন্যে হাঁ করতেই, মিসেস ডাফ তাঁকে থামিয়ে দিলেন, থাক, থাক, এসব বিষয়ে ডিসকাসন না করাই ভাল।

মিসেস আমেরিকা বললেন: হ্যাঁ বরং অন্য কথায় যাওয়া যাক।

স্কচ ছাত্রটি বললেন আমাকে: কোথায় কোথায় ঘুরলেন বলুন?

বললাম সংক্ষেপে আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত। এবং আমার পেশা ও নেশার কথা শুনে বললেন : ও, লেখক আপনি? কবিতাও লেখেন? নিশ্চয়ই আপনার ভাষাতেই—

বললাম : ইংরেজিতেও অনুবাদ করেছি কয়েকটা।

স্কচ তরুণী বললেন : দু' একটা হোক না।

তা আপত্তি নেই।—মনে মনে ভাবলাম, একরকম তো মুখিয়েই আছি। আর কখন দরকার পড়ে, তাই ক'খানা ভাঁজ করা পকেটেই আছে।

মিসেস ডাফ বললেন : সেই ভাল।

অতঃপর পকেট থেকে কাগজ বার ক'রে দু'টো কবিতা পাঠ করা গেল। সবাই খুশি হ'য়ে হাততালি দিলেন, ইংরেজ কিন্তু চুপ ক'রে রইল। মুখখানা তার গম্ভীর।

ইংরেজের গাম্ভীর্যকে স্কটল্যাণ্ডে কেউ কেয়ার করে না। এবং আজকাল অনেক দেশই করে না। কাজেই সবাই যখন গল্পের মোড় ঘুরিয়ে জোর আড্ডা চালালো, ইংল্যাণ্ড তাতে যোগ না দিয়ে, মুখের সামনে তুলে ধরলো একখানা সচিত্র ম্যাগাজিন।

পরদিন সকালে আমেরিকান ভদ্রমহিলা আর আমি যখন ব্রেকফাস্টে বসলাম, তার আগেই আর সকলের ব্রেকফাস্ট সারা হ'য়ে গেছে এবং ইতিমধ্যে অনেকে কর্মস্থলেও রওনা দিয়েচেন। আমি বেকার, আর ভদ্র-মহিলার বোধকরি ছুটি—তাই দু'জনে টেবিলে সামনা সামনি ব'সে শুরু করলাম গল্প আর খাওয়া—অর্থাৎ খাওয়ার সঙ্গে গল্প। মহিলাটি ভীষণ গপ্পে, একটু নিন্দুকও। পরচর্চা করতে পেলে জিবটা লকলক ক'রে ওঠে। সেটা আগে বুঝিনি। তাই যেই বলেচি, কাল ইংরেজ ভদ্রলোক বোধকরি আমাদের কথায় মনক্ষুণ্ণ হ'য়েচেন।—বলতেই মিসেস আমেরিকা, হাতের ছাড়ানো কলায় একটা কামড় দিয়ে বললেন : ওদের কথা ছাড়ো। ইংরেজ চরিত্র বিচিত্র।

মাখন মাখানো পাঁউরুটিতে আমি একটা কামড় দিয়ে বললাম : কী রকম?

ব্যস। শুরু হ'লো গ্রামোফোন : শোনো তবে। ভারি মজার। ঐ ইংরেজ জাতটার জীবন কাটে 'পাব'-এ এবং ক্লাবে। কেউ 'পাব'-এ ডার্ট খেলে, কেউ স্মার্ট সাজে ক্লাবে গিয়ে। আমরা ভাল, আমরা বড়, এই

ভাবটা সকলের ; অথচ কুসংস্কারে ভরা, অতীত নিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। কনসার্টে যাওয়া চাই, অথচ মিউজিক বোঝে না তেমন। মোটেই গল্প করতে জানে না, তবে গোয়েন্দা-গল্প পড়ায় খুব পোক্ত। খুব থিয়েটারের ভক্ত ; অথচ দেরি ক'রে যাওয়া একটা রোগ। পাথরের মত ঠাণ্ডা, ধীর ; কথা কয় না বেশি, কেবল হুদো-হুদো চিঠি লেখে কাগজের সম্পাদকের নামে। আবার, চিঠি দাও, তার উত্তর দিতে যেন ওদের জ্বর আসে গায়ে। কিন্তু ভারি দেশভক্ত। যেখানেই যাক, বগলে ইউনিয়ন জ্যাকটা থাকেই, নরম মাটি পেলেই পুঁতে দেয় ঝট ক'রে। বিদেশে নিজেদের মানিয়ে নিতেও পারে বেশ : যখন যেমন, তখন তেমন। তবে বিদেশী মুদ্রা গুনতে গেলেই ঘায়েল হ'য়ে যায়। সখের মধ্যে চা খাওয়া, বেড়াতে যাওয়া, আর আবহাওয়ার খবর নেওয়া। বাগান করা আর কুকুর নিয়ে ঘোরাও অনেকের সখ। খাবার বলতে সব সেদ্ধ—শুধু নুন-মরিচ দিয়ে গেলা ; অথচ মেনুগুলো সব ফরাসী ভাষায় লেখা। আর, সব চাইতে মজার ব্যাপার —কখনও হার মানে না ; ঐখানেই ওদের জিৎ।

হেসে বললাম : ইংরেজের নাড়ী-নক্ষত্রের এমন জ্ঞান হ'লো কেমন ক'রে ?

বললেন ভদ্রমহিলা : চোখ-কান খুলে চললেই সব জানা যায়। তাছাড়া—

আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, মিসেস ডাফ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন, আমাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা দেখতে।

অমনি মিসেস আমেরিকা পরম উৎসাহে আমাকে গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির বিষয়ে মূল্যবান তথ্য জানাতে শুরু করলেন।

বারে! ভদ্রমহিলার ইউনিক ট্যাকটিকসে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম আমি।

ইংল্যাণ্ডে এসে লেক ডিষ্ট্রিক না দেখলে, একটি দ্রষ্টব্য স্থান অদেখা থেকে যায়। লেক ডিষ্ট্রিক্টে অনেকগুলি লেক, ইংল্যাণ্ডের সুইজারল্যাণ্ড। আর হ্রদ-সৌন্দর্যের দিক দিয়ে কেজিক সহরই সেরা।

তাই সাড়ে চোদ্দ শিলিং-এ একখানা বাসের টিকিট কেটে বেলা ন'টায় একদিন গ্লাসগো থেকে বিদায় নিলাম। দুপুরে লাঞ্চ সারলাম ছোট্ট সহর লকারবি-তে। পথে পড়লো কার্কপাটরিক। এখানেই নাকি যুদ্ধে পলাতক হ'য়ে রবার্ট ব্রুস গা ঢাকা দিয়েছিলেন যখন, তখন চোখের সামনে

এক মাকড়সার উদ্যম দেখে পুর্ণোদ্যমে যুদ্ধে আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং জয়ী হ'ন সেবার।

তারপর কার্লাইল, পেনরিথ পার হ'য়ে যখন কেজিক-এ পেঁাছুলাম, তখন ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি শুরু হ'য়ে গেছে। মেঘলা আকাশে কালচে রং। সন্ধ্যে হ'তে দেরি নেই। বুঝলাম, আবার ইংল্যাণ্ডে এলাম।

বাস কনডাকটরের পরামর্শ মত মোটর ষ্টেশনের কাছেই যে ছোট্ট বাড়িটা দেখলাম, বৃষ্টির মধ্যে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তার দরজায় বেল টিপলাম। ঐ বাড়িটায় নাকি পেয়িং গেষ্ট রাখে। লেখাও আছে দেখলাম, বেড-ব্রেকফাষ্ট এভেলেভেল।

কাম ইন প্লীজ। ভিতর থেকে আওয়াজ এলো।

শুনে দরজায় ঠেলা দিতেই ভেজানো দরজা খুলে গেল। সামনের ঘরে চেয়ার-টেবিল-সোফা সাজানো। ভিতরে ঘরে কৌচে এক বৃদ্ধ ব'সে। সামনে বেশ গনগনে কাঠের আগুন।

বৃদ্ধ বই প'ড়ছিলেন বোধহয়। বইখানা মুড়ে জিগ্যেস করলেন: হোয়াট ডি' য়ু ওয়ান প্লীজ ?

এনি রুম ফ' মি ?

বললেন: একটু ব'সো। আমার স্ত্রী এসে তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।

বুঝলাম, ইংরেজর সাংসারিক রীতি অনুসারে গিন্নীর ইচ্ছেয় কর্ম সমাধা করা ছাড়া উপায় নেই। অতএব সামনের চেয়ারে ব'সে আগুন পোয়াতে লাগলাম। মুখচোরা বৃদ্ধ আবার বইতে মন দিলেন। সুযোগ পেয়ে আমি তাঁকে মন দিয়ে দেখতে লাগলাম: বেশ বয়েস হয়েচে, পাকা আমটির মত বললেই ভাল হ'তো, যাক্—পাকা আপেলের মত চেহারাটি। তবে হয় কোমরে বাত, নয়তো পায়ে—কাজেই দেহখানি কৌচে এবং মনটী বইতে দিয়ে ধীর-স্থির-হয়ে ঘরের কোনে ব'সে দিন গুনচেন হয়তো।

তবে কাঁহাতক চুপ ক'রে ব'সে থাকা যায় ? খুঁচিয়ে বৃদ্ধের পরিচয় সামান্য বার করলাম। ভদ্রলোক গ্রামার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন এবং এই কেজিকেই জন্ম, কর্ম। এবং যা ভেবেছিলাম, বাতে ভুগচেন। দম্পতি নিঃসন্তান। বৃদ্ধের একমাত্র ভরসা, স্ত্রীটি।

একটু পরেই গৃহিনী এলেন। বেশ আট-সাঁট, টনটনে। ঘরের

মধ্যে আমা হেন একটী কৃষ্ণকায় পুঙ্গবকে দিব্যি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকতে দেখবেন, স্বপ্নেও ভাবেন নি। কাজেই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। কর্তা করুণ বচনে বললেন, অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে, এই ভদ্রলোকটি এখানে আশ্রয় চান।

শুনে লাবণ্যপুঞ্জটি তাঁর পুঞ্জীভূত রাগ আপাতত চেপে রেখে(এ বিষয়ে ইংরেজ অদ্ভুত ওস্তাদ) গালে হাত দিয়ে বললেন : সে কি ডিয়ার ? তুমি কি ভুলে গেছ, কাল যে উইলি আসচে ম্যানচেষ্টার থেকে।—আমাকে বললেন, দেখুন স্যার, ভেরি সরি, আমাদের বড় ছেলে কাল আসচে, কাজেই ঘর দিই কী ক'রে ?

বৃদ্ধ কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, গিন্নী এক ধমকে থামিয়ে দিলেন তাঁকে : তুমি চুপ করো ডিয়ার, আমি এঁর সঙ্গে কথা বলচি।

আমি হেসে বললাম : আর কোথাও ঘর পাওয়া যাবে ?

নিশ্চয়ই। ঘরের অভাব ? বহু হোটেল আছে। আমি দেখিয়ে দিচ্চি।

এরপর আর ঘরে ব'সে আরাম ক'রে আগুন পোয়ানো চলে না। উঠে দাঁড়ালাম। ভদ্রমহিলারও তর সইল না, আমাকে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই বাইরে এলেন, চললেন কাছেই তেমাথার মোড়ে। সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন, এই পথ দিয়ে এগিয়ে গেলেই হোটেল পড়বে চোখে। গু' বাই।

দুর ছাই। কেজিকে না এলেই হ'তো।—নিরালা ভিজে পথে বৃষ্টি মাথায় ক'রে ছুটতে লাগলাম। স্যুটটা প্রায় আমসত্ব হ'য়ে যাবার জোগাড়। বুড়ো ভদ্রলোকের বোধহয় এতক্ষণ একচোট হচ্চে। পোড়া কাঠের চেলা তাঁর বেতো কোমরে বা পায়ে পড়চে কিনা কে জানে। ও, লর্ড। ওদের উপদেশ দিয়েচো ; লভ দাই নেবার। আমি ওদের নেবার নই, কাজেই আমাকে 'লভ' না করুক ক্ষতি নেই, কিন্তু বৃদ্ধ যেন ভার্যার হাতে প'ড়ে স্বর্গলাভ না করেন।

খানিকটা ছুটতেই পেলাম বটে একটা হোটেল। ধড়ে প্রাণ এলো। তাড়াতাড়ি বেড়ার গেট খুলে ঢুকে, পোর্টিকোর নীচেয় সদর দরজায় কলিং বেল টিপলাম।

এখুনি হয়তো কেউ আসবে। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে ভিজে মুখটা আর চশমার কাঁচ দুটো মুছে নিলাম।

কৈ, কারোর সাড়া নেই। আবার বেল টিপলাম।...খানিকক্ষণ পরে

আবার। এ আবার কী? ভিতরে সব ম'রে আছে নাকি? কাছাকাছি জন-মানবও নেই যে জিগ্যেস করবো, ব্যাপার কী? আরো কয়েকবার বেল টিপেও কাক-পক্ষীর দেখা না পেয়ে শেষে বেরিয়ে এলাম। বৃষ্টিটা তখন অনেক কম।

কিছু দুর গিয়ে আর একটা হোটেল পেলাম। সেখানে দেখি মিস্ত্রিরা মেরামতের কাজে ব্যস্ত।

হ্যাঁ গা, এ হোটেলে ঘর আছে নাকি?

তারা শুনে অবাক হ'লো। এখন ঘর? এখন এখানে সব হোটেল বন্ধ। অফ-সীজন। নভেম্বর মাসে ঘর পাওয়া যায় নাকি কেম্ব্রিজে! এখন সব হোটেলে মেরামতের কাজ চলচে।

তবে উপায়?

বললো: মার্কেটের দিকে যাও, দেখ, যদি পাও।

আবার এগোলাম। সেখানেও দুটো হোটেল বন্ধ। তবে ভাগ্য ভাল, রাত সাতটায় ওল্ড কিং জর্জ হোটেল-এ পাওয়া গেল একটা ঘর দোতলায়। শুধু ঘর নয়—সারা দোতলাটা পাওয়া গেল। সব ফাঁকা। নীচেয় 'বার' আর জুয়ার আড্ডার ব্যবস্থা।

ঘরটি চমৎকার। কার্পেট পাতা। বেসিনের ব্যবস্থা। হিটারও আছে। আর বিছানায় বালিশের পাশে রাখা একখানা বাইবেল। শেষ' শয়নে আমাদের দেশে মাথার কাছে গীতা দেওয়া নিয়ম; আর এই হোটেলের বিশেষ অতিথির ক্লান্ত শয়নে বোধকরি এই বাইবেলের ব্যবস্থা।

কাছেই রেষ্টরেণ্টে গিয়ে কিছু মুখে গুঁজে ক্লান্ত হ'য়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়; মাথার কাছের বাইবেলখানাকে মেলে ধরলাম চোখের সামনে। আশ্চর্য, খুলতেই চোখে পড়লো, সারমন অন দ্য মাউণ্ট: লভ দাই নেবার।

পাতাটা উল্টে দিলাম।

কেম্ব্রিজ সত্যিই মনোরম। না দেখলে মনে হয়, আপনি কী হারাইতেছেন, আপনি তাহা জানেন না।

বৃষ্টি-ধোয়া ছোট্ট সহরটা প্রথম সূর্যের নরম আলোয় পরমানন্দে বিকশিত। পার্কে ফুলগুলির মুখে রঙিন হাসি; সরু খালটায় একটানা জলরাশি; আর দোকানে-দোকানে খদ্দেরের ঠাসাঠাসি। সবাই কর্মতৎপর।

আমিই বেকার। ব্রেকফাষ্ট সারা হয়েচে। ভরা পেট। মনও ভরচে ক্রমেই। এগিয়ে চললাম লেকের দিকে বাঁকা পথে, মাঠের পাশ দিয়ে, ঝোপের কাছ দিয়ে। পথে একদল ছেলের সঙ্গে দেখা। জানিয়ে গেল, মর্নিং।

মর্নিং।

দুটো মেয়ে পাশ দিয়ে গেল। তারাও জানালো মর্ণিং।

আর একটু এগিয়ে দেখা হ'লো এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে। হাতে ছিপ, কাঁধে ব্যাগ : মর্ণিং।

মর্ণিং। মাছ ধরতে চলেচেন বুঝি?

হ্যাঁ। আপনি?

লেক দেখতে।

দেশ কোথায়?

ইণ্ডিয়া।

বেশ, বেশ। এই পথে সোজা গেলেই লেক পাবেন। গু'বাই।

উইশ ইয়োর হ্যাপি ডে।

থ্যাংকু!

ভদ্রলোক বাঁয়ে বেঁকলেন, আমি সোজা চললাম।

আহা, অপূর্ব। ডারওয়েট ওয়াটারের লেকের ধারে বেঞ্চটায় বসলাম, শেষ বেঞ্চে। সূর্যি আবার মেঘে ঢাকা প'ড়েচে, শীতে বুঝি আবার লেপের মধ্যে ঢুকলো। কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টিতে গাছপালা সব ধোয়া। চকচকে, ধকধকে। নীলের জলের ধারে ধারে ধূসর পাহাড় জল আটকে দাঁড়িয়ে—বাইরে যাওয়া নিষেধ। ঢেউগুলো তাই অবিশ্রান্ত পায়ে লুটিয়ে বলচে তাদের : দাও না ছেড়ে, পায়ে পড়ি। কিন্তু পাষাণগুলো কানেও তুলচে না কথা। ইংরেজের পাহাড়গুলোও ভাবি কর্তব্য জানে।

দূরে এখানে বসলে লেকের সবটা দেখা যায়। উঠে, ঝোপের ধারে, গাছের আড়ালে একটা বেঞ্চে বসলাম। গাছের ফাঁকে ফাঁকে পাতার আড়াল দিয়ে দেখতে লাগলাম লেকের জলের ঢেউ তোলানো খেলা। স্বল্প বেশে দেহ-খেলানো মেয়েকে একটু দেখলেই সব দেখা যায় ফুরিয়ে, কিন্তু ঘোমটার ফাঁকে সুন্দর মুখখানি এক ঝলক দেখলেই, দেখবার তৃষা যায় বেড়ে। প্রকৃতি দর্শনেরও ঐ একই রীতি।

কাছেই জন রাস্কিনের স্মৃতি-ফলক। তাঁর প্রতিচ্ছবি পাথরে খোদাই

করা ; আর তাঁরই ক'টি লেখা : আমার জীবনের প্রথম ঘটনা, যা আমার আজো মনে পড়ে—তা হ'চ্ছে, আমার নার্স আমাকে বেড়াতে নিয়ে আসতো এই ড'রওয়েন্ট ওয়াটারের ধারে।

আরো হয়তো খানিকক্ষণ বসতাম। কিন্তু দেখি, এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা কোমর জড়াজড়ি ক'রে এসে উপস্থিত হ'লো সেখানে। এই মনোরম নির্জন জায়গাটুকুর দরকার আমার চাইতে ওদেরই বেশি।

আমি স'রে এলাম।

কেম্ব্রিজ থেকে ম্যাঞ্চেষ্টারের পথটা অতি চমৎকার। কেণ্ট নদী পার হ'য়ে, ক্যানডেল সহরের ভিতর দিয়ে, গ্রাসমেয়ারের ধার ঘেঁসে, উইণ্ডারমেয়ার লেকের পাড় দিয়ে যেতে যেতে মনে হয়, এ পথ যেন শেষ না হয়। জলে ঘোরানো চাকা পড়লো চোখে, গ্রাসমেয়ারে যে পাথরের উপর ব'সে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখতেন কবিতা, সেটাও দেখা পেলাম।

পাথরটার পরিচয় পেতাম না, যদি না বাসের ড্রাইভারটি আমাকে বলে দিতো। লোকটা তার পাশের সীটে আমাকে বসিয়ে সব চিনিয়ে দিতে লাগলো। ভারি গপ্পে লোকটা। একসময় উইণ্ডারমেয়ারের লেকের ওপারে একটা উঁচু পাহাড় দেখিয়ে বললো, কী দেখচো বলো তো?

বললাম : পাহাড়।

বললো : উঁহু। একটা মেয়ে পিয়ানো বাজাচ্চে। দেখো লক্ষ্য করে।

দেখলাম লক্ষ্য ক'রে—পাহাড়ের মাথায় পাথর কয়েকটা সেইরকমই রূপ নিয়েচে বটে। হেসে বললাম : তোমার চোখ আছে তো বেশ।

ড্রাইভারও রসিকতা ক'রে বললো : রোজ ওয়ার্ডসওয়ার্থের বাড়ির ধার দিয়ে যেতে যেতে আমার চোখেও কবির দৃষ্টি এসে গেচে।

তাই নাকি? বললাম : এবার তাহ'লে একটু-আধটু কবিতাও লিখো।

হেসে বললো : তা হয় না। এই ষ্টিয়ারিং ধরা হাতে কলম ধরা বড় শক্ত।

ক্যাণ্ডেল সহরে আসতেই ড্রাইভার বললো : এইখানে বিখ্যাত কে-শু অর্থাৎ কে-মার্কা জুতো তৈরি হয়।

সহরের পাশ দিয়ে একটি সরু নদী। কেণ্ট নদী।

এক প্যাকেট সিগ্রেট কিনলাম। কণ্ডাকটারও আমাদের গল্পে যোগ দিয়েছিল। একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ড্রাইভার, কণ্ডাকটারের সিগ্রেট ধরিয়ে আমারটা ধরাতে যাবো, ড্রাইভার ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলো সেটা: একটা কাঠিতে তিনটে সিগ্রেট ধরাতে নেই, থার্ড ম্যান কবরে যায়। —সেই বিলেতী কুসংস্কার।

ম্যাঞ্চেষ্টারে এলাম বিকেলে। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান-এর জন্মস্থান এই সহরেই। বিশ্বখ্যাত সংবাদপত্র। তাছাড়া সহরটা কাপড় কলের আড়ৎ। এই সহরের কাপড় কলের জন্যেই একদা ঢাকা সহরের তাঁতীদের বুড়ো আঙুল কাটা গেছ্‌লো। তবু শেষপর্যন্ত ইণ্ডিয়ানরা এদের বুড়ো আঙুল দেখালো; ভারতের বাজার থেকে প্রায় ঝেঁটিয়ে বিদায় করলো লাট্টু মার্কা কাপড়।

এবার ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে শেফিল্ড, সেখান থেকে বার্মিংহাম। ইংলণ্ডের এই দুটি সহরই যন্ত্রের সাধনায় মগ্ন। শেফ নদীর ধারে শেফিল্ড-এর আর এক নাম 'সিটি অফ ষ্টীল'—ইস্পাত-নগরী। ষ্টীলের ছুরি কাঁচি তৈরি করায় সিদ্ধহস্ত এখানকার কারিকররা। তা ব'লে, ইংরেজ রাজনীতিবিদরা অন্যদেশের বুকে ছুরি বসাবার জন্যে কিংবা অন্যদেশের পকেট কাটবার জন্যে এই সব ছুরি-কাঁচি ব্যবহার করেননি। শেফিল্ডের ছুরি-কাঁচির ভারি সুনাম অন্যান্য দেশে।

বার্মিংহামের কলকব্জার জন্যে ইংরেজ সত্যিই মনে 'হাম বড়াই' ভাব আনতে পারে। বাইরের টাকা দেশে আনবার জন্যে বার্মিংহামে প্রস্তুত যন্ত্রই একমাত্র মন্ত্র এবং সে মন্ত্র সাধনে ইংরেজ আজ সিদ্ধপুরুষ। ইংল্যাণ্ড তো এক ফোঁটা দেশ; বাস করতেই জায়গা কুলোয় না, চাষ করবার জমি কোথায়? কাজেই এই বার্মিংহামের লোহার ফসল পেটের জন্যে ফসল আনে ঘরে।

ম্যাঞ্চেষ্টার, শেফিল্ড, বার্মিংহাম,—এই তিনটে সহরেই ইংরেজের আসল রূপ দেখা যায়। কালচে সহর, ধোঁয়াটে আকাশ—যেন ইংল্যাণ্ডের কীচেন। এসব সহরে কারিকর ইংরেজের আদব কায়দা নেই, ড্রেসের পরিপাটি নেই, ডিনার টেবিলের ভড়ং নেই। নীল ওয়ার্কিং ড্রেস প'রে, কালি-ঝুলি মেখে ইংরেজ পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে যান্ত্রিক ফসল ফলাতে ব্যস্ত।

ঐ তিনটে সহরকে যখন 'কিচেন'ই বললাম, ত'ব এও বলি, লেক ডিষ্ট্রিক্ট এদের সাজানো বাগান ; লণ্ডন এদের ড্রইংরুম।

আবার লণ্ডনে।

বিকেলে ইণ্ডিয়া হাউসের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখি, সদর দরজা বন্ধ। বাইরে লাইন ক'রে দাঁড়িয়ে বহু ভারত-পুত্র-পুত্রী। কী ব্যাপার।

দেওয়ালি উৎসব। একটু পরেই দরজা খুলবে। দাঁড়িয়ে পড়ো।

বেশ, বেশ। বহুদিন পরে ভারতীয় নাচ-গান শোনা যাবে। দাঁড়িয়ে পড়লাম, শেষের ভদ্রলোকের পেছনে।

একটু অন্যমনস্কই ছিলাম। হঠাৎ বীণা-নিন্দিত স্বরে চমক ভাঙলো :

হোয়াটস আপ হিয়া' প্লীজ ?

হকচকিয়ে পেছন ফিরে দেখি শাড়ী পরা এক ভারত-কন্যা। কিন্তু কথার টান একেবারে মেমসাহেবী।

বললাম, দেওয়ালী ফেষ্টিভ্যাল।

ইজ ইট। আমার পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন তরুণী।

একটি মেয়ের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা অভদ্রতা নয় কি ? তাই ঘুরে দাঁড়ালাম, শুরু করলাম টুকিটাকি কথা।

কিন্তু তরুণী ফর ফর ক'রে ইংরেজী বলতে লাগলেন, যেন সসপ্যানে খৈ ফুটচে। আমি বাংলা টানের ইংরেজীতেই কাজ চালাতে লাগলাম। মেয়েটি কোন দেশি রে বাবা। অথচ মুখখানিতে কেমন যেন বাঙ্গালী-লাবণ্যের তুলি বোলানো।

জিগ্যেস করায় বললেন : আ'ম ফ্রম বেঙ্গল।

তাই বলুন। বাঙালী।

হেসে বললেন : হুঁ।

আমি হেসে ফেললাম : এতক্ষণ দুজনে বোকার মত ইংরেজীতে আলাপ ক'রে গেচি। আশ্চর্য। বললাম : তা যাই বলুন, আপনার ইংরেজী উচ্চারণ কিন্তু একদম মেমসাহেবী।

তরুণী হাসলেন : আগে ছিল না। এদের হষ্টেলে থেকে এই উপকারটা হ'য়েচে। তাছাড়া কত যে ইংরেজি ভুল বলতাম। ওরা বুঝিয়ে দিয়েচে।

যথা ?

একদিন হাত থেকে চুড়ি খোলার সময় বললাম, উইল ইউ প্লীজ ওপেন মাই ব্যাংগেল ? ওরা বললে : ওপেন হবে না, হবে 'টেক অফ'। চুল আঁচড়ানোকে ওরা শিখিয়ে দিলে, হেয়ার-ডু। এমনি আরো কত কি ?

তরুণীর খোলা মনের কথাগুলি শুনে ভালোই লাগলো। সাজের ঘটাঘটি আছে মেয়েটির, কিন্তু চলনে-বলনে চাল নেই। কাজেই গল্প চালাতে গিয়ে হোঁচট খেতে হলো না।

তরুণীর নাম কল্যাণী। দু' বোনই বিলেতে। দিদি ডাক্তারী পড়চেন। ইনি আইন। বালিগঞ্জের দেশপ্রিয় পার্কের কাছেই বাড়ি। আরো বছরখানেক থাকতে হবে।

বললেন : আর ভালো লাগে না। স্যাঁতসেতে আকাশ, প্যাচপ্যাচে পথ, আর টেবিলে সেদ্ধ খাওয়া। আপনি ক'দিন থাকবেন ?

বললাম : এবার যাবার সময় হ'লো।

হেসে বললেন : বাঁচবেন। রদ্দুরের মুখ দেখে বাঁচবেন, ডাঁটা চচ্চড়ি চিবিয়ে মুখ বদলে বাঁচবেন। সেই শুভদিন শীঘ্রী আসুক আপনার। বাপস্, এমন জ'লো আর পানসে দেশ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

বুঝলাম, খাঁটি বাঙ্গালী মেয়ে কথা বলতে শুরু করেচেন।

এমন সময় দরজা খুলে গেল ইণ্ডিয়া হাউসের।

সবাই হলে গিয়ে বসলাম। কল্যাণী আমার পাশে। কয়েকজন সাহেব মেমও এলেন। বেহালা, তবলা, বাঁশি হ'লো। হ'লো লোক নৃত্য, গরবা-নৃত্য, কথক-নৃত্য। বহুদিন পরে বড় ভালো লাগলো ভারতীয় নৃত্য-কলা। আহা, আমার দেশের গীতবাদ্য-নৃত্য কলা। সাহেব-মেমগুলির দিকে মাঝে-মাঝে দেখতে লাগলাম, তাদের ভাবখানা। না, তারাও মনে হচ্চে গভীর মনোযোগ দিয়েই দেখচে আর শুনচে।

এবং হঠাৎ হলের এক কোণে নজর পড়তেই দেখি, কয়েকজন তরুণ সতৃষ্ণ নয়নে দেখচে কল্যাণীকে। তা' কল্যাণীর রূপ দেখবার মতই।

আমি নিজের টাইটা ঠিকঠাক ক'রে ন'ড়ে চ'ড়ে ভাল হ'য়ে বসলাম।

কয়েকদিন পরে।

ঘরে ব'সে ডাইরী বইয়ের পাতা ওল্টাতে গিয়ে চোখে পড়লো মিঃ এবং

মিসেস ওটওয়ের ঠিকানা। এই ইংরেজ দম্পতির সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল ইতালীতে নেপলস বা নেপলি সহরে। একই হোটেলে আমরা অধিষ্ঠান করেছিলাম প্রায় পাঁচ-ছ' দিন। একসঙ্গে ভিসুভিয়াস, পম্পাই দেখতে যাওয়া, একসঙ্গে হোটেলে রেষ্টুরেণ্টে খাওয়া—যেন হরিহর-আত্মা হ'য়ে গেছলাম।

ইংরেজ নিজের দেশে বরফের মত ঠাণ্ডা, কিন্তু বিদেশে যেন ঝর-ঝর ঝর্ণা। দুজনেই প্রায় বললেন: স্যার, বলবো কি, আজ প্রায় ফর্টনাইট কারোর সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা বলতে পারিনি। ইংল্যাণ্ডের বাইরে দেখচি, কেউ ইংরেজিই জানে না। তোমার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা ব'লে বাঁচলাম।

বললাম: আমার অবস্থাও প্রায় তাই। তোমাদের প্রাক্তন প্রজা হিসেবে তোমাদের মাতৃভাষা প্রায় আমাদের মাতৃভাষারই সামিল, ইফ নট মোর; অতএব—

অতএব প্রাণখুলে আমাদের আলাপ পরিচয় হ'লো।

কথায়-কথায় জানা গেল, বৃদ্ধা মায়ের জন্যেই তাঁরা এতদিন ইংল্যাণ্ডের বাইরে বেরুতে পারেন নি। তিনি সম্প্রতি মারা গেচেন, এবং তাঁদের মুক্তি দিয়েচেন। তাই এই তাঁদের প্রথম বিদেশ ভ্রমণ।

ভদ্রলোক প্রৌঢ়, কিন্তু স্ত্রীটি ভরা-যৌবনা। অতএব স্বভাবতই ভদ্রলোকের স্ত্রীভক্তি দেখবার মত। এমন বেমানান স্বামী-স্ত্রী দেখে মনে একটু খটকা লেগেছিল, কিন্তু ভদ্রলোকই কথার ফাঁকে বললেন, ডার্লিং আমার দ্বিতীয় পক্ষের। ব্রিষ্টলের মেয়ে; এবং আর পাঁচটা মেয়ের মত ধিঙ্গি বা উড়োনচণ্ডী নন। ডার্লিং আমার শান্তি-সুধা। ইজনট ইট ডার্লিং?

উত্তরে ডার্লিং স্বামীর মুখচুম্বন করলেন।

তারপর, তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে দুটি সিগ্রেট বার ক'রে আমাকে একটা দিয়ে, আর একটি নিজের লিপষ্টিক রাঙানো ঠোঁটে আটকালেন।

স্বামীটিকে জিগ্যেস করলাম: মিষ্টার কি স্মোক করেন না?

না। মিষ্টার বললেন: তবে অন্যের স্মোকিংয়ে আমার কোন আপত্তি নেই।—হেসে বললেন: আজকাল স্মোক না করাটাই আপত্তিকর; নয় কি? আজকাল মেয়েরাও পুরোদমে ধুমপান চালিয়েচে। যুদ্ধের কুফল। আর চুলগুলো ছেঁটে ফেলেচে একেবারে পুরুষদের মত ছোট ক'রে।

স্ত্রী দেখলাম, রাগ করলেন না। বরং হেসে বললেন আমাকে : আসল কথাটা কি জানো ? এই কর্মব্যস্ততার যুগে মেয়েদের চুল আঁচড়াবার সময় কোথায় ? আর স্মোকিং ? কাজের ফাঁকে একটু দম নেওয়া আর দমছাড়া।

হেসে বললাম : ঠিক, ঠিক, যুক্তিটা অকাট্য।

এই বেমানান দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়, তাঁরা আমাকে তাঁদের ইংলণ্ডের ঠিকানা লিখে দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, জার্মানী, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ঘুরে আমি যখন ইংল্যাণ্ডে যাবো, তখন যেন নিশ্চয়ই তাঁদের খবর দিই : এবং মিসেস একটু বেশি বলেছিলেন, তোমার জন্মে আমরা কিন্তু অপেক্ষা ক'রে থাকবো।

কিন্তু এতদিনে সেই খবর দেবার কথা খেয়াল হ'লো।

বাড়ির কাছেই রাস্তায় একটা টেলিফোন ঘরে গিয়ে কানে রিসিভার চেপে নম্বর মাফিক ডায়েল ঘুরাতেই কানে এলো সেই পুরোনো গলা : হ্যালো। হু আর ইউ প্লীজ ?

পরিচয় দিলাম।

আরে তুমি। কবে এলে ইংল্যাণ্ডে ? ভালো তো ? কোথায় আছো ?

বললাম সব। কিন্তু তারের অপর পার থেকে এলো অনুযোগের সুর : হাউ ইজ দ্যাট ? তুমি এতদিন এসেচো, আর আমাদের খবর দাওনি ? আমাদের খবর দিলেই এখানে তোমাকে নিয়ে আসতাম। যাক, তুমি চ'লে এসো। আশাকরি তোমার এখানে কোন অসুবিধে হবে না। রাইট ?... দাঁড়াও, দাঁড়াও, জাষ্ট এ মিনিট। ডার্লিংকে খবরটা দিই।

ফোন ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরেই : হ্যালো, তুমি কালই চলে এসো তোমার জিনিষ পত্র নিয়ে। এক্সট্রা ঘর আছে, ভারি খুশি হবো একসঙ্গে থাকতে পাবলে।

বললাম : খুশি আমিও হ'তাম। তবে কিনা কাজের চাপে এতদিন দেখা করতে পারিনি। সেজন্যে সত্যিই দুঃখিত। তবে যাবোখন, নিশ্চয়ই দেখা ক'রে আসবো।

অপরপার থেকে : ও প্লীজ্ কাম উইথ অল্ ইয়োর ব্যাগস এণ্ড ব্যাগেজেস।

বললাম : ইংল্যাণ্ডের দিন আমার শেষ হ'য়ে এলো প্রায়। এ ক'টা দিনের জন্যে আবার...

বেশ, তবে কাল শনিবার তুমি আসবে, রবিবারটা থাকবে, সোমবার ছুটি পাবে। রাইট?

বললাম : শনিবারে একটু কাজ আছে। রবিবারে বরং হোলডে কাটিয়ে আসবো। বলো, তোমাদের ওখানে যাবার উপায়।

মিসেস তখন বোঝাতে শুরু করলেন। হ্যামষ্টেড থেকে কোন বাসে পিকাডিলি যেতে হবে, সেখান থেকে আবার কোন বাস ধরতে হবে; এবং নামতে হবে কোথায়। বললেন : ঐ জায়গাটার নামই ষ্ট্রেথেন। বাস ষ্টপ থেকে নেমে সোজা খানিকটা এগুলেই মাউণ্ট নড রোড। তারপর মনে আছে তো নম্বরটা? ২৯ নং বাড়ি। দেখ, ঠিক পারবে তো আসতে?

পারবো।

বাস নম্বর নোট ক'রে নিয়েচো?

নিয়েচি।

দাঁড়াও, আর একবার ব'লে দিই...

এমন সময় পেছনে কাঁচে ঠক ঠক আওয়াজ হ'লো। পেছনে ফিরে দেখি দু' তিন জন লাইনে দাঁড়িয়ে গেচে, ফোন করবার জন্যে।

বললাম : লোক ওয়েট করচে ফোন করবার জন্যে। আমি ঠিক যেতে পারবো। এতদুর যখন আসতে পারলাম, আর এইটুকু যেতে পারবো না? আচ্ছা, ছেড়ে দিই—?

না না। ওদের কাউকে একটু ধরতে বলো ফোনটা, তাকে বুঝিয়ে দিই ডিরেকসনটা, সে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে। তবে এই রবিবার—ঠিক তো?

ঠিক।

পেছনের ভদ্রলোককে ঘরের ভিতর ডেকে এনে তার হাতে রিসিভারটা দিয়ে অনুরোধ করলাম, একটু বুঝে নাও তো ডিরেকসনটা। এক ভদ্রমহিলার অনুরোধ।

ভদ্রলোক মৃদু হেসে রিসিভারটা কানে দিয়ে সব বুঝে নিয়ে আমাকে বললেন : তুমি বাইরে দাঁড়াও। আমার ফোনটা সেরে তোমার ডিরেকসনটা বুঝিয়ে দেবো।

বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

রবিবারে ব্রেকফাষ্ট সেরে হাতড়ে হাতড়ে উপস্থিত হলাম ওটওয়ে-ভবনে। বেশ বড় বাড়ি। বাড়িটার সামনে বাগান। গেট খুলে বাগানের ভেতর দিয়ে গিয়ে দরজায় কলিং বেল টিপলাম।

দরজা খুলে গেল ; দেখা গেল মিসেস ওটওয়ের হাসি ভরা মুখ : হ্যালো মিঃ গস্—গু'মর্ণিং।

মর্ণিং।

তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে কর্তা : গু'মর্ণিং মিঃ গস্।

কাম ইন প্লীজ।

ভিতরে ঢুকলাম। সদর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে আমাকে নিয়ে বসালেন ড্রইংরুমে। চমৎকার সাজানো ঘর। মোটা কার্পেট পাতা। ফার্ণিচারগুলি যেখানে যেটি থাকা দরকার, রয়েচে। ফায়ার-প্লেসে আরামের আগুন। সামনে আরাম ক'রে বসবার সোফা সেট।

একটায় আরাম ক'রে বসলাম।

শুরু হ'লো গল্প। সেই নেপলস-এর গল্প দিয়ে শুরু হ'লো। কিন্তু শেষ হবার নাম নেই। সিগ্রেট, ড্রিংক, কফি মাঝে-মাঝে টাকরা হিসেবে চলতে লাগলো।

বাড়িতে থাকবার মধ্যে ঐ দুটি প্রাণী মাত্র। আর একটি প্রাণী পুশি বেড়াল। কালো বেড়ালটা আমার পায়ের কাছে বসেই চোখ বুজে আগুন পোয়াচ্ছিল। মিষ্টার এবং মিসেস তাঁদের পুশি বেড়ালের গল্প করতেই নিলেন প্রায় দেড়টি ঘণ্টা। বেড়াল ব্রেকফাষ্টে, লাঞ্চে, ডিনারে কী খায়, ঘুম পেলে কী করে, বাথরুম পেলে কি ইঙ্গিত দেয়, আবার বাথরুম থেকে ফিরে এলে কেমন ক'রে দরজা আঁচড়ায়—তার সুবিস্তৃত বিবরণ মিসেস দিয়ে গেলেন এবং মিসেসের বিবরণের ব্ল্যাংকসগুলি ফিল-আপ করলেন মিষ্টার।

ভাবছিলাম, আমাদের দেশী বেড়ালের ভাগ্যে কখনো-সখনো শিকে ছিঁড়ে মাত্র, কিন্তু এই সব বিদেশী বেড়ালের ভাগ্যে সর্বক্ষণই স্বর্গসুখ।

বাড়ির পেছনে ছোট্ট বাগান। নানারকমের ফল-ফুলের গাছ। কর্তা-গিন্নী সব ঘুরিয়ে দেখালেন। ষ্ট্রবেরি, র‍্যাস্পবেরি, পীচের গাছ দেখে চোখ সার্থক হ'লো। ডেজি, লিলি, ক্রিসামথিমাম, রডোডনড্রেন—বহু রকমের ফুল আর ফুলের গাছ চিনিয়ে দিলেন দু'জনায়। একটি মনের

মতন ইণ্ডিয়ানকে পেয়ে ইংরেজ দম্পতি হাতে যেন চাঁদ পেয়েচেন মনে হ'লো।

বাগান থেকে ঘুরে এসে মিসেস বললেন : ডিয়ার, তুমি ডার্লিংয়ের সঙ্গে গল্প করো, আমি লাঞ্চের ব্যবস্থা ক'রে আসচি।

আমরা বসলাম এসে ড্রইং রুমে। তবে আমি সোফা'য়, আর ভদ্রলোক একেবারে মাটিতে কার্পেটে। সেলফ থেকে বার করলেন ফটো-সাঁটা তিন চারখানা এলবাম। দু'জনের এবং দু'জনের আত্মীয় স্বজনের বহু রকমের ছবি; কোথায় কোন ছবি তোলা, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়ে গেলেন ; আমি গিলতে লাগলাম। মিসেসও মাঝে-মাঝে এসে দু' একখানা ফটোর স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রীর বর্ণনা দিয়ে আবার বিদায় নিয়ে গেলেন কীচেনে।

অবশেষে লাঞ্চের সময় হ'লো।

অমন যাদের বাড়ি, ফার্ণিচারের সারি—শুধু তাই নয়, সব ঝকঝকে, চকচকে, তকতকে—অথচ আশ্চর্য, বাড়িতে ঝি বা চাকর নেই। হ্যাঁ গা, বাড়িতে যেমন রেডিও না থাকলে মান থাকে না, টেলিফোন না থাকা বেমানান, তেমনি নিদেন পক্ষে একটা ক'রে ঝি-চাকর বা ঠাকুর না থাকলে গেরস্ত বাড়ির সংসার মানায় ? আর লোকেই বা বলবে কি। বলবে কঞ্জুষ। আর গিন্নী বলবেন, দাসী-বাঁদীর মত খেটে খেটে আমার সোনার অঙ্গ কালি হ'য়ে গেল।

তবে বিলিতী মেয়েদের অঙ্গ বোধ হয় রোদ্দুরগোষ্ঠের নয় ; আর বুড়ো থেকে কচি সবাই ঘড়ি ধ'রে ঘোড়-দৌড় করে—এমন কি, খাওয়া-শোওয়া, হাসি-কাশি পর্যন্ত ঐ ঘড়ির মুখ চেয়ে করে তাই ঝি-চাকরকে সহজেই ডোণ্ট-কেয়ার করতে পারে। তাছাড়া স্বামীগুলো তো এদেশী 'পরম গুরু' নয়, স্রেফ ডার্লিং বা হনি—পার্টনার। তারা স্ত্রীকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় চায়ের হুকুম করে না, ছুটির দিনে বিকেল পর্যন্ত স্ত্রীকে না খাইয়ে রাখে না ; তাছাড়া বাথরুমে গিয়ে দাড়ি কামায়, সিগ্রেটের ছাই ফেলে না যেখানে সেখানে, টেবিল অগোছালো করা ভাবতেও পারে না।

আর জুতো-জামার তদারক? নিজেরাই করে। ব্যবসায়ীরাও গিন্নীদের দুঃখ বোঝে। তাই ঘর-ঝাড়তে ভ্যাকুয়াম ক্লীনার, রস করতে প্রেস, তরকারি কুচোতে স্লাইসার, এমন কি কৌটা ভরতি সেদ্ধ বীন, সেদ্ধ মাছ, স্লাইসড রুটি ইত্যাদি গিন্নীদের সুবিধের জন্যে হরেক রকম হদিস ব্যবসাদারেরা মাথা ঘামিয়ে বার ক'রেচে।

সুতরাং বিলিতী সংসারে ঝি-চাকর না থাকা দৃষ্টি-কটু নয়; বরং মধ্যবিত্ত ঘরে মেড রাখা, বা 'বয়' পোষা বিলাসিতা।

এবাড়িতে ওটওয়ে দম্পতি তাই চারহাত-পায়ে সংসারের কাজ কর্ম করেন এবং তাঁদের এই ভারতীয় অতিথি ও বন্ধুর জন্যে দু'জনে মিলে অভ্যস্ত হাতে দেখলাম, অতি সহজেই ডাইনিং টেবিল গুছিয়ে ফেললেন।

টেবিলে এলো, কাঁটা, চামচ, ছুরি, হরেক রকমের চায়না আর স্লাইস করা রুটি, মাখন, চীজ, স্যুপ, রোষ্ট বীফ, তাছাড়া ভেজিটেবল স্যাণ্ডুইচ, ফ্রাইড পটেটো, টার্ট কেক আর চায়ের সরঞ্জাম। উপরন্তু একটি ফুল সাজানো ফুলদানি। ইংরেজের খাবার টেবিলে ঐ বস্তুটির বিশেষ আদর। ছোট ছেলেরা যেমন কোলে শুয়ে পাখি দেখে আর দুদু খায়, ইংরেজরাও তেমনি খাবার টেবিলে ব'সে ফুল না দেখলে মুখে চামচ তুলতে পারে না।

ইংরেজ পরিবারে নিমন্ত্রণ। এখানে আশা করা অন্যায়, কর্তা সামনে ব'সে গল্প করবেন আর গৃহিনী হাতপাখা নিয়ে সামনে ব'সে বলবেন, এটা খান, ওটা খান। মিসেস ওটওয়ে বললেন: এসো খেতে বসি।

সবাই বসলাম। এবং মিসেস একখানা রুটির ফালিতে মাখন লাগিয়ে তাঁর মুক্তাবৎ দাঁতে কামড় বসিয়ে বললেন: আ মিঃ গস্, আই ওয়াজ সো হাঙ্গ্রী।

হেসে বললাম: সে তো দেখেই বুঝচি।

মিসেস বললেন: আমার মনে আছে তুমি নেপল্‌সে কথায়-কথায় বলেছিলে, তুমি ভেজিটেরিয়ান। আমি তাই তোমার জন্যে ভেজিটেবিল ডিশেরই ব্যবস্থা করেচি। ঐ ভেজিটেবিল স্যাণ্ডুইচগুলো আমার স্পেশাল প্রিপারেসন—

আমি একটা স্যাণ্ডুইচ তুলে নিয়ে বেশ খানিকটা গলধঃকরণ ক'রে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললাম: চমৎকার। ডিলিসাস।

থ্যাংকু।

মেয়েরা খুশি হন রান্না আর রূপের প্রশংসায়। জানা ছিল সেটা।

কিন্তু টর্ট কেক খেতে গিয়েই বিপদ হ'লো। চামচ দিয়ে খানিকটা কেটে নিতে গিয়ে আঙুলে সামান্য ক্রীম লেগে গেল ; আর পড়বি তো পড় মিসেসের চোখে গেল প'ড়ে।

এ-হে-হে, হাতে লেগে গেল ?

অপ্রস্তুত হ'য়ে বললাম : তা একটু গেল।

মিষ্টার বললেন : ঠিক আছে, লাঞ্চ শেষ হ'লে ধুলেই হবে।

ভাগ্যিস, লাঞ্চ প্রায় শেষ হ'য়েই গেছলো। সবার চা পান শেষ হ'তেই মিসেস উঠে দাঁড়ালেন। বললেন আমাকে : চলো ডিয়ার, বেসিনে হাতটা ধুয়ে নেবে।

চলো দেখি।

যদিও বেশ বুঝচি, হাতের আঙুলে একটু ক্রীম বা রস লেগে যাওয়া এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার নয়। কিন্তু উপায় নেই।

মিসেস একটি ঘরের দরজা ঠেলে আমাকেও ঢোকালেন। চমৎকার প্রশস্ত বাথরুম। বাথটাব, শাওয়ার, কমোড, বেসিন, আর্শি, তোয়ালে, সাবান, লোশন, শেভিং-সেট চিরুণী সব সাজানো। কাঠের পালিশ করা মেঝের খানিকটা জায়গায় কার্পেট বিছানো।

মিসেস বেসিনের কাছে নিয়ে গিয়ে সাবানটা আমার হাতে দিলেন। আমি গরম জলের কলটা খুলে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললাম। এ যেন, ছোট ছেলে রাস্তায় কাদামাটি ঘেঁটে এসেচে, তাই জোর ক'রে তার হাত ধোয়ানো হচ্চে।

তোয়ালেটা আলনা থেকে নিয়ে হাত মুছে রাখতে যাবো, মিসেস হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন : ওকি, হ'য়ে গেল তোমার হাত ধোয়া! হাতে এখনো জল লেগে রইলো যে।

তারপর, আশ্চর্য, আমার হাত থেকে তোয়ালে নিয়ে বললেন : দেখি তোমার হাত মুছিয়ে দিই।

তাড়াতাড়ি বললাম : লেট মি ডু ইট মিসেল্‌ফ।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। মিসেস ততক্ষণে আমার হাতের আঙুলগুলো এক-এক ক'রে তোয়ালে দিয়ে মোছাতে শুরু করেচেন। দশটা আঙুল খটখটে ক'রে মোছা হ'লে মিসেস বললেন : চলো ডিয়ার,

লাউঞ্জে গিয়ে বসা যাক।

জানি, আমাদের দেশে গুরুদেব এলে, তাঁর পা ধুইয়ে মুছিয়ে দেবার রীতি আছে। তবে অতিথি সেবার দিক দিয়ে ইংরেজও দরকার হ'লে পেছিয়ে থাকে না, সে ধারণা সেদিন হ'লো।

আমরা লাউঞ্জে এসে বসলাম।

মেঘলা দুপুর।

ফায়ার প্লেসের সামনে বসে আবার গল্প শুরু হ'লো। আমাদের দেশের গল্প, ওদের দেশের গল্প। প্রাণখোলা আলাপ-আলোচনায় দুপুর গড়িয়ে এলো বিকেলে।

মিষ্টার ওটওয়ে জিগ্যেস করলেন তাঁর ডার্লিংকে: মিঃ গসকে নিয়ে আমাদের এই কোয়ার্টারটা ঘুরিয়ে দেখালে কেমন হয়? আর, সন্ধ্যাবেলায় আমাদের ক্লাবে এবং লাইব্রেরিতে নিয়ে গিয়ে একটু আলাপ পরিচয় করালেও মন্দ হয় না। ইজণ্ট ইট ডার্লিং?

মিসেস ভিটো দিলেন: ইয়েস। ইট উড বি ভেরি নাইস। হোয়াট ডু য়ু সে মিঃ গস্?

বললাম: যথা অভিরুচি। আমার কোন আপত্তি নেই। অতঃপর আমাকে মাঝখানে রেখে মিঃ এবং মিসেস বেড়াতে বেরুলেন এবং তাদের দ্রষ্টব্য সব ঘুরিয়ে দেখালেন আর জানালেন, এ অঞ্চল ইংল্যাণ্ডের একটি বনেদী পাড়া। পাড়ার সকলেই রেসপেকটেবল্, ওয়েল- টু-ডু পার্সনস।

অবশ্য পথ-ঘাট, দোকান-পাট, বাড়ি-ঘর, বাগ-বাগিচা দেখে সেই রকমই মনে হ'লো বটে। পথে দু' তিনজন পরিচিত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হ'লো। মিঃ ও মিসেস দেখলাম, সগর্বে পরিচয় দিলেন: আমাদের বিশিষ্ট ভারতীয় বন্ধু, সাহিত্যিক, মিঃ কে-ঘোষ।

বুঝলাম, আমাকে তাদের বন্ধু মহলে দেখানোই এই ভ্রমণের আর একটি মহৎ উদ্দেশ্য। এটা স্বাভাবিক। কোন সাহেব-মেম বাড়িতে এলে আমরাও তো উসখুস করি, পাড়ার সবাই দেখতে পেলো তো?

ক্লাবে এবং লাইব্রেরিতেও যথারীতি আমার পরিচয় দিলেন তাঁরা;

পরিচয় করিয়েও দিলেন। হাণ্ডশেকের পর্ব চললো কিছুক্ষণ। তবে ইংরেজের বৈশিষ্ট যা—মাপা হাসি, আর চাপা কাশি—দেখলাম নিজেদের মধ্যেও বেশ চালু।

ফেরবার পথে বললাম: এবার বিদায় নিলে কেমন হয়?

শুনে মিসেস যেন আকাশ থেকে পড়লেন: বলো কি ডিয়ার? এরই মধ্যে? রাত্রে ডিনার খেয়ে, গল্প ক'রে তারপর তো? তাই না ডার্লিং?

মিষ্টার ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন: তা আবার বলতে?

মিসেস যেন অভিমান ক'রে ঠোঁট ফুলিয়ে বললেন: কেন ডিয়ার, তোমার কি ভাল লাগচে না? আর ইউ ফিলিং—

তাড়াতাড়ি মিসেসকে বাধা দিলাম: না, না, ফিরতে দেরি হবে ভেবেই বলেছিলাম।

মিষ্টার বললেন: আমাদের কিন্তু তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করচে না।

মিসেস বললেন: সত্যিই তাই। তাছাড়া, ডিয়ার, তোমার মনে আছে তুমি নেপল্‌স-এ বলেছিলে, তোমার লেখা পড়াবে?

তাই নাকি? শুনে খুশিই হ'লাম। লেখা শোনাবার জন্যে লেখকরা তো মুখিয়েই থাকে, তবে শোনবার লোক পাওয়াই শক্ত। এখানে হাতের নাগালে এমন একজোড়া রেডি-মেড শ্রোতা আছে জেনে মনটা একবার নেচে উঠেই ধপাস ক'রে দমে গেল: মা'ম তোমাদের লেখা শোনাতে পারলে খুশিই হ'তাম, কিন্তু আজ তো লেখা কিছু সঙ্গে আনিনি।

মিসেস বললেন: ডোন্ ওরি ডিয়ার। সামনেই নিউ ইয়ার্স ডে। ঐ দিন তোমার নিমন্ত্রণ রইলো। আর ঐ দিন আশা করি তোমার লেখা শোনবার সৌভাগ্য আমাদের হবে। ইজণ্ট ইট ডার্লিং?

মিষ্টার সুবোধ বালকের মত সায় দিলেন।

আমিও কেন যেন ঘাড় নেড়ে রাজি হ'য়ে গেলাম।

ডিনারের পর ড্রিংক আর গসিপ শেষ ক'রে উঠলাম যখন, রাত তখন দশটা বেজে গেচে। ভেবেছিলাম, ওটওয়ে-যুগল তাঁদের সদর পর্যন্ত এসে আমাকে 'টা-টা' ক'রে বিদায় দেবেন। কিন্তু দেখি, তাঁরাও ওভারকোট

চাপাচ্চেন গায়ে।

জিগ্যেস করলাম : কী ব্যাপার ?

মিসেস বললেন : বা, তোমাকে এগিয়ে দিতে হবে না ?

এবং তাঁরা সদর দরজায় লক্ এঁটে আমাকে নিয়ে চললেন বাস ষ্ট্যাণ্ডে। সেখানে বাসে ক'রে এনে ঢোকালেন সাবওয়ের নর্দান লাইনের বালহাম ষ্টেসনে। তারপর, দেখি আমার সঙ্গে তাঁরাও দু'খানা টিকেট কাটচেন।

একি ?

চলো, তোমাকে গোটা দুই ষ্টেশন এগিয়ে দিই।

ফিরতে তোমাদের দেরি হ'য়ে যাবে না ?

উত্তর এলো : আ ডিয়ার, লেটস এনজয় ইয়োর কোম্পানী।

সাবওয়েতে তিনটে ষ্টেশন পার হ'য়ে, ক্লাপহ্যাম, নর্থ ষ্টেসন এলো।

হ্যাণ্ডশেক করলেন ওটওয়ে দম্পতি।

এগেন মিটিং ইউ অন নিউ ইয়ার্স ডে।

প্লীজ, ডোন ফরগেট টু ব্রিং ইয়োর রাইটিংস্।

বললাম : ও, নো, থ্যাংকু ভেরি মাচ। গু' বাই।

গু' বাই।

ট্রেনের অটোমেটিক দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। ট্রেন ছাড়লো।

শীতের রাত্রের বন্ধ কামরায় সবাই জড়োসড়ো হ'য়ে ঝিম মেরে বসে আছে। আমিও। দুলচে ট্রেনটা। মনটাও দুলচে আমার। ভাবছিলাম, ইংরেজ বন্ধুত্ব করতে রীতিমতই জানে, তবে সহজে বন্ধুত্ব পাতাতে চায় না।

মিসেস ল্যাফকেড বললেন : মিঃ হিন্দি কেম টু সী ইউ। বলে গেচে কাল সকালে আসবে বিটুইন নাইন টু টেন। তুমি যেন থেকো।

আচ্ছা।

সত্যিই অনেকদিন হিন্দির সঙ্গে দেখা নেই। হয়তো সে কোন কাজে আটকে গেচলো। অবশ্য এতদিনে আমিও বেশ সাবালক হ'য়ে উঠেচি। লণ্ডনের পথঘাট অলি-গলি আর আমার অজানা নয়। লণ্ডনের কোথায়

ফাঁদ, কোথায় চাঁদ—কিছু কিছু তার আভাস পাওয়া গেচে। কাজেই হিন্দির বিরহ অনুভব করিনি এতদিন, তবে দেখা করতে এসেছিল জেনে খুশিই হলাম।

যথাসময়ে হিন্দি এসে বললো: হ্যালো ঘোষ, চলো একটু বেরুই, দরকার আছে।

কী ব্যাপার? জিগ্যেস করলাম।

বললো: একটু হসপিটালে যেতে হবে আমার সঙ্গে।

হসপিটালে? কেন?

বলচি, চলো।

ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে।

হিন্দি নিজের দুই ব্রণ-ক্ষত গালে হাত বুলিয়ে বললো: ঠিক করেচি হসপিটালে অ্যাডমিশন নিয়ে আমার এই দুই গাল স্ক্র্যাপ করবো।

সে কি? কেন?

হিন্দি গম্ভীর হ'য়ে বললো: আমার গার্লফ্রেণ্ড সেদিন কি বলেচে জানো?

কি?

কিস্ দিয়ে বললো, ইয়োর চীকস আর ভেরি রাফ।

হেসে বললাম: আর সে জন্যে গাল আঁচড়ে সমান করতে হবে?

হ্যাঁ। হিন্দি বললো: আমি সেদিন থেকে আর কিস করতে দিই নি। মিডিলসেক্স হসপিটালে খবর নিয়েচি, চীকস স্ক্র্যাপিং করার ব্যবস্থা আছে সেখানে?

বললাম: কী, ঝামা দিয়ে ঘসবে? না, স্যাণ্ড পেপার দিয়ে রগড়াবে?

হিন্দি বললো: ঐ ধরণেরই কিছু একটা হবে।

বললাম: আশ্চর্য, একটা মেয়ে কী বললো, আর তুমি নিজের গাল ঘ'সে ছিঁড়বে? ও নো, হিন্দি, ডোন বি সিল্লি। বরং বদলে ফেলো গার্ল ফ্রেণ্ড। তোমার এই বয়-ফ্রেণ্ড-এর কথা শোন।

বললো: তুমি হয় তো জানো না ঘোষ। যাকে ভালোবাসা যায়, তার মুখ থেকে অমন কথা শুনলে মনে কত আঘাত লাগে। কেন এই দেশেরই রাজার ছেলে প্রেমের জন্যে রাজ্য ত্যাগ করতে পারলো, আর আমি পারবো না প্রেমের জন্যে গালের চামড়া ঘ'সে ফেলতে? ঘোষ, তুমি আমাকে

সাহস দাও। আজ হাসপাতালে ভর্তি হবার দিন। যদি কিছু দরকার লাগে, তাই তোমাকে কষ্ট দিলাম।

হতাশ হয়ে বললাম: যখন সবই ঠিক ক'রে ফেলেচো, তখন আর বাধা দেবো না। কিন্তু গালে যদি আরো বেশি দাগ হ'য়ে যায়?

হিন্দি বললো: ডক্টর বলেচে, তা হবে না। কিছুদিন বাদেই দাগ মিলিয়ে যাবে। দেখা দেবে নতুন চামড়া।

বললাম: হ'লেই ভালো। তোমার প্রেমের জয় হোক। ভালো কথা, তোমার সেই প্রেম-ভাগ্যবতী মেয়েটি এসব খবর রাখে?

না।

তা হ'লে তো খবর দেওয়া দরকার।

না, এখন নয়। হিন্দি বললো: অন্তত অপরেশনের আগে নয়।

বললাম: বেশ তাই হবে। ঠিকানা দাও তার।

হিন্দি নাম-ঠিকানা লিখে দিল।

বললাম: তার একবার দেখা উচিত।

হিন্দি চুপ ক'রে রইলো।

আমরা সাবওয়ে ধ'রে মিডলসেক্স হসপিটালে এসে ঢুকলাম।

সন্ধ্যায় ডিনার টেবিলে ব'সে মিষ্টার এবং মিসেস ল্যাফরকেডকে হিন্দির ব্যাপারটা বলতেই মিসেস চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে বললেন: বলো কি মি: গস! ছেলেটি পাগল নাকি?

মিষ্টার ল্যাফরকেড বললেন: তোমরা পুরুষদের এমনি ক'রেই পাগল করো ডার্লিং!

আই এগ্রী উইথ ইউ!—হেসে বললাম আমি।

অপরেশন হবে কবে?

কাল দশটায়। সে সময়ে যাবো আমি।

মিসেস বললেন: আমিও তোমার সঙ্গে যেতে চাই।

বললাম: বেশ তো!

পরদিন মিসেস ল্যাফরকেড আর আমি মিডলসেক্স হসপিটালে গেলাম।

তার একটু আগেই হিন্দিকে অপারেশন রুমে নিয়ে গেচে। আমরা অস্থির অন্তঃকরণে লাউঞ্জে ব'সে রইলাম। অনেকেই আসচে, বসচে, আবার উঠে যাচ্ছে। সেদিকেও যেন লক্ষ্য নেই আমাদের। সামনের টেবিলে রাখা পত্রিকা দু'খানি তুলে নিয়ে বেশ অমনোযোগী হ'য়েই পাতা ওল্টাচ্চি। কথা বলতেও ইচ্ছে করচে না।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ হিন্দির অপারেশন শেষ হ'লো।

নার্সের মুখে শুনলাম, অপারেশন সাকসেসফুল। পাঁচ মিনিটের জন্যে অনুমতি পেলাম, হিন্দিকে দেখবার। নার্সের সঙ্গে দু'জনে সন্তর্পণে ওয়ার্ডে ঢুকে দেখলাম, একটি কট-এ হিন্দি অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে। চেনবার উপায় নেই। চোখ আর নাকটুকু বাদে সারা মুখখানা সাদা ব্যাণ্ডেজে বাঁধা।

মিসেস ল্যাফরকেড আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস-ফিস ক'রে বললেন: আঃ পুয়োর লাভার।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে পোষ্ট অফিস থেকে একখানা পোষ্টকার্ড কিনে হিন্দির গার্লফ্রেণ্ডকে লিখে দিলাম: মিঃ হিন্দি ইজ ইন মিডিলসেক্স হসপিটাল; প্লীজ সী হিম দেয়ার।—এ ফ্রেণ্ড অফ মিঃ হিন্দি।

মিসেস ল্যাফরকেডকে কার্ডটা দেখাতে বললেন: হ্যাঁ, মেয়েটা দেখে যাক একবার কাণ্ডটা। দেখো মিঃ গগ, আমার মনে হয়, তলোয়ারের ধারের চাইতে কথার ধারই বেশি।

কাজ বাড়লো। বিকেলে আবার গেলাম হিন্দিকে দেখতে। সবে জ্ঞান হ'য়েচে। তবে দুর্বল। কথা বলা নিষেধ। আমার দিকে চেয়ে দেখলো শুধু। কৃতজ্ঞতার চাহনী।

পরদিন বিকেলে গিয়ে দেখি হিন্দির কট-এর পাশে ব'সে একটি তরুণী তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্চে। বুঝলাম: উনিই তিনি। কাছে গিয়ে দেখি মেয়েটির গোলাপী গাল ভেজা। বুঝলাম, একটু আগেই একপশলা বর্ষণ হ'য়ে গেচে। যাক, হৃদযাকাশের মেঘ তাহ'লে হাল্কা এখন। হিন্দি চোখ বুজে আছে।

আমার পায়ের শব্দেই বোধহয়, হিন্দি চোখ মেলে চাইলো। তার বাঁ হাত দিয়ে আমার ডান হাতখানা একবার চেপে ধরলো শুধু। ভাবটা: ঘোষ তুমিই আমার বন্ধু।

মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। হয়তো চিনলো আমাকে।

তাকে ডেকে নিয়ে গেলাম বাইরে, করিডরে।

বললাম : চিনে আসতে অসুবিধে হয়নি তো ?

বললো : নো।

বললাম : কি হ'য়েচে জানো ?

নার্সের কাছে শুনলাম।

কেন এই অপারেশন, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেচো।

মেয়েটি লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে রইলো।

এবার মিসেস ল্যাফরকেডের মন্তব্যটা চালিয়ে দিলাম : জানো, তলোয়ারের ধারের চাইতে কথার ধারই বেশি। তাই আমার বাধাও মানলো না সে।

মেয়েটি চোখ নীচু ক'রে বললো : আই ডিড্‌ন্ট এক্সপেক্ট সো মাচ ফ্রম হিম। আই 'ম সো সরি—সো—

থামিয়ে দিয়ে বললাম : যাও ব'সোগে কাছে। আমি চলি, কাল আসবো'খন।

পথে বেরিয়ে ভাবছিলাম, মেয়েটি সুন্দরী, লাবণ্যময়ী বটে, কিন্তু তা ব'লে একটা মন্তব্যের জন্যে নিজের গাল আঁচড়ানো ? প্রেমের দেবতা নিজেও অন্ধ, প্রেমিকের মনকেও বুঝি অন্ধ ক'রে দেন।

তিনদিন পরে হিন্দিকে ব্যাণ্ডেজ খোলা অবস্থায় দেখলাম। দু' গাল যেন আঁচড়ে দিয়েচে কেউ। আঁচড়ানোর কালচে দাগ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বীভৎস।

হিন্দি কিন্তু হাসলো। বললো : ঘোষ, আই শ্যাল রিমেন এভার গ্রেটফুল টু ইউ।

আমি বললাম : তোমার গাল থেকে ঐ কালো দাগ উঠবে তো ?

বললো হেসে : উঠবে, ডক্টর বলেচে উঠবে। আর কি বলেচে জানো ?

কি ?

বলেচে অনেক স্মুথ হ'য়ে গেচে। তবে থ্রি উইক্‌স বাদে আর একবার স্ক্র্যাপিং হবে।

শুনে আঁতকে উঠলাম প্রায় : আর একবার ?

হ্যাঁ।

হিন্দিকে শুনিয়ে নিজে নিজেই বললাম হেসে : হে প্রেমের দেবতা। তোমার খপ্পরে যেন কোনোদিন না পড়ি। তুমি কাউকে কিস্ দাও কাউকে বিষ। কারোর গলায় মালা পরাও, কারোর গলায় দড়ি; কাউকে ভাসাও প্রেম সাগরে, কাউকে ডোবাও জলে। আবার কারোর গালে গাল ঘসাও, কারোর গালে ঝামা। হে দেবতা, তোমার মতিগতি বোঝা ভার।

আমার কথা শুনে হিন্দি হাসতে গিয়ে থেমে গেল। আঁচড়ানো গালে চাড় লেগে চড় চড় ক'রে উঠেচে হয়তো।

বললাম : তোমার প্রেমিকা আসেননি আজ?

বললো : না, গ্যাল্পি এখনো আসেনি। আসবে হয়তো এখুনি।

প্রায় বলতে বলতেই ওয়ার্ডে ঢুকলো গ্যাল্পি। একটা প্যাকেটে কি যেন এনেচে। আমাকে দেখে হাসলো। আমি হেসে বললাম : গ্যাও মাই টার্ণ ইজ ওভার। গু'বাই।

ক্রীসমাস এসে গেল। যেন বিলিতী দুর্গাপুজো। এই দিনটির জন্যে ছেলে-বুড়ো সবাই দিন গোনে। এই ক্রীসমাস-পর্বটির প্রথম চাঞ্চল্যের ঝাপটা এসে লাগে বোধকরি পোষ্ট-অফিসে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা শুরু করেন প্রেজেন্ট পাঠানো, গ্রিটিংস পাঠানো, ক্রীসমাস-কার্ড পাঠানো। পোষ্টম্যানদের ঘাড়ের বোঝা বাড়ে; সবকারকে লোক বাড়াতে হয় সেজন্যে। এই হিড়িকে বহু বিদেশী ছেলেরাও পোষ্ট অফিসে মাস দেড়েক কাজ ক'রে বেশ কয়েক পাউণ্ড উপায় ক'রে নেয়

লণ্ডন সাজতে শুরু করলো। পথে, পার্কে, দোকানে, লোকের বাড়ির জানলায় রং-বেরংয়ের আলো, নানারকমের ফ্ল্যাগ, কাগজের ফুল আর ক্রীসমাস-গাছের বাহার। ট্রাফালগার স্কোয়ারে পোতা হ'য়েচে বিরাট একটা ক্রীসমাস-গাছ—সুইডেনের উপহার। কাগজে-কাগজে বেরিয়েচে তার সচিত্র বিবরণ আর বিস্তৃত আগমনী বৃত্তান্ত।

তাছাড়া এবার অক্সফোর্ড সার্কাস থেকে পিকাডিলি পর্যন্ত রিজেন্ট ষ্ট্রীটকে সাজানো হ'য়েচে আলোর মালা দিয়ে। রাস্তার দু' ধারে সারি-সারি রঙীন আলো—কিন্তু একটা জায়গায় বেশ খানিকটা ফাঁকা। কেন? কারণ জানা

গেল পরদিন কাগজে। রিজেন্ট ষ্ট্রীট এসোসিয়েসনের সেক্রেটারি জানাচ্ছেন :

সবাই বলে আমাদের ক্রীসমাস উৎসব কন্টিনেন্টের তুলনায় ম্লান, নিষ্প্রভ। তাই এ বছর অক্সফোর্ড সার্কাস থেকে পিকাডিলির মোড় পর্যন্ত পথের দু'ধারে ১৮ ফুট অন্তর লাল-নীল-সবুজ রংয়ের ৫ ফুট মাপের ল্যাণ্টার্ণ সাজানো হয়েছে, প্রত্যেকটায় ৫০০ পাওয়ারের বাল্ব। এজন্যে খরচ পড়বে প্রতি ফুট ফ্রণ্টেজের জন্যে ২৫ শিলিং, অবশ্য একমাসের জন্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাঝে খানিকটা জায়গায় ফাঁক বা গ্যাপ থেকে গেছে। কারণ, তিনটি দোকান আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন নি। এই প্রতিবেশীসুলভ মনোবৃত্তির অভাব সত্যিই দুঃখের।

ক্রীসমাস উপলক্ষে ল্যাফরকেড-ভবনেও জোর খানা-পিনা। ঘরে ক্রীসমাস-গাছ সাজানো। টেবিলে ক্রীসমাস কেক ও আরো বহুৎ খাদ্য-পানীয়; আর সেই সঙ্গে ক্রীসমাস টেবিলের শোভা এবং রীতি : একটি ভাজা পুরো টার্কিশ ফাউল।

ব্যবসার দিক দিয়ে ইংরেজের সুনাম সুদূর প্রচারিত। কিন্তু 'ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিতে' ইংরেজের মতো দু'টি নেই। ক্রীসমাসের বাজার গরম দেখে ইংরেজ-কসাইরা টার্কিস ফাউলের দাম হেঁকে বসলো দ্বিগুণ। কিন্তু ইংরেজ গিন্নীরাও সহজে নুইবার পাত্রী নন, বেঁকে বসলেন তাঁরাও : বেশ, কিনবো না টার্কি। প্রতি বছরে টার্কিই যে ক্রীসমাস টেবিলে মৌরসী-পাট্টা নেবে তার কি মানে আছে? কসাইরা দেখলো, দর কসতে গিয়ে হিতে-বিপরীত হ'লো; তাই তাড়াতাড়ি নিজেদের সুর নামালো, টার্কি ফাউলের দরও নামালো। অতএব, প্রতি বছরের মতই ভাজা টার্কি ক্রীসমাস টেবিলে দিলো দেখা।

বিকেলে টেবিলে ব'সে উঠলাম যখন, রাত এগারোটা। এদিন তো শুধু খাওয়া নয় : খাওয়া পাওয়া গাওয়া। অর্থাৎ খানা-পিনা ছাড়াও, নানা প্রেজেণ্টের লেন-দেন এবং গল্প গুজব, হৈ-হল্লা, গান-বাজনা। আমাদের মাথায় কাগজের টুপি, হাতে ভেঁপু, মুখে চামচ কিংবা ডিকেণ্টার।

মিঃ এবং মিসেস ল্যাফরকেডের দু'জন বন্ধু এবং বান্ধবীও যোগ

দিয়েছিলেন এই পার্টিতে। তাঁদের নাম মনে নেই, তবে চেহারা ভোলবার নয়। ভদ্রলোকটি বেঁটে-মোটা, ভদ্রমহিলাটি লম্বা-চওড়া। আচার-ব্যবহারে ভদ্রলোকটি কচি খোকা, মহিলাটি হেডমিস্ট্রেস।

পার্টিতে মিঃ ল্যাফ্‌রকেড ম্যাজিক দেখালেন। ভদ্রলোক কমিক করলেন নেচে কুঁদে। মহিলাটি চিল-চেল্লানো সুরে গান গাইলেন (আমি না বুঝলেও খুব জোরে-জোরে হাততালি দিলাম), মিসেস ল্যাফরকেড পিয়ানো বাজালেন এবং আমি পড়লাম আমার কবিতা। কিন্তু হঠাৎ দেখি অনুরোধ এলো, একটা গান গাও—ইণ্ডিয়ান সং। গান? আমি? প্রথমে ঘাবড়ে গেছলাম, পরে রীতিমত পুলকিত হ'য়ে উঠলাম। এই তো সুযোগ। শুনেচি মানুষের জীবনে সুযোগ বার বার আসে না। আর বেশ জানি, আমার গানের সুর-বেসুর বোঝবার ক্ষমতা এঁদের নেই। অতএব, ভয় কি? ঝুলে পড়ো মন। গান গাওয়া আর হাততালি পাওয়ার এমন চান্স আর পাবে না তুমি।

শুরু করলাম রামপ্রসাদী: মাগো, আমার এই ভাবনা। অবশ্য তার আগে ইংরেজিতে মানেটা বুঝিয়ে দিলাম। গান গাইবার সময় আড় চোখে দেখতে লাগলাম, আমার শ্রোতাদের চোখ-মুখের ভাব। না, খুব মনোযোগী। ...গান শেষ হ'লো, মৃদু হাসলাম। ভাবটা: কী কেমন হ'লো?...চার জোড়া হাত-তালি বেজে উঠলো। কানে যেন মধু-বর্ষণ হ'লো।

আর একটা হোক।

এঁ্যা, আর একটা?

ভারি চমৎকার তোমার গান।

বটে। বটে। আচ্ছা, এভাবে গ্যাস দিলে কোন্ না ফানুষ ফোলে। আমি তো মানুষ মাত্র।

বললাম: বেশ তাই হোক। আমাদের টেগোরের একখানা গান গাই।

টেগর'স সং। গুড ভেরি গুড।

আগে ইংরেজিতে মানে বুঝিয়ে দিলাম; পরে গলা কেশে পরিষ্কার ক'রে শুরু করলাম: এসো, নীপবনে ছায়া বীথি তলে—

গানের শেষে আবার হাততালি। আ-আ-আঃ

হে রবিঠাকুর, আমাকে ক্ষমা করো। অনেকেই তোমার বহু গানের উপর আজো নিয়মিত ষ্টীম রোলার চালিয়ে যাচ্ছে, আমি একবারই তোমার

একটি গানের উপরে ট্যাংক চালিয়েছিলাম মাত্র। সে শুধু গাইয়ে সাজবার বাহাদুরীর লোভে, একদিনের বাদশা হবার বাসনায়। তোমাকে ভাঙিয়ে কতজন তো কত কী হ'চ্ছে, আর আমি না হয় একদিন মাত্র তোমার একটি গানকে অজ্ঞানের মতই নিজের গলায় ভ'রে বেসুরো ক'রে ছড়িয়েছিলাম বিদেশের এক বদ্ধ ঘরে অল্প চারটি শ্রোতার কাছে। শুধু যশের বশবর্তী হ'য়েই এই অপকর্ম।

ক্রীসমাসের জের চলে নিউ ইয়ার্স ডে পর্যন্ত।

তা ব'লে অফিস-কারখানায় তালা ঝোলে না! ইংরেজের আগে কাজ, পরে সাজ। কাজের শেষে আনন্দ। দোকান-পাট হাট-খোলা। শো উইণ্ডোগুলো ফাদার ক্রীসমাস আর তুলোর বরফে সাজানো। কেনা-বেচার শেষ নেই। খদ্দেরের ঠেলাঠেলি।

সেলফ্রীজের ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর্স যেন প্রধান দ্রষ্টব্য। সাত-আট তলার অট্টালিকায় শুধু জিনিষ, জিনিষ আর জিনিষ। চমৎকার ক'রে সাজানো। নেড়ে চেড়ে দেখতে ইচ্ছে করে। তাই দোকানী-মেয়েরা চোখের সামনে তুলে ধরচে এজিনিষ-সেজিনিষ। না কেনো ক্ষতি নেই, দেখে যাও। কিন্তু শুধু দেখে যাওয়া যায় না, লোভে পড়তেই হয়, পকেটে হাত যায় আপনা থেকেই।

ষ্টোর্সে পুরো একটা টয় টাউনের সৃষ্টি হয়েচে। শিশু জগৎ। এক ভদ্রলোক তো বুড়ো ফাদার ক্রীসমাস সেজে দাড়ি নেড়ে ছোটদের সঙ্গে শুরু করেচেন নাচ। নীচের শো-উইণ্ডোতে চলন্ত পুতুলের মেলা। ফুটপাথে তাই ভিড়। উইণ্ডো-গ্লাসে প্রায় নাক ঠেকিয়ে ছেলে-বুড়োরা দেখচে মজা।

ভিড় জমতে থাকে বছরের শেষ দিনটায় পিকাডিলি সার্কাসে আর ট্রাফালগার স্কোয়ারে। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় ভিড়। বাসে, সাবওয়েতে লোক আসচে তো আসচেই। পিকাডিলির এরস মূর্তিকে ঘিরে আর ট্রাফালগার স্কোয়ারের নেলসন কলমের চারধারে মেয়ে-পুরুষে ঘুরচে আর ঘুরচে। শুরু হয়েচে কেবল গান। ছেলের দল, মেয়ের দল, ছেলে-মেয়ের দল, বুড়ো-বুড়ির দল—সবাই জড়ো। বাড়িতে বুঝি তালা-চাবি মারা!

চারিদিকে হৈ-হল্লা, গান-গল্প। লোকে লোকারণ্য। হাতে হাত ধরে চলচে অনেকেই। একবার হাত ফস্কালে আর তাকে খুঁজে পাওয়া দুস্কর। ইংরেজের সারা বছরের সংযম বুঝি ভেঙে পড়বে এই রাত্রে। পায়ে ঠেকচে পা, চলা দায়। গায়ে ঠেকচে গা, বলা দায়। ইংরেজের আচার-ব্যবহার বুঝি গোল্লায় গেলো এই গণ্ডগোলে।

মেয়েগুলিও কম নয়। মাথায় কাগজের টুপি পরেচে। তাতে লেখা: সুইট সিক্সটিন, নট ইয়েট কিস্‌ড। কারোর টুপিতে লেখা: কিস্ মি কুইক। তরুণরা সব ঠোঁট চাটচে নিজের আর ঘড়ির দিকে দেখচে: দাঁড়াও না, বারোটা বাজুক একবার। লোভী ছেলের সামনে যেন কেক।

ঢং ঢং ঢং ঢং—

বারোটা বাজলো। চার্চে বেজে উঠলো ঘণ্টা। আকাশে ফুটে উঠলো বাজি, পথে-পথে নেচে উঠলো মেয়ে-পুরুষের দল। শুরু হ'লো গান আর অর্গান বাজানো। আর লোভী ছেলেরা সুযোগ পেলেই কেক-এ দিচ্চে কামড়। এতে আপত্তি করবার নিয়ম নয়: সংস্কার। শাসন করবার কারণ নেই: সম্ভাষণ। ছ' ফুটিরা রুল হাতে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে আর কাণ্ড দেখে মুচকে মুচকে হাসে।

রাত্রি একটা-দুটো-তিনটে পর্যন্ত চলতে থাকে নববর্ষের উৎসব। ক্রমে ফাঁকা হ'য়ে আসে পথ-ঘাট। মনে সুর, পেটে সুরা। ক্লান্ত পায়ে, ঢিলে পায়ে বাড়ি গিয়ে ঢলে পড়ে বিছানায়।

আর, তারপর দিন?

তারপর দিন ইংরেজ ওঠে, রোজকার মত ব্রেকফাষ্ট খেয়েই ছোটে অফিসের দিকে। পয়লা জানুয়ারীতেও অফিস খোলা যে।

আশ্চর্য, ইংরেজের ক্যালেণ্ডারে 'পয়লা জানুয়ারী' লাল রং-এ ছাপা নয়।

নিউ ইয়ার্স ডে।

একগোছা ফুল নিয়ে গেলাম বিকেলে মিডলসেক্স হাসপাতালে হিল্দিকে দেখতে। দেখি, ন্যান্সি আগেই এসে এক তোড়া ফুল দিয়েছে দয়িতকে। দু'জনে করিডরে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, আমাকে দেখে লুফে নিলো তারা।

ফুলের গোছা হিন্দির হাতে গছিয়ে দিয়ে দু'জনের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলাম : উইশ ইয়োর হ্যাপি নিউ ইয়ার।

থ্যাংকু। হিন্দি হাসলো। হাসতে পারলো। বোধ হয় গালের আঁচড় আর চড় চড় করচে না। গালের দাগ হ'য়েচে কালচে। দাড়ি বেড়েচে প্রায় এক ইঞ্চি।

ফার্দার খবর কি বলো।

বললো, পরশু আবার স্ক্র্যাপিং হবে। ডক্টর বলেচে এবার ঠিক হ'য়ে যাবে।

ন্যান্সির দিকে একবার তাকিয়ে বললাম : যাক, এবার তোমার গাল তা'হলে স্মুথ হবে। গড্ হেল্প ইউ।

ন্যান্সি চোখ নীচু করলো। তাকে জিগ্যেস করলাম : তুমি আশাকরি রেগুলার্লি আসচো।

বললো : হ্যাঁ।

যাক, ভালোই। আমি তো আসতে পারিনে নিয়মিত। এখন তুমিই আমাদের ভরসা।

শুনে হাসলো ন্যান্সি। হিন্দিও।

হাসপাতাল থেকে বিদায় নিয়ে, সেলফ্রিজে গিয়ে একটি ভালো ক্যালেণ্ডার কিনে আর কিছু ফুল নিয়ে সোজা গেলাম মি: আর মিসেস ওটওয়ের ভবনে। নিউ ইয়ার্স ডে-তে যাবার কথা। সেখানে কবিতা পড়বার কথা। পকেটে কবিতানুবাদগুলি নিতে ভুলিনি।

গিয়ে দেখি, পাড়ার আরো পাঁচ-সাতজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত।

মিসেস ওটওয়ের হাতে আমার প্রেজেণ্টগুলি দিতেই দু'জনে যেন গলে গেলেন। আমাকেও প্রেজেণ্ট করলেন একটিন দামী সিগ্রেট, কার্ডস, সুন্দর একখানি ক্যালেণ্ডার আর একগোছা ফুল। তারপর উপস্থিত সকলের সঙ্গে করিয়ে দিলেন পরিচয়।

ডাইনিং হলে বিরাট টেবিলে সুসজ্জিত খাদ্য পানীয় সামনে নিয়ে ব'সলাম সবাই। প্রথমে খাওয়া, পরে কবিতা পাঠ শুরু করলাম। ইংরেজ,

বাস্তববাদী। জানে, খালি পেটে পৈটিক-এটমসফেয়ার আনা বড় শক্ত। তাই আগে পেট, পরে পাঠ।

সামাজিক বৈঠকে, ইংরেজ, কোন কিছু ভালো লাগলে হাততালি তো দেয়ই, না লাগলেও দেয়। ভদ্রতা। কাজেই পাঠ-সমাপন হ'লে প্রচুর হাততালি পাওয়া গেল বটে, তবে সে 'তালি' মনের না হাতের বোঝা শক্ত। তবে মুখে অনেকেই বললেন, কবিতাগুলিতে তোমার দৃষ্টিভঙ্গী সত্যিই নতুন। তোমরা ইণ্ডিয়ানরা সব জিনিষই আমাদের চাইতে অন্য আঙ্গিকে দেখ। ভাবলে অবাক হ'তে হয়।

ইণ্ডিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্বের কথাটা নিশ্চয়ই মৌখিক প্রশংসা নয়।

প্রতিবেশী আর বেশিনীরা বিদায় নিলে ওটওয়ে দম্পতি রাত এগারোটা পর্যন্ত আমাকে নিয়ে পড়লেন। ডিনার ওখানেই সারতে হ'লো। প্রতিশ্রুতি দিতে হ'লো, তাঁদের ভুলবো না। আর, যখন শুনলেন, আমার ভ্রমণ-কাহিনীতে তাঁদের কথাও থাকবে—শুনে এমন ভাব দেখালেন, যেন তাঁরা আমার কোন উপন্যাসের ভাবী নায়ক এবং নায়িকা।

আবার সেই ক্ল্যাপহ্যাম নর্থ ষ্টেশন পর্যন্ত দু'জনে আমাকে এগিয়ে দিয়ে, হ্যাণ্ডশেক ক'রে পরম আত্মীয়কে বিদায় দেবার সময় যেমন বলে, তেমনি ক'রে বললেন: দেশে গিয়ে চিঠি দিয়ো, পৌঁছানোর খবর দিয়ো।

মি: ওটওয়ের লাল মুখখানা বিদায়-বেদনায় থমথমে। নীল নয়নী মিসেস ওটওয়ে বললেন: তোমার যাবার দিন ষ্টেশনে দেখা করবো।

বললাম: থ্যাংকু।

ইংল্যাণ্ড ছাড়বার শেষ তারিখ আর বেশি দূরে নয়। মনটা সেজন্যে বেশ ফুরফুরে হয়েই আছে। হবে না?

সংসারের পোষমানা জীব আমি, ঝোঁকের মাথায় শেকল কেটে বেরিয়ে পড়েছিলাম প্রায় লাফ মেরেই। কিন্তু প্রায় সাত-সাতটা মাস ধ'রে সাত ঘাটের জল খেয়ে খেয়ে আর বাল-বাচ্চা ঘর-ঘরণীর বিরহের জ্বালা সয়ে সয়ে মেজাজটা যেন খিঁচড়েই গেছলো। সংসারের ভারি শেকলটা কখন

যেন সোনার সরু লকেট হ'য়ে দুলতে শুরু করেচে মনের চোখের সামনে। মনটাও 'বিবেক-বাণী'কে একটু ওলট পালোট ক'রে আওড়াতে শুরু করেচে যখন-তখন : ওরে মূর্খ ভারতবাসি, বলো ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী।

আর লণ্ডনও যেন বলচে, বৎস, আর আমার দেখাবার কিছু নেই।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ন্যাশনাল গ্যালারি, ন্যাশনাল প্রোট্রেট গ্যালারি, টেট গ্যালারি, সায়ান্স মিউজিয়াম, ন্যাচারাল হিষ্ট্রি মিউজিয়াম, ইমপিরিয়াল ওয়ার মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড এলবার্ট মিউজিয়াম, তাছাড়া গ্রীনইচের ঘড়ি-ঘর, টাউয়ার অব লণ্ডন, মাদাম তুসো-র মোমের পুতুল-প্রদর্শনী, এমন কি, কিউ-এ রয়াল বটানিক্যাল গার্ডেন—সব চ'ষে বেড়ানো হয়েচে।

তাছাড়া লণ্ডনের বস্তি-পাড়া ইষ্ট-এণ্ড-এর হালচালও দেখিয়েচে আমাকে হিন্দি। চাঁটগেয়ে মিঞার বিলিতী সংসার; আবার খাস বিলিতীর ছেঁড়া সংসার, ছেঁড়া জামায় শতেক তালি, নোংরা 'পাব'-এ হৈ হুল্লোড়, ধোঁয়া আর ধোঁয়াটে বাড়ি। তাছাড়া বাপ-মা তাড়ানো ছেলের দল, হুড়োহুড়ি আর কক্‌নি বুলি; গলির মুখে সাদা রংয়ের পচা-ঘেয়ো নারী-মাংস—এই সব মিলিয়েই ইষ্ট-এণ্ড। লণ্ডনের গোয়াবাগান বস্তি।

তবে গোয়াবাগানের বস্তিবাসীদের জীবন ধারণের দাবির সঙ্গে লণ্ডনের বস্তিবাসিন্দাদের দাবির আকাশ-পাতাল তফাৎ। লণ্ডনে ফুটপাথে খাটিয়া পেতে শুলে, হয় পুলিশে, নয় বিলিতি চিত্রগুপ্ত তার ঠাণ্ডা কনকনে হাতখানি বাড়িয়ে তাকে 'গুদাম-জাত' ক'রে দেবে। অর্থাৎ মাথার উপরে একখানি অন্তত ফাটা-ফুটো ছাদ—তার চাই-ই; আর ঘরের মধ্যে ফায়ার প্লেসে আগুন। এক কথায় চাল-চুলো না থাকলে ইংরেজের দফা গয়া। কাজেই মোটা কম্বল, ধোকড়া ওভারকোট, ভারি বুট, কালো রুটি, পোড়া মাংস আর কয়েক মগ বীয়ার না হ'লে বিলিতী শীতকে সায়েস্তা করা রীতিমত শক্ত।

ইষ্ট-এণ্ডের অভাব স্বভাব দুঃখ কষ্ট দারিদ্র সবিস্তারে বর্ণনা করা, আমাদের অন্তত শোভা পায় না। নিজের ঘা ঢেকে রেখে পরের ঘা দেখাতে যাওয়া হাস্যকর, অন্যায়, অপরাধ।

তবে ইংরেজের হাট—পেটিকোট লেন-এর বিবরণ না দিলে ইষ্ট-এণ্ড

অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকবে। হাট মানে হাট-ই। রবিবারের হাট। নানা জাতের হাট, নানা জিনিষের কেনা বেচা। না, না, পেটিকোট লেনের হাট মানে মেয়েমানুষের হাট নয়। গলিটার নাম পেটিকোট লেন। ভারি মিষ্টি নাম, অথচ লণ্ডনের সৃষ্টিছাড়া বাজার।

বিশুদ্ধ পুবদেশীয় বাজার। পথের দু' ধারে মেয়ে-পুরুষের দোকান। হরেক রকম মাল-পত্র সাজানো। উইক-এণ্ডে 'পেই-ডেই' অর্থাৎ পে-ডেতে অনেকেরই পকেট থাকে ভারি—কাজেই রবিবারে এই হাটের ব্যবস্থা। খ্রীষ্টানরা নাকি রবিবারে কিছু করে না, ছুটির দিন—স্যাবাথ ডে। পেটিকোট লেন হো-হো ক'রে হেসে বলে, বাজে কথা।

সত্যিই। রবিবারের লণ্ডনের প্রায় ফাঁকা পথ ঘাট পেরিয়ে পেটিকোট লেনের হাটে গিয়ে দেখি হৈ-হৈ ব্যাপার। লে লে বাবু ছে ছে আনার বিলিতী হাঁক আর হৈ-চৈ লম্বা বাঁকানো গলিটার এ-মোড় থেকে সে-মোড় পর্যন্ত।

পুরোন কোট প্যাণ্ট জুতো টুপি চিনেমাটির বাসন খেলনা ধুপ সাবান সেণ্ট কেক-বিস্কুট মায় কুকুর ছানা পর্যন্ত এই পেটিকোট লেনের বেচা-কেনার হাটে আসে এ হাত থেকে ও হাতে হস্তান্তরিত হ'তে। দরদস্তুর চলে পুরোদমে। যে সব গিন্নিরা লণ্ডনের বড় বড় দোকানের শো-কেসের জিনিষে লেবেল-আঁটা দামটা ফেলে সেটা কেনেন চোখ বুজে আর মুখ বুজে —তাঁরাই এই পেটিকোট লেনের হাটে দর করেন নির্লজ্জের মত। দশ শিলিং জিনিষের দর দিতে চান পাঁচ শিলিং। আর, পেলেও ভাল ক'রে নেড়ে চেড়ে দেখতে ভোলেন না : জিনিষটা ঠিক আছে তো।

ভিড় ঠেলে ঠেলে এগোচ্চি। এ দোকানে ও দোকানে উঁকি মারচি, এমন সময় আমার কানে এলো বেশ গরম-গরম কথা। ফিরে দেখি, ইয়া লম্বা আর মোটা এক নিগ্রো—আমাদের 'মামা' চটে গিয়ে দু'টি ইংরেজ পুঙ্গবকে শাসাচ্চে। ইংরেজ দু'জন নাকি ভিড়ে তাকে ধাক্কা দিয়েচে। আর যাবে কোথায়? নিগ্রো-মামা তাদের দু'জকে কনুই দিয়ে ধাকাচ্চে আর তাদের একজনের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলচে : ডু ইউ লাইক টু ফাইট উইথ মি? ডু ইউ?

কী কাণ্ড। এই এক হাট ইংরেজের মাঝখানে এক কালা আদমি এইভাবে 'যুদ্ধং দেহি-যুদ্ধং দেহি' করচে। ইংরেজ দু'জন যেন কথাটা

কানেই করচে না, এগিয়ে যাচ্চে, নিগ্রোকে এড়িয়ে যাবার আশায়। আশে-পাশের লোকগুলোও নিগ্রোর কাণ্ড দেখচে শুধু, কিন্তু কিছুই বলচে না।

নিগ্রো-মামার ঐ রণ-লিপ্সা দেখে, সত্যি বলতে কি, একটু ঘাবড়েই গেছলাম। মামার রঙের সঙ্গে আমার, মানে এই দুর্বল অতি ভদ্র ভাগ্নের রংয়ের শেড মাত্র দু' চার পোঁচ কম আর বেশি; কাজেই হাটের ঐ অতগুলো লাল ঘুসি যদি মামার নাকে-মুখে পড়ে, তবে তার দু' চারটে নেহাৎই রঙের মিল থাকার দরুণ ফাউ হিসেবে যে মামার ভাগ্নের প্রাপ্য হবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি? তাই, প্রথমটা প্রায় গা-ঢাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু যখন লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, মামার বীর দর্প চূর্ণ হবার কোন চিহ্নই দেখা যাচ্চে না, তখন একটু দূরে থেকে-থেকে মামা ও মামার দুই ভিকটিমের পিছু নিলাম। ভয়ে গুরু-গুরু বুকখানাও তাল বুঝে গর্বে গর-গর করতে লাগলো। যেন বলচে, ব্রাভো মামা, ব্রাভো!

নিগ্রো-মামাটি যখন দেখলো, তার কাঁধ-সমান-উঁচু সাদাটে প্রতিপক্ষ দু'জন কোন রকম উচ্চ বাচ্য করলে না, তখন তাকে বাধ্য হ'য়েই বলতে হ'লো: অ' রাইট, বি কেয়ারফুল ইন ফিউচার। ইংরেজ দু'জন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন।

শুনেছিলাম, রাজনীতির ক্ষেত্রে ইংরেজ অন্য দেশের ব্যাপারে নাক গলায় বটে সুবিধে পেলেই, কিন্তু নিজের দেশে কারোর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে মোটেই রাজী নয়। সে কথার চাক্ষুষ প্রমাণ পেলাম সেদিন পেটিকোট লেনে।

আর পেয়েছিলাম একদিন লণ্ডনের সদর রাস্তা ফ্লীট ষ্ট্রীটের উপর। ফ্লীট ষ্ট্রীট আর ষ্ট্র্যাণ্ড যেখানে মিশেচে—প্রায় সেখানে, দুপুর বেলা দু'টি ইংরেজ ছোকরা রাস্তার উপরেই কেন যেন ঘুসো-ঘুসি শুরু করলো। দৃশ্যটি দেখবার মত। কাজেই ফুটপাথের দু'ধারে বহু মেয়ে-পুরুষ জড়ো হ'য়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ এগিয়ে গিয়ে তাদের বাধা দিলো না। পার্সোনাল ব্যাপার যে? কে নাক গলাতে যাবে। ছেলে দু'টো প্রেমসে রাস্তায় উপর খণ্ডযুদ্ধ চালিয়ে গেল, যে পর্যন্ত না একটি ছ'ফুটি ববি তাদের মাঝখানে পড়ে রাস্তায় গড়াগড়ি ও মারামারি দিল থামিয়ে।

হ্যালো ফাইটার্স, কী হয়েচে তোমাদের? পুলিশ জিগ্যেস করলো।

কিছু না। দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে ব'লে উঠলো।

কেস লেখাবে ?

না।

দু'জনেই গায়ে-মাখা রাস্তার ধুলো ঝেড়ে দু'দিকে চলে গেল। ধুলোর সঙ্গে গায়ের ঝালটাও ঝেড়ে ফেললো বোধহয়। অন্তত, তাদের হাবভাব দেখে সে রকমই কিছু মালুম হ'লো।

পুলিশটা হাসলো শুধু।

আশ্চর্য, চাঁদা ক'রে চাঁটাবার এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ ভিড়ের লোকগুলো মূর্খের মত হারালো। অন্তত দর্শকদের মধ্যে কয়েকজন ছেলে দু'টিকে ধরলে তারাও তো একটু হুংকার ছাড়বার সুযোগ পেতো—তাও জুটলো না তাদের ভাগ্যে। ছেলে দুটো ছাড়াছাড়ি হ'তেই ভিড়ও ছড়িয়ে গেল। সকলেই যে যার কাজে পা বাড়ালো।

অগত্যা আমাকেও বিষণ্ণমনে নিজের কাজেই যেতে হ'লো। দুর, দুর।

ইংল্যাণ্ডের বিষয়ে এত কিছু বলা সত্ত্বেও ইংরেজের ল্যাভেটরির বিষয়ে না বললে, ইংল্যাণ্ডের প্রতি অন্যায় করা হবে। আমরা তো দেখি, মানুষের অতি প্রয়োজনীয় এই বিষয়টা ভ্রমণ-সাহিত্যে রীতিমত উপেক্ষিত। অন্যান্য দেশের নোংরা ল্যাভেটরির গল্প করা মানে হয়তো নোংরামি, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ঝকঝকে, তকতকে বিশেষ জায়গাগুলির বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

প্রায় প্রত্যেক রাস্তার মোড়েই পুরুষ আর মহিলাদের জন্যে দু'টি ক'রে 'টয়লেট'-এর ব্যবস্থা, মাটির তলায়। বাইরে বড় বড় বোর্ডে লেখা : লেডিজ এবং জেণ্টলমেন। 'জেণ্টলমেন' টয়লেটরই বর্ণনা দিই :

সিঁড়ি দিয়ে নীচেয় নেমে গেলেই মেঝে-দেওয়ালে সাদা টালি ফিট করা দু' তিনখানা ঘর। মাথার উপরে ছাদে মোটা কাঁচের টালি, উপর থেকে আলো আসার ব্যবস্থা। রাত্রে বা দিনে অন্ধকার জায়গাগুলোয় ফ্লোরেসেণ্ট আলোর ব্যবস্থা। একটি ঘর 'ব্রাশ-আপ'-এর জন্যে। সে ঘরে বেসিন আয়না, চিরুণী, ব্রাশ সাবান, তোয়ালে সাজানো। সারাদিন ঘুরে-ঘুরে মুখ

তোমার মলিন হ'য়েচে, চুল হ'য়েচে এলোমেলো ; কাজেই মুখ হাত ধুয়ে মুছে, তেড়ি বাগিয়ে ঝকঝকে হ'য়ে তোমার এপয়েণ্টমেণ্ট রাখতে যাও। ফুটফুটে চেহারা না হোক, ফিটফাট থাকা ইংল্যাণ্ডের একটি বড় কোয়ালিফিকেশন।

ঘরের আর একদিকটায় অটোমেটিক ফ্লাশিং ফিট করা ইউরিন্যালস—পরসেলিনের, সাদা ধবধবে ; ন্যাপথলিন ছড়ানো। দুর্গন্ধের পথ বন্ধ। পাশেই ল্যাট্রিন। দরজা বন্ধ করা। 'লক'-এর ছেঁদায় পেনি ঢুকিয়ে হাতল ঘোরালে তবেই খুলবে দরজা ; কোন রকম বেগ পেতে হবে না।

ঘরের আর এক কোণে মিঃ মেথরের দপ্তর। চেয়ার, টেবিল, বাড়তি টয়লেট-পেপার-রোলস, ন্যাফথলিন প্যাকেটস, 'ভিম' জাতীয় পরিষ্কার করবার লোশন, ঝাড়ন ; তাছাড়া, বাড়তি কাচানো তোয়ালে, লিকুইড সোপ, চিরুণী, ব্রাশ ইত্যাদি। একটি ছোট-খাটো অফিস। মেথর সাহেবটিও সেইভাবের ডাঁট দেখিয়ে চেয়ারে সমাসীন।

ফরাসীরা মিথ্যে বলে না, ইংরেজদের ল্যাভেটরি দেখবার মত, আর ফরাসীদের খাবার চাখবার মত। সত্যিই।

যাক, অনেক দিনের আশা শেষপর্যন্ত পূর্ণ হ'লো।

ইংরেজের দেশ ছাড়বার দিন এগিয়ে এলো, কিন্তু তাদের দেশের তুষারপাত আর দেখা হ'লো না বুঝি। কথায়-কথায় একদিন দুঃখ ক'রে বলেছিলাম মিঃ এবং মিসেস ওটওয়ের কাছে আর আমার ল্যাণ্ডলেডি মিসেস ল্যাফরকেডের কাছে।

জানুয়ারীর শীত। বেলা আটটা বেজে গেচে, তবু লেপ ছেড়ে ওঠবার নাম নেই। দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছি। এমন সময় মনে হ'লো, কে যেন দরজায় ধাক্কা দিচ্চে : ঠক, ঠক, ঠক, ঠক।

হু ইজ দ্যাট প্লীজ ?

বাইরের থেকে মিহি গলা পেলাম : মিসেস ল্যাফরকেড।

তাড়াতাড়ি উঠে স্লিপিং স্যুটের ওপর ড্রেসিং গাউনটা চাপিয়ে কোমরের ফিতে বাঁধতে বাঁধতে দরজা খুললাম : কী ব্যাপার।

মিসেস ল্যাফরকেডের মুখে হাসি, চোখেও : মিঃ গস, একবার জানলার

পর্দাটা তুলে দেখো—

তাড়াতাড়ি বাইরের জানলার পর্দা তুলে দেখি ইংল্যাণ্ডের আকাশ থেকে ঝরে পড়চে পেঁজা তুলো রাশি রাশি : স্নো। বাগানের গাছগুলোর মাথায় সাদা বরফ, পাতা ঝরা ডালগুলো যেন সাদা ময়দা মেখে হাত পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মিসেস ল্যাফরকেড বললেন এক গাল হেসে : তুমি বলেছিলে, ইংল্যাণ্ডের স্নো দেখা হ'লো না। তোমার কথা 'তিনি' শুনতে পেয়েচেন হয়তো, তাই এই তুষারপাত। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম তাই তো তোমাকে ডাকতে।

বললাম : সো গুড অব ইউ। থ্যাংকু ভেরি মাচ মিসেস ল্যাফরকেড।

ও, থ্যাংকু। মিসেস ল্যাফরকেড বললেন : ব্রেকফাষ্ট খেয়ে এখুনি বেরিয়ে পড়ো মিঃ গস। লণ্ডনের নতুন রূপ দেখতে পাবে।

রাইট।—মিসেস ল্যাফরকেডকে বিদায় দিয়ে, ড্রেস ক'রে ব্রেকফাষ্ট সেরে বেরুলাম পথে। কালো পীচের পথ বরফে সাদা। ফুটপাথে বরফ বিছানো। বাড়ির ঢালু ছাদগুলোর মাথায় বরফের সাদা টুপি। লোকের কাঁধে বরফ, মাথায় বরফ। ছ' ফুটি 'ববি'দের টুপিতে বরফ। বাসের ছাদে বরফ, মোটর কারের চালে বরফ। শুধু বরফ আর বরফ। পেঁজা তুলোর মত বরফ। হাল্কা হাওয়ায় ঝুর-ঝুর ক'রে পড়চে যেখানে-সেখানে— বাছ-বিচার নেই। অজস্র ঝরো-ঝরো—আকাশের আশীর্বাদ। সারা লণ্ডন যেন গায়ের ধোঁয়া আর ধোঁয়াটে রং ধুয়ে পাউডার মেখেচে প্রাণ ভরে। না কি, দুষ্টু ছেলে বস্তার ময়দা ঢেলে ফেলে গায়ে মেখেচে আচ্ছা ক'রে।

সত্যিই, লণ্ডনের রূপ গেচে বদলে। চার-পাঁচ ইঞ্চি পুরু বরফ পড়েচে রাস্তায়। পড়চেই। বাড়ির কার্নিশে, জানলার কাঁচে, আর্চে, পার্লামেণ্টের চুড়োয়, বিগবেনের মাথায়, টেমসের জলে, জাহাজের ডেক-এ, টাওয়ার ব্রীজের মাথায়, নেলসন কলমের ডগায়, পিকাডিলির 'এরস'-এর গায়ে, হাইড পার্কের গাছে-গাছে-ডালে-ডালে—সর্বত্র সাদা, সাদা আর সাদা বরফ। দূরে আর দৃষ্টি চলে না। ঝরা-তুষারের সাদা পর্দা। অস্পষ্ট। রহস্যময়। স্বপ্নময়।

তুষাররাজ্যে, রূপকথার রাজ্যে যেন বিচরণ করচি। আমার ভারি

জুতোর তলায় নরম শুভ্র তুষার বিছানো। মচ-মচ শব্দ পায়ে। সুখপ্রদ, কিন্তু শ্রুতিকটু। নিষ্ঠুর-পায়ে দলে যাওয়া। পদে-পদে বেরসিকের পদক্ষেপ।

কোন রূপ বা সৌন্দর্য কি দূর থেকে দেখাই বিধেয়, নিয়ম, রীতি? বাংলার বর্ষা ঘরে বসে দূর থেকে দেখলেই ভাল লাগে। গায়ে মাখতে গেলেই কাদা। মেয়েদের রূপ দূর থেকে দেখেই কবিতা লেখা চলে। ঘর করতে গেলেই চাল-তেল-নুন আর মুখ ঝামটা। ইংল্যাণ্ডের তুষার রূপও বুঝি ঐ রকমই।

দূর থেকে তুষারপাত না দেখে বেশি মাখামাখি করতে গিয়ে আমার নাকের ডগা আর কানের পাতা কোন সময় যেন ঠাণ্ডা হ'তে হ'তে কনকনে হ'য়ে টনটন করতে শুরু করলো। যেন হাজারটা সুঁচ বেঁধাচ্চে কেউ। কী জ্বালা! ওভারকোটের পকেট থেকে হাত বার ক'রে নাক ঘ'সে দেখি সাড় নেই, কান টেনে দেখি, কান উধাও। মহা অপরাধীর মত নিজের হাতেই বহুবার নাক-কান ম'লেও তাদের মেজাজ গরম করতে পারলাম না: আত্ম-সম্মান জ্ঞান যেন একেবারে হারিয়ে বসেচে।

অগত্যা আত্মরক্ষার আশায় কাছেই একটা রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে অর্ডার করলাম: এক কাপ গরম কফি।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ভাবছিলাম, এ সংসারের রূপ-রস-আনন্দ সবই যেন সুগারকোটেড-কুইনাইন। সৃষ্টির অন্তরালে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড। তাই কি গোলাপের ডালে কাঁটা, পদ্মের তলে পাঁক?

এবার গোটাবার পালা! মনটারও যেন পালাই-পালাই ভাব।

শুরু হ'লো বাক্স-ভরা, প্যাকিং করা আর জাহাজ কোম্পানীর লেবেল মারা।

এসেছিলাম প্লেনে হাল্কা হ'য়ে। যাবো জাহাজে। অতএব ভারি হওয়ায় বাধা নেই। ওজনের সীমা বরাদ্দে হাওয়াই কোম্পানি যেমন কৃপণ, জাহাজ কোম্পানি তেমনি উদার। তাই মনের সুখেই সঞ্চয়ে দিয়েছিলাম মন। কাজেই সেলফ্রিজে কিনতে হ'লো বড় একটা সুটকেশ। সুভ্যেনীর আর

কাগজপত্রে ঠাসা হ'লো সেটি। প্যাম্ফলেটস, গাইড বুক, ম্যাপ, আর আমার নোটস-এর খাতাগুলোও তাতে স্থান পেলো।

খবরের কাগজগুলোও বেঁধে নিলাম, সঙ্গে নেবো। ওগুলি ইংরেজের পরিচয়-পত্র, জাতীয় জীবনের রেজিস্টার্ড দলিল। ইংরেজের খবরের কাগজ-গুলো ভারি মজার। ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান, সানডে টাইমস, ইভনিং নিউজ, ইভনিং ডেসপ্যাচ, বার্মিংহাম মেল ইত্যাদি থ্রি-পেন্স বা টু-পেন্সের কুলীন কাগজগুলো যাহোক রাজনীতি নিয়ে চর্চা করে, নইলে দেড় পেনির ভঙ্গ-কুলীন কাগজগুলো রাজনীতির দিকে ঘেসতে চায় না বড়; তাই আমাদের গুরু-গম্ভীর কাগজগুলোর কাছে যাকে বলে একেবারে ছ্যাবলা। পাতায়-পাতায় মদ, চকোলেট, সার্ট, স্কার্ট, ফ্রক, লিপষ্টিক, ব্রাসিয়ার, করসেট, সাবান, সেণ্ট, ডেণ্টাল-ক্রীম আর হলিডে-প্রোগ্রামের বিজ্ঞাপনেরই ঘটাঘটি। আর খবর?

বহুৎ রকমের জবর খবর। যথা: চোর-ধরা, আত্মহত্যা, মারামারি, গুমখুন, শ্লীলতাহানি, পাশবিক অত্যাচার, যৌন বিকৃতির বিবরণ, সৎ-বাপের অসৎ আচরণ, পাঁচ ছেলের মা'র ষষ্ঠ বিয়ে, সিনেমা-তারকার স্বর্গীয় প্রেম, প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা আর সমালোচনা। আবার পরদিনই তাঁকে গদী ছাড়বার আবেদন। তাছাড়া মাঝে মাঝে নেহেরুর শ্রাদ্ধ। আবার কোন ছেলে-মেয়ের সৎকর্মের জন্যে অকুণ্ঠ প্রশংসা। কুকুর প্রদর্শনী, শিশু প্রদর্শনী, হর্সরেস, মোটর রেস, সুইমিং-এ বিজয়ী বিজয়িনীদের ছবি আর জীবনী—তার বিস্তৃত বিবরণ। অর্থাৎ হরেক রকম খবর—পাঁচ ফুলের সাজি। তবে বেশির ভাগই হাল্কা খবর, রসালো খবর, মজার খবর—সন্ধ্যা বেলার মনের খবর। বাড়ি ফেরার পথে প্রায় প্রত্যেকেই দু' তিনখানা কাগজ কেনে, দু' চার পাতা পড়ে, পড়েই ফেলে দেয়। জিগ্যেস করলে বলে, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনীর পর রাজনীতির ভারি খবরগুলো মাথায় বড় ঢোকে না। হাল্কা খবর পড়লে তবু মেজাজটা হয় হাল্কা।

এই সব হাল্কা খবরের কাগজে আমার প্যাকেট বরং ভারিই হ'লো। উপায় কি? জাতীয় চরিত্র-চিত্র আঁকা আছে এর পাতায়-পাতায়। জাতের আর্শি।

এবার বিদায় নেবার পালা।

লাইব্রেরীর বই দিলাম ফেরত। চশমা-পরা লাইব্রেরিয়ান মেয়েটি কামনা করলো শুভযাত্রা। লণ্ড্রীর বুড়ি আর তার ভাইঝি বললো : আবার এসো। গ্রসারি-শপের মেয়েদের বললাম : কাল থেকে এই দোকানে আসার সুযোগ হারাবো আমি। পোষ্ট অফিসের ষ্ট্যাম্প-বেচা মহিলাটি শুনে বললেন : চিঠি লিখো মাই ইণ্ডিয়ান ফ্রেণ্ড। পাড়ার ব্যাঙ্কে দিলাম আমার ট্রাভেলার্স চেকের শেষ পাতাটা। ফটোগ্রাফের দোকানী মেয়েটি ব্যস্ত ছিল শোভেল দিয়ে দরজায় জমা বরফ সরাতে। আমায় দেখে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো সে শোভেলে ভর দিয়ে। হেসে বললো : তোমার যাবার দিন তো এগিয়ে এলো ?

হ্যাঁ, কালই যাচ্ছি।

হেসে বললো : ইউ আর লাকি। ইণ্ডিয়ায় গিয়ে সূর্যের মুখ দেখবে। উইশ ইয়োর হ্যাপি জার্নি মিঃ গস।

রাত্রে মিঃ এবং মিসেস ল্যাফরকেড দিলেন ফেয়ারওয়েল ডিনার।

বিদায় লণ্ডন।

বিদায় ইংল্যাণ্ড।

ওয়াটারলু ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে সাদাম্পটন পোর্টে যাবার বোট-ট্রেনখানা। আমার সঙ্গে এসেছেন মিঃ এবং মিসেস ল্যাফরকেড। এলেন বিদায় দিতে মিঃ এবং মিসেস ওইওয়ে। ফুলের গোছা দিলেন হাতে। এলেন মিশ্র এবং আর্টিষ্ট মিঃ ঘোষ ; আর এলো ন্যান্সি, হিন্দির অনুরোধে, চিন্দির হ'য়ে এসেছে সে। সেই লজ্জা-রাঙা মেয়ে। হাতে ফুলের তোড়া।

বিদায়-বেদনায় সবার যেন থমথমে ভাব, মুখে ম্লান হাসি।

আসি।

চিঠি লিখো।

ভুলো না।

ইণ্ডিয়ায় এসো না ?

ইচ্ছে তো করে।

সব থামা-থামা আর ভাঙা-ভাঙা কথা। কথা কৈ ? কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়।

মন বলচে :

'যা পেয়েচি সেই মোর অক্ষয় ধন
যা পাইনি, বড়ো সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়'।

হুইশল বাজলো।

গুডবাই। গুডবাই মাই ফ্রেণ্ডস।

গুডবাই। উইশ ইয়োর হ্যাপি জার্নি।

হ্যাণ্ডশেক করলাম সবার সঙ্গে। মনটাও নাড়া খেয়ে জোরে মোচড় দিয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি উঠলাম গিয়ে ট্রেনে।

প্ল্যাটফর্মে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন সবাই। দূরে দাঁড়িয়ে আছে বিগবেন, পার্লামেণ্ট। তাদের গা ঘেসে টেমস নদী। আরো দূরে চেরিং-ক্রস, পিকাডিলি, হাইড পার্ক, ট্রাফালগার স্কোয়ার। গুডবাই।

ট্রেন ছাড়লো।

সবাই রুমাল নাড়তে লাগলেন, আমিও।

ওকি? মিসেস ল্যাফরকেড-এর নীল চোখ দু'টি সজল যেন?

তাই তো, মিসেস চোখ মুছচেন রুমালে।

নাঃ, স্কার্ট আর শাড়িতে দেখচি কোন তফাৎই নেই।



কুমারেশ ঘোষের বই

পণ্যা
ভাঙাগড়া
ভ্যাগাবণ্ডস্
সালোম
পংকিল
থেলমা
ওগো মেয়ে সাবধান
কটাক্ষ
চক্র
ম্যানিয়া
ফ্যাশন ট্রেনিং স্কুল
স্বামী পালন পদ্ধতি
ফাঁকিস্থান
বেনহুর
নতুন মিছিল
কাঠের ঘোড়া
ইংরেজের দেশে